নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায়

শিস প্রকাশনী ॥ বনগ্রাম
পরিবেশক : পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক : চন্দন ঘোষ, শিস প্রকাশনী, বনগ্রাম।
পরিবেশক : পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা ৭০০০০৯। মুদ্রাকর : সুবোধ-
কুমার বিশ্বাস, জনশক্তি প্রেস, বনগ্রাম।
মুদ্রণ সহায়তা : রামকৃষ্ণ প্রেস, বনগ্রাম।
আলোকচিত্রী : রণজিৎ চন্দ। প্রচ্ছদ : অমিত
চক্রবর্তী।
প্রথম প্রকাশ : ১৯৮০।

প্রতিবেদন

দীর্ঘদিনেব একটি আকাঙ্ক্ষিত গ্রন্থেব প্রকাশ ঘটাতে পেরে আমরা আনন্দিত। ইতিহাস নয়, তবু উপকরণের এবং তথ্যের অবতাবণায প্রাচীন যেন নবীনের স্পর্শে হ'যেছে আলোকিত। বস্তুতঃ গ্রন্থকাবের বহু পবিশ্রমের ফসল হিসেবে বইটি সুধীজনের কাছে গুরুত্ব পাবে বলে বিশ্বাস।

অনেকে হযত মনে করতে পাবেন, মফঃস্বলীয বৃত্তান্তই এব উপজীব্য, আবাব কেউবা একটি মহকুমার সীমাযিত গণ্ডির গন্ধ পেতে পারেন, কিন্তু সংস্কৃতিব বহুধা ধাবায সবখানের স্রোতকে মিশিযে দিলেই দেশীয মূল সুবেরা প্রকৃত সাংস্কৃতিক রূপ প্রকাশ পায। তবেই স্থান কাল যেন সমগ্র দেশেরই প্রতিনিধিত্ব কবতে পারে। আবাব রাজা বাজাধিরাজদের উজ্জ্বল অঙ্গনের কুশীলবদেব কথনেব ক্ষেত্রে ইতিহাস বড কৃপণ। লেখক তাই মানুসের ইতিহাস বিবর্তনকেই গ্রাম থেকে গ্রামান্তবে অতি কাছেব গৃহস্থ মানুষের নযন দিযে দেখেছেন, তারাই গ্রন্থ রচনাব কেন্দ্রবিন্দুতে স্বীয় স্থান করে নিয়েছেন। গ্রন্থকার গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুবেছেন, শ্বাপদসংকুল পবিত্যক্ত প্রান্তরে তাঁর অনুসন্ধিৎসু চোখ ঘুরে বেড়িযেছে। তাবই অকৃত্রিম তথ্যচিত্র হিসেবে গ্রন্থটি নিশ্চিত গবেষকদেরও খুশি কবতে পাববে।

বর্তমানের তীব্র বিদ্যুৎ সংকট, গণতান্ত্রিক নির্বাচন-কেন্দ্রিক মুদ্রণযন্ত্রের পরিস্থিতি সমেত এই দীর্ঘ গ্রন্থ প্রকাশে বেশ বিলম্ব হ'ল। গ্রাহকদের কাছে এর জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী।

বাংলার প্রত্যন্তের কত গ্রামে নিশ্চিহ্ন অতীতের স্বাক্ষব রয়েছে তার ধারাবাহিকতাকে প্রথম চক্ষুষ্মান করা চাই। নচেৎ প্রকৃত কথনও সত্য হয়ে উঠবে না।

সেই উপলব্ধি থেকে এ গ্রন্থ প্রকাশে 'শিস' পত্রিকার প্রকাশন বিভাগ তৎপর হ'য়েছে। কারণ কেবলমাত্র জনগণই বিশ্ব ইতিহাস সৃষ্টির প্রকৃত চালিকাশক্তি।

চন্দন ঘোষ

প্রকাশক

সূচীপত্র

বনগ্রাম মহকুমা
বাংলা দেশ
নদীয়া
বাংলা দেশ
বারাসাত

লেখক ও তাঁর সংগ্রহ, ডুমা

শহীদ সত্যেন চক্রবর্তী
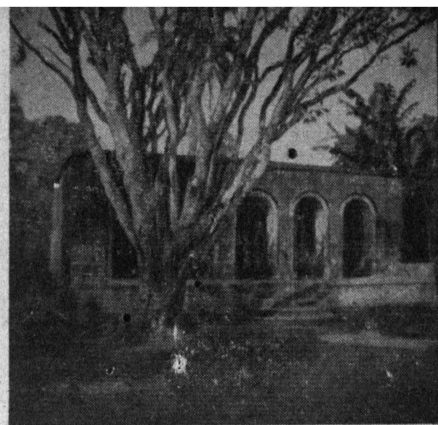
বর্তমান নবরত্নমন্দির, ইছাপুর
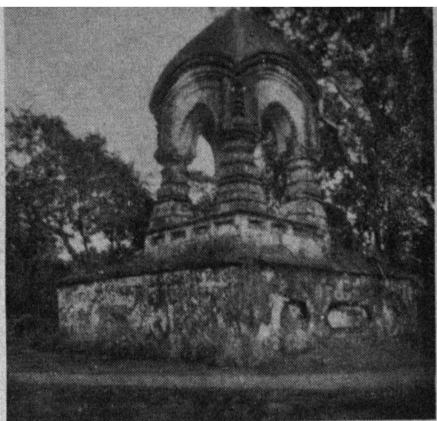
দোলমঞ্চ, ইছাপুর

দরগা, শ্রীনগর

অজয় ঘোষের বাড়ি, বৈরামপুর

নীল জাগের চৌবাচ্চা, মোল্লাহাটি

শিবমন্দির, শিমুলিয়া
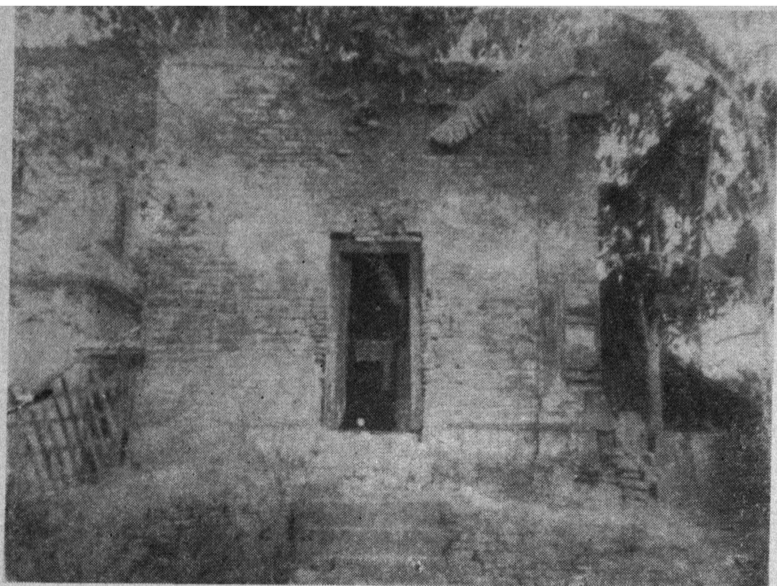
মুস্তাফি বাড়ির প্রাচীন মন্দির, বনগ্রাম

নীলকুঠি, মোল্লাহাটি (প্রাচীন চিত্র)

বিষ্ণুমূর্তি, জলেশ্বর
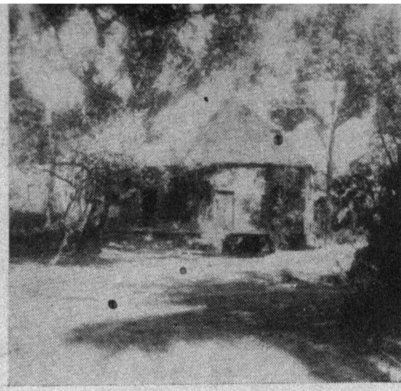
বিভূতিভূষণের বসতবাটি, বারাকপুর
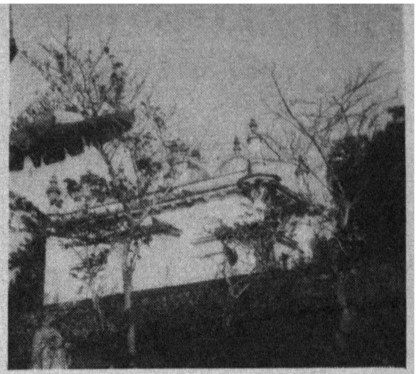
মসজিদ, পাইকপাড়া
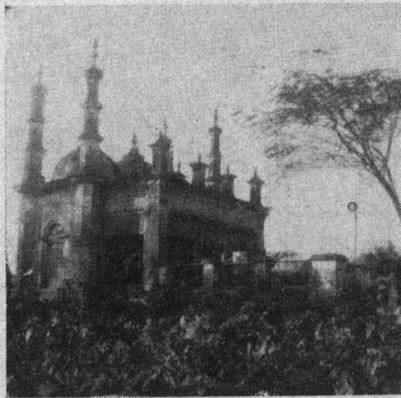
মসজিদ, ঘাটবাঁওড়

জোড়া মন্দির, শ্রীনগর

শিবমন্দির, ঘাটবাঁওড়

বর্তমান শিবমন্দির, জলেশ্বর
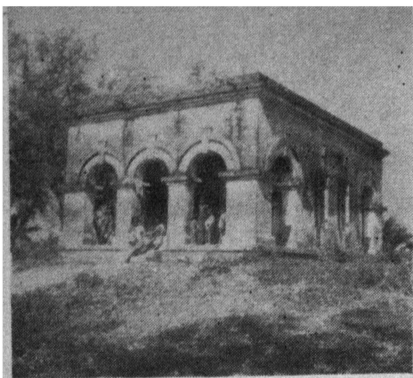
ডাকবাংলা, মোল্লাহাটি
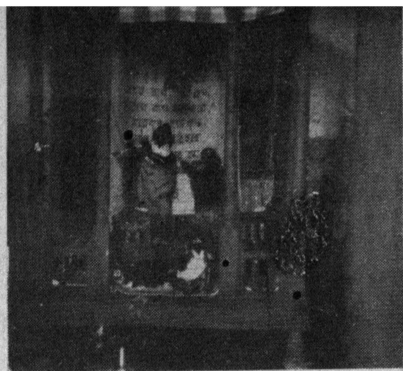
রাধাকৃষ্ণের মূর্তি. বৈরামপুর

জোড়া মন্দির, শিমুলিয়া

আর. টি. সারমোর সাহেবের কবর, মোল্লাহাটি
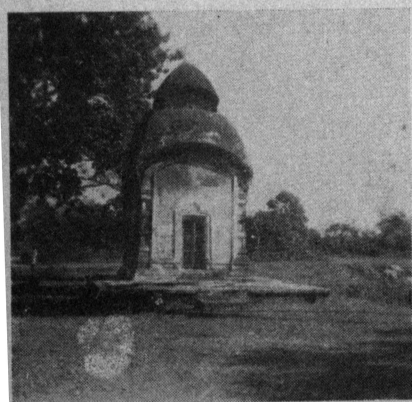
নীলমাধবের মন্দির, শ্রীনগর
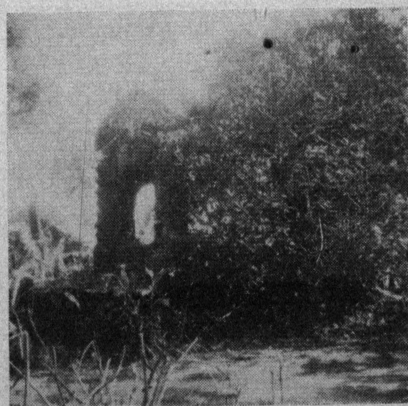
দোলমঞ্চ, বারাকপুর

পাঠকের কাছে

১৯২৯ খৃঃ আমি তখন বনগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র। সিক্সথ্ ক্লাসে পড়ি – বর্তমানে যা পঞ্চম শ্রেণী। আমাদের তখন একখানি উপপাঠ্য ছিল সতীশচন্দ্র মিত্রের "ছোটদের যশোহরের ইতিহাস"। বনগ্রাম তখন যশোহর জেলার একটি মহকুমা। ঐ বইখানিতে বনগ্রাম সম্বন্ধে কেবল "উত্তম কাঁচাগোল্লা পাওয়া যায়" ছাড়া কোন ঐতিহাসিক বিবরণ ছিল না। কেন জানি না আমার মনে একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। আমার পিতৃভূমি সুখপুখুরিয়া গ্রাম। শৈশব থেকেই এই গ্রামের অনেক ঐতিহাসিক কাহিনী শুনেছি। সে সকল স্থানে যাই, দেখি, বিস্ময় বোধকরি; কিন্তু সেই স্থানগুলির তো কোন ইতিহাস ঐ বইখানিতে পাই না। তখন আমার কিইবা যোগ্যতা। মনের ক্ষোভ মনেই মরে যায়। সঙ্কল্প করি বড় হয়ে আমি আমার গ্রামের ইতিহাস লিখব। কিন্তু ম্যাট্রিকটা পাশ করতেই জীবনে অনেক বাধা-বিপত্তি এল। তার পরই শুরু হল জীবন সংগ্রাম। কোন চাকুরী জুটল না। পুলিশ রিপোর্ট ভাল নয়। কাজের চেষ্টায় কিছুকাল কলিকাতায় অবস্থান করলাম। এসময় হাওড়ায় উত্তর ব্যাঁটরায় "কানাইলাল সিং ও নন্দলাল অধিকারীর" কড়া ও পাম্প-এর ঢালাই কারখানায় 'বয়' এর কাজ করলাম। দু'মাস পরে তাঁদের দোকান রাজাকাটরায় ৫৮ নং ক্লাইভষ্ট্রীট এ মাস কয়েক ইলেকট্রিক পাম্পের সেলস্ রিপ্রেজেণ্টেটিভ হয়ে কলিকাতায় ঘুরি, পরে কিছুদিন বৌবাজারে অক্ষয়কুমার দত্তের অধীনে করপোরেশনের প্লাম্বিংএর সাব কনট্রাকটরের কাজ করি, টিউশানিও করি; কিন্তু পড়ার সুযোগ জুটল না। আর কলিকাতায় থেকে বনগ্রামের ইতিহাসই বা লিখব কি করে! কোন কাজেই মন বসল না। তখন নিয়ম ছিল তিন বৎসর কোন বিদ্যালয়ে স্থায়ীপদে শিক্ষকতা করলে আই, এ,/বি, এ, পরীক্ষা প্রাইভেটে দেওয়া যায়। তখন কলিকাতা আর কৃষ্ণনগর ছাড়া কাছাকাছি কোন কলেজ ছিল না।

প্রাইভেট পরীক্ষা যদি দিতে পারি এই আশা নিয়ে বনগ্রামে এলাম। রোজগার না করলেও চলবে না। বৃদ্ধ অক্ষম পিতামাতার দায়িত্ব আমার উপর। ছোট ভাই তখনও ছাত্র। টিউশানি আরম্ভ করলাম। ১৯৩৮ সালে জুলাই মাসে চাকুরী জুটল বনগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ছ'মাসের

জন্য। তার পর আবার কলিকাতায়। নন্দলাল অধিকারীর পুত্র কানাইলাল অধিকারীর (রাজা কাটরায়) কাছে গেলাম। তাঁর কাছ থেকে জার্মানীস্টিলের কড়া নিয়ে কলিকাতার পথে পথে ফিরি করলাম তিন মাস। তার পর বনগ্রাম-কলিকাতা সব্জীর ভেণ্ডারী। কিন্তু তাতে ত' ইতিহাস লেখা যায় না।

১৯৪০ সালে জানুয়ারী মাসে পাঠশালা খুলে বসলাম হরিদাসপুর শিশু গাছের তলায় পথের পাশে। এই আশায় যদি এম, ই, স্কুল করতে পারি তাহলে পরীক্ষা দেওয়ায় বাধা থাকবেনা। গ্রামবাসীদের সাহায্য বিপুলভাবে মিলল। পরিচালক সমিতি হল। তখন লীগের আমল। খাজা হবিবুল্লা ছিলেন তখন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি নিজে বিদ্যালয় পরিদর্শন করলেন। ইতি-মধ্যেই খড়ের চাল আর চেঁচা বেড়ার ঘর উঠেছে গ্রামবাসীদের আনুকূল্যে। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রও জুটেছে। ঐ বছরই সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষামন্ত্রী বিদ্যালয় পরিদর্শন করলেন। স্কুলের পরিচালক সমিতির সকলেই মুসলমান। গোলজার হোসেন সেক্রেটারী, দরবেশ কবিরাজ প্রেসিডেন্ট আর তদানীন্তন এম, এল, এ, সিরাজুল ইসলাম প্রবল সহায়।

ছাত্র-ছাত্রীদের লাইন করে রাস্তায় দাঁড় করালাম মন্ত্রী মহোদয়কে অভ্যর্থনা করতে। "নরয়ে তক্‌দীর" বললাম ছাত্র-ছাত্রীরা বলল 'আল্লা হো আকবর' হিন্দু মুসলমান সকল ছাত্র-ছাত্রীই। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিদ্যালয় অনুমোদন লাভের পূর্বেই আত্মবিক্রয়ের গ্লানিতে বিদ্যালয় ছাড়ার সঙ্কল্প করলাম। আমি প্রধান শিক্ষক ছিলাম। পদত্যাগ করলাম, সেই সঙ্গে আমার অপর তিনজন সহকর্মী শিক্ষকও পদত্যাগ করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন মুসলমানও ছিলেন। সেই বিদ্যালয়ই এখন হরিদাসপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়।

তার পরের তিন বছর কাটল বনগ্রামে ১৯৪১ খৃঃ বীণাপাণি বিদ্যালয়, ১৯৪২ খৃঃ ঘোষ ইনস্টিটিউশন, ১৯৪৩ খৃঃ মডেল ইনস্টিটিউশন। সকল স্থানেই অস্থায়ী ভিত্তিতে। ১৯৪৩ সালে জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 'শালকিয়া স্টিল ইণ্ডাষ্ট্রিজ অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড' কারখানায় সহকারী স্টোর কিপারের কাজ করলাম। নভেম্বর থেকে কাঁচরাপাড়া এম, ই, এস এর সাব কন্‌ট্রাক্টরী হিন্দুস্থান কনসট্রাকসনের অধীনে। পুনরায় বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগদান করার সুযোগ জুটল। ১৯৪৪ খৃঃ বিদ্যালয় সেক্রেটারী মহাশয় রায়সাহেব সত্যচরণ বসু আমায় ডেকেই কাজে বহাল করলেন। কিন্তু বিধি বাম। ১৯৪৬ খৃঃ পূর্বে স্থায়ী পদে বহাল হওয়ার সুযোগ মিলল না। ফলে প্রাইভেটে পরীক্ষা দেওয়াও হলনা। স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে তখন তার সঙ্গে যুক্ত

আছি আংশিক ভাবে। বিভিন্ন ছড়া, পোষ্টার মারি রাতের অন্ধকারে দেওয়ালে, দরজায়। নিজের সঙ্কল্পের কথা চিন্তা করার সময় মিলছে না। হাটে হাটে পথনাটিকাও করি। ১৯৪৭ খৃঃ জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ল। স্কুলে তিন মাস ছুটি নিয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হলাম। রওনা হলাম কাশী। সেখানেও বাঙ্গালীটোলা হাইস্কুলে স্থায়ীপদে চাকুরী জুটল। দেশের টানে আবার ফিরলাম অক্টোবর মাসে। আবার বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগদান করলাম। বনগ্রাম দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিনই আমি প্রথম ছাত্র হলাম। দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনের প্রথম সংখ্যার প্রকাশ আমার সম্পাদনায় হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমার পিতৃ বিয়োগ ঘটল। পরপর কয়েক বছরে মাতা, স্ত্রী, পুত্র কন্যার মৃত্যু আমাকে স্তব্ধ করে দিল।

কাব্যচর্চা করি। বিভিন্ন গ্রামে যাই নানা গল্প শুনি। অতীতের সেই কাহিনী আমার ইতিহাস সংগ্রহ ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে রাখি। লিখে যাই কাউকে শোনাতে সাহস পাইনা। বনগ্রামে সাহিত্য সভা হয়। পূর্ণিমা সম্মিলন হয়, যোগদান করি কাব্য চর্চা করি কিন্তু আমার গোপন ভাণ্ডার উদ্ঘাটন করি না—লজ্জায় হোক বা ভয়েই হোক কিম্বা 'কমপ্লেকস্' বললেই বোধহয় ঠিক হবে। আমার ধারণা ছিল যাঁরা ইতিহাস লেখেন তাঁরা সকলেই বড় পণ্ডিত। আর ইতিহাসে রাজা-রাজড়ার কাহিনী ছাড়া আমার সাধারণ মানুষের জীবন কথায় কি করে ইতিহাস হবে।

বিভিন্ন লোকের লেখা ইতিহাস পড়ি। আর যা দেখি বা শুনি লিখে রাখি। সহসা পরিচয় ঘটল বিশ্বনাথ মৈত্রের সঙ্গে। পাড়ার ছেলে ও বয়সে অনেক ছোট। বিশ্বনাথ শুধু লেখে না, 'নতুন পাতা' নামে একখানা পত্রিকার সম্পাদনা করে। 'নতুন পাতা'য় আমার নতুন লেখা বের হল বিশ্বনাথের সম্পাদনায়। 'ইছামতী'গান। উৎসাহ পেলাম। বিশ্বনাথকে পড়ালাম আমার লেখার কিছু অংশ। বিশ্বনাথ তখন 'বনগাঁ হিতৈষী' পত্রিকার সম্পাদনা করে। এরপর "দ্বৈত শাসন কালে বিপ্লবী দল" শিরোনামে প্রকাশিত হল আমার পিতৃভূমি সুখপুখুরিয়ার একটি অধ্যায়। যাঁরা পড়লেন তারা আমায় খুব উৎসাহ দিলেন। সাহস বাড়ল।

বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের 'যাত্রী' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পেলাম ১৯৫৫ খৃঃ। তখন মনে হল যাত্রীতেই আমার সঙ্কল্পের রূপ দেব। তখন লেখার খুব ঝোঁক। কাব্য চর্চা করে আসছি খুবই অল্প বয়স থেকে। সে বাতিক তখন খুব বেড়ে গেল। আমার সহকর্মী বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও সে আমার বন্ধু। তাকে মনের কথা বললাম লেখাও দেখালাম।

"দাদা, ভবিষ্যতে আপনার লেখা যখন বইয়ের রূপ নেবে তখন এর একটা নাম করণ করেই দিই। বই এর নাম হোক "ইতিহাসের বনগ্রাম।" যে বনগ্রামকে যশোহর খুলনার ইতিহাসে উপেক্ষা করা হয়েছে সে বনগ্রামও ইতিহাসে স্থান পাওয়ার যোগ্য এই অর্থটাই সেদিন নিজের মনে উদয় হয়েছিল। তাতে বেশ আনন্দ ও উৎসাহ পেলাম। 'যাত্রী'তে বের হল স্বথপুখুরিয়ার দ্বিতীয় অধ্যায় 'রায় বাগান'। এই ভাবে আমার সম্পাদনায় বের হতে থাকল আমার 'ইতিহাসের বনগ্রাম'এর অংশ বিশেষ।

গ্রামের পথে-প্রান্তরে, বনে-জঙ্গলে, পোড়ো বাড়ীতে ঘুরে বেড়াই, আর যাকে আমি এখনও প্রাণের আকর হিসাবে জানি মানুষ ও জন্তু এবং গাছপালার মত জীবন্ত মনে করি সেই নদীর তীর ধরে চলে যাই। যারা মরে গেছে, যাদের গতিরুদ্ধ তাদের জীবদ্দশায় কিরূপ ছিল তাই ভাবি জানার চেষ্টা করি। এভাবে কাজ যত এগোয় প্রকাশ তত হয় না। 'নববঙ্গ ভারতী'তে নির্মল আচার্যের সম্পাদনায় একবার কিছু অংশ প্রকাশিত হল। তার পর পত্রিকাটা বন্ধ হয়ে গেল। কার্তিক মোদকের সম্পাদনায় 'সীমান্ত' পত্রিকায় অংশ বিশেষ প্রকাশিত হল। সঞ্জীবকুমার বসুর সম্পাদনায় 'সংস্কৃতি' পত্রিকার ১ম বর্ষ ও ২য় সংখ্যায় প্রকাশ ঘটল কিছু অংশের। সম্পাদকের কলম জোরাল তাই ব্যথা পেলাম তাই আর লিখলাম না। অবশেষে বনগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'শিস' পত্রিকা ধারাবাহিক ভাবে 'ইতিহাসের বনগ্রাম' প্রকাশ করেন। এই ভাবে 'ইতিহাসের বনগ্রাম' সাধারণ্যে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পেল। প্রকাশ যতই হতে থাকল ততই অনুরাগী পাঠকদের কাছ থেকে পুস্তক আকারে প্রকাশ করার চাপ আসতে লাগল। কিন্তু পুস্তক আকারে প্রকাশ করা বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে দুরাশার বিষয়।

এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে আমার লেখা সম্বন্ধে আরও কিছু বলা উচিত বলে মনে করছি। ইতিহাস মানে আমি যা ছাত্র-জীবনে বুঝেছি তা হল His এবং Story'র সমন্বয় অর্থাৎ সেই রাজা রাজড়ার কাহিনী। আমাদের মত সাধারণ মানুষের কোন ইতিহাস নেই। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, তাদের সামাজিক-অর্থ নৈতিক কোন প্রতিফলনই সে ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তাই ইচ্ছা ছিল যে আমি গ্রামের চিত্রটাই তুলে ধরতে চেষ্টা করব। সাধারণ মানুষই হবে আমার 'ইতিহাসের বনগ্রামের' সম্পদ। সেই ভাবে আমার প্রচেষ্টা সফল করার জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। জানি না তাতে আমি কতটুকু সফল হয়েছি।

এই ইতিহাস সংগ্রহে আমাকে অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে অজ্ঞ

গ্রামবাসীদের কাছে। অনেকে নানা সন্দেহ করেছে। আমাকে কেউ পাগল ভেবেছে, কেউ মনে করেছে সরকারের গোয়েন্দা, আবার কেউ সন্দেহ করেছে ডাকাতের আড়কাঠী বলে। কোথাও উপেক্ষা, কোথাও মিলেছে অবহেলা, আবাব কোথাও কোথাও সমাদৃতও হয়েছি। তবে তখন আমার কোন দৈহিক অনুভূতি থাকত না, মন থাকত ভরপুর, আনন্দে আর আবিষ্কারের নেশায় ডুবে।

গ্রাম বাংলার ইতিহাস মুখে মুখে চলে আসতে আসতে কত হারিয়ে গেছে। এর কোন লিখিত প্রমাণ নেই। সে কারণে অনেক কিংবদন্তি, গল্প ইত্যাদির ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। তবুও যতদূর সম্ভব বাস্তব ধর্মী করার চেষ্টা করেছি। প্রাত্যহিক ষোল ঘণ্টা আঠার ঘণ্টা আমার রুজির জন্য খাটার পর লেখা। আর ছুটির দিন ও রবিবার ইতিহাস সংগ্রহে পরিক্রমা এই ভাবে এখনও জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁচেছি। এখনও আমার কত অজানা, অচেনা এবং অদেখা রয়েগেল। তার ইতিহাস হয়ত হারিয়েও যাবে। দিন থাকতে দিনের নাম যতটা করা উচিত ছিল তা করতে পারলাম না। আশাকরি ভবিষ্যতে অন্য কেউ হয়ত আরও ভালভাবে আমার অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করবেন। যদি কোন ভুল ভ্রান্তি তথ্যের দিক থেকে হয়ে থাকে তা সংশোধন করে সত্য উদ্ঘাটন করে আমাকে কৃতজ্ঞতাভাজন করবেন।

দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেছি, দেখেছি অনেক ছাত্রকেই পিতামোহের নাম জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারে না। অথচ সেই সময় তাকে কণ্ঠস্থ করতে হয় বাবরের বাবার নাম, কনফুসিয়াসের ধর্ম, শার্লম্যানের পোষাক পরিচ্ছদ এবং খাদ্য কি কি ছিল। তাই আমার মনে এই ধারণা হয়েছে যে শৈশবে ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের আঞ্চলিক ইতিহাস ও ভূগোল পাঠের সুযোগ করে দেওয়া; তার পর বাংলা তথা ভারত ও বিশ্ব।

'ইতিহাসের বনগ্রাম' লেখার জন্য উপাদান সংগ্রহ করতে আমি যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেছি তাঁদের সকলের নাম স্মরণে রাখা সম্ভব হয় নি আমার পক্ষে। আমি সেই মহান বন্ধুদের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যাঁরা আমার 'ইতিহাসের বনগ্রাম' গ্রন্থখানি প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন এবং যাঁরা অগ্রিম গ্রাহক হয়ে এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করতে সাহায্য করেছেন তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করব না। তাঁরা মহৎ, সমস্ত কৃতজ্ঞতার উর্দ্ধে।

পরিশেষে এই গ্রন্থ প্রকাশে 'শিস পত্রিকার' কর্ণধারদের যোগ্য ভূমিকা

পালনে আমি অভিভূত। নচেৎ সমস্ত জীবন ব্যয় করা পরিশ্রম পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভবই হত না। গ্রন্থটির বিভিন্ন মুদ্রিত অংশ সংগ্রথিত করে সম্পাদনার কাজকেও তাঁরাই সম্পন্ন করে আমাকে দায়িত্ব মুক্ত করেছেন। সেই সব সুধী মানুষদের আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। যাঁদের সান্নিধ্যে জেনেছি, চিনেছি। প্রয়াত অনেককে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। যত ক্ষুদ্র হোক, এমন প্রচেষ্টার যাঁরা অংশীদার আমার মত নিঃশব্দে সংগ্রহ করছেন অতীতের অচলায়তনের একদা শব্দময় হৃদপিণ্ডের তান তাঁদের প্রতি শুভেচ্ছা জানাই, যেন সাধারণ মানুষের ইতিহাস, নৈচেবর্তে থাকার কাহিনী যোগ্য ভাবে সুপ্রকাশ ঘটে। সেইখানেই আমার যাবজ্জীবন পরিশ্রমের সার্থকতা।

বিনীত—

গ্রন্থকার।

বনগ্রাম মতিগঞ্জ চাঁপাবেড়িয়া

বনগ্রাম মহকুমা একদিন ছিল নদীয়া জেলার সঙ্গে। তারপর যুক্ত হল ১৮৮২ খৃঃ যশোহরের সঙ্গে। আবার ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর তার অর্ধাঙ্গ নিয়ে ২৪ পরগণা জেলাকে আশ্রয় করে আছে। পূর্বে অবিভক্ত বাংলার তিন জেলার মাঝে অবস্থিত এই বনগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল, বর্তমানে বনগ্রামের গুরুত্ব বহুলাংশে বরং বেড়েছে—কমেনি। বর্তমানে এর দু'দিকে দুই জেলা এবং অপর দিকে পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলা দেশ—একটি ভিন্নরাষ্ট্র। সীমান্ত অঞ্চল হিসাবেও বনগ্রামের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

এই বনগ্রাম প্রাচীন কাল হতেই শুধু ভারতবর্ষ নয়, শোনা যায়, ভারতের বাহিরেও যোগাযোগ স্থাপন করার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছিল। আর বৃটিশ আমলে ত' নীল কুঠিয়াল সাহেবদের প্রধান কার্যালয়ই ছিল বনগ্রাম মহকুমার ইছামতী-তীরে মোল্লাহাটিতে। কত বীর, কত বিপ্লবী, কত দেশপ্রেমিক, কত ধর্মবিদ, কত সাহিত্যিক এবং কবি এই বনগ্রামে জন্মগ্রহণ ক'রে বিশ্ববরেণ্য হয়েছেন।

পৃথিবীর জনপদ সকলই নদীতীর আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। বনগ্রামের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বনগ্রাম মহকুমার ভিতর দিয়ে অনেক নদী প্রবাহিত। কয়েকটি নদী অধুনা লুপ্ত। আর কয়েকটি লুপ্ত হওয়ার অপেক্ষায় আছে। যে কটি এখনও নদী নামে পরিচিত হচ্ছে তাদের মধ্যে ইছামতীই প্রধান, আর তার তীরেই বর্তমান বনগ্রাম শহর।

এছাড়া যমুনা, কপোতাক্ষী, বেত্রবতী, মরালী, নাওভাঙ্গা, কোদল, হাকোরের নামও উল্লেখ করা যায়।

নদীমাতৃক বনভূমির অংশ বনগ্রাম। সুতরাং নদীর পরিচয় না দিলে ঠিক ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য প্রথমে ইছামতী নদীর পরিচয় দিচ্ছি। বর্তমানে শীর্ণ ইছামতী দেখলে মনে হবে না যে একদিন এই ইছামতীর এক পাড়ে দাঁড়ালে অপর পাড় ঘোলা ঘোলা দেখাত, স্পষ্ট কিছুই বোঝা যেত না। ইছামতী এতই প্রশস্ত ছিল। প্রবলও ছিল খুব। এই নদীতে এত কুমীরের উৎপাত ছিল যে স্নানের ঘাটগুলি বারমাস ঘিরে রাখা হ'ত বাঁশের বেড়া দিয়ে। ইছামতীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বলতে গেলে দেখা যায় যে গঙ্গানদী দুটো ভাগ হয়ে গেল বাংলায় এসে। এক ভাগ ভাগীরথী পরে হুঁগলী নদী নাম নিয়ে কলকাতার পাশ দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। অপর ভাগ পদ্মা বা কীর্তিনাশা পূর্ব পাকিস্তান বর্তমানে বাংলা দেশের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এই পদ্মা থেকে বের হল মাথাভাঙ্গা নদী। মাথাভাঙ্গার দুটো ভাগ, নদীয়া জেলার রাণাঘাটের মধ্য দিয়ে গিয়ে হুগলী নদীতে মিশেছে এক ভাগ—তার নাম চূর্ণী নদী। অপর ভাগ নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জের নিকট বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রবেশ করেছে বনগ্রাম মহকুমায়। ইছামতী পূর্বমুখী হয়ে বয়ে গিয়েছে সমুদ্রের দিকে। হাসনাবাদের দক্ষিণে এই ইছামতীর নাম হয়েছে কালিন্দী। এর তীরেই ছিল প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোহর। এখন সেই অংশ বাংলা দেশে। কালিন্দী বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। বর্তমানে স্থানে স্থানে ইছামতীর এক দিক ভিন্ন রাষ্ট্র বাংলাদেশের অংশ বলে গণ্য করা হচ্ছে।

এই ইছামতী কত ঐশ্বর্য, কত প্রতিভা ও কত রণরঙ্গ দেখিয়েছিল। আজ তার অনেক চিহ্ন লুপ্তপ্রায়। কতদিনের কত গোপন কথা ও কাহিনী এই জলধারায় মিশে আছে। কত সুখ-দুঃখের কথা, কত প্রাচীন গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন এর জলধারায় লুপ্ত হয়ে গেছে—তার সংবাদ আর কেউ রাখে না। এখন এই ক্ষীণস্রোতা ইছামতী দেখলে বিশ্বাস হতেই চায় না যে একদিন এই ইছামতী প্রবল ছিল।

ইছামতী কেন এত ক্ষীণস্রোতা হ'ল সে সম্বন্ধেও একটা কাহিনী শোনা যায়। রূপকথার মত মনে হলেও সে কাহিনী এখানে বলা আবশ্যিক মনে করছি। কৃষ্ণগঞ্জের নিকট যেখান থেকে এই নদীর নাম হ'ল ইছামতী সেখান থেকে নিচের দিকে দীর্ঘ এক মাইল ইছামতীর তলদেশ তামার

পাত দিয়ে বাঁধানো ছিল। শোনা যায় বাংলা দেশ মুসলমান কবলিত হওয়ার বহু পূর্ব হতেই এই তামার পাত ছিল, পদ্মার বালি পড়ে যাতে ভরাট না হয়ে ওঠে এই জন্য। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই তামার পাত তুলে নেয় প্রথম রেল লাইন পাতবার সময়। আর তার পরিবর্তে ফেলল পাথর রেল-সেতু রক্ষা করার জন্য। ফলে বালি আর পলি জমে এখন এক মাইলেরও অধিক ভরাট হযে উঠেছে। পদ্মার জলের সঙ্গে বৎসরের অধিকাংশ সময় সংযোগ থাকে না। বর্ষার সময় মাস দুই জল ঘোলা হয়, পদ্মার জলধারায় তখন একটু জলও বাডে। বর্তমানে সে সময় কমে পনের থেকে কুডি দিনে দাঁডিয়েছে। বর্ষার সময় বালির চরা ছাপিয়ে পদ্মার জল একটু আসে তাই সে সময় ইছামতীর জল একটু ঘোলা হয়, স্রোতও কিছু বাডে। নচেৎ অন্য সময় ঐ চরায় জলের ধারার রেখাও বোঝা যায় না, হেঁটে পার হয লোকজন। কোদলা, নাওভাঙ্গা, হাঁকোর এখন বাঁওডের সমান হয়ে উঠেছে। কচুডীপানা আর দামে ভর্তি। বেত্রবতী বা বেতনা একেবারে মজে গেছে। তার মাঝে এখন পুকুর কাটা হয়েছে।

নদী ছাডা বনগ্রাম মহকুমায় অনেক বাঁওড় ও বিল আছে। এগুলিতেও বারমাস জল থাকে। এখন পানায় মজে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আগেকার দিনে এ দেশের লোক বাঁওড ও বিলের জল পান করত। বনগ্রাম মহকুমায পুকুর সেরকম নেই। কারণ বালির অংশ বেশী নদীর চরে। নদী ও বিলে অজস্র মাছ ছিল। এছাড়া বিলের ঢালু পাড়ে প্রচুর ধান চাষ হয়ে আসছে। নদীর গতি রুদ্ধ হয়ে বা খাত পরিবর্তনের ফলে বাঁওডের সৃষ্টি হয়েছে। যে নদীগুলি আছে সংস্কার অভাবে তাদের অবস্থাও এইরূপই হবে। এ সম্পর্কে পরে বিস্তৃত আলোচনা হ'য়েছে।

এইবার ইছামতীর সম্পদের কথা বলতে হয়, যার ফলে এই বনগ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল দেশ-বিদেশের।

ইছামতী নদীর নামের একটা বিশেষ অর্থ আছে। ইছা-র অর্থ গল্দা-চিংড়ি আর মোতি-র অর্থ হল মুক্তা। এই দুটো জিনিষ পাওয়া যেত এই নদীতে প্রচুর। গল্দা চিংড়ি এখনও পাওয়া যায়, পরিমাণ খুব সামান্য। মোতি বা মুক্তা এখন আর পাওয়া যায় না। মোতি পাওয়া যেত শুক্তি বা ঝিনুকের মধ্যে। জাল দিয়ে জেলেরা নৌকা করে ঝিনুক তুলত। ইং ১৯২৭-২৮ সালেও নদী থেকে ঝিনুক তুলতে দেখা গিয়েছে। ফাল্গুন

চৈত্র মাস ছিল ঝিনুক তোলার সময়। অবশ্য প্রত্যেক ঝিনুকের ভিতর মুক্তা থাকত না। ঝিনুকগুলোও ফেলা যেত না। সেগুলো নদীর তীরে স্থানে স্থানে জড়ো করে রাখা হত। গ্রীষ্মের রৌদ্র বর্ষার জল্ তার ভিতরের মাংস পচিয়ে নষ্ট করে দিত। তারপর শীতের সময় আগুন দিয়ে পোড়ান হ'ত। সেই পোড়া ঝিনুক থেকে চুন তৈরী করা হত। তখনকার দিনে আমাদের দেশে পাথুরে চুনের প্রচলন ছিল না। ঝিনুকের চুনই ঘরবাড়ি তৈরী করার জন্য আর পানে খাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হ'ত। যমুনা নদীতেও গলদা চিংড়ি ও ঝিনুক মিলত কিন্তু যমুনা নদীর ঝিনুকে মুক্তা মিলত না। ইছামতী ও যমুনা নদীর তীরের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ধীবর শ্রেণীর ও চুনুরীর বাস ছিল। এখন তাদের সে ব্যবসা বন্ধ। আবার অনেক গ্রামে চুনুরীপাড়া এখনও আছে। এই চুন আর মোতির ব্যবসার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল ইছামতীর তীরে—মতিগঞ্জে। বনগ্রাম শহরের অপর পারে এখনও মতিগঞ্জ বর্তমান। কিন্তু মতিগঞ্জে এখন আর মোতির হাট বসে না। শোনা যায় গুপ্তযুগে দেশ বিদেশ থেকে বড় বড় কাঠের জাহাজ আসত মতিগঞ্জের ঘাটে, চুন আর মোতি রপ্তানী হ'ত দূর দেশে। বড় মোতি ব্যবসায়ীরা বাস করত মতিগঞ্জে। ক্রমে ইছামতী মোতিহীন হতে লাগল। মোতি কিনতে আর বিদেশ থেকে জাহাজ আসত না, মতিগঞ্জে আর মোতির হাট বসত না। এখন ঐ ব্যবসা লুপ্ত। নদী মরে যাওয়ায় ঝিনুকও মরে গেছে। ধুনুরীরাও ধুনকি হাতে তুলো ধুনে লেপ, তোষক, তৈরী করছে। এখন শুধু পড়ে আছে মোতিহীন মতিগঞ্জ। এখন বনগ্রাম পৌর প্রতিষ্ঠানের অধীন একটি ছোট এলাকা হিসাবে চিহ্নিত।

পরবর্তীকালে এই মতিগঞ্জ ছয়ঘরিয়ার চট্টোপাধ্যায় বংশের জমিদারীর অধীন হয়। সেই বংশের একজন মতি চট্টোপাধ্যায় ছিলেন। তাঁর নামের সঙ্গে মতিগঞ্জের নামকরণ হয়েছে বলে পরবর্তী বংশধরেরা দাবি তুলে থাকেন। আবার লীগের আমলে মতি সর্দ্দারের মতিগঞ্জ এটাও শোনা যেত। এই দুই দাবীর পিছনেই কোন যুক্তি নেই কারণ মতিগঞ্জ ছয়ঘরিয়ার উৎপত্তির বহু পূর্বেই গঞ্জ ছিল।

মতিগঞ্জের অপর পারে বনগ্রাম ছিল জলা জায়গা—বিল, বেতের জঙ্গল। এখন এই বনগ্রামের শ্রী ফিরেছে। সেই লক্ষ্মীবিলের মধ্যেই এখন বনশ্রী সিনেমা হল। ঐ লক্ষ্মীবিল এত দুর্গম ছিল যে দিনের বেলাতেও কেউ যেতে সাহস করত না—১৯২০-২১ সালেও। বাঘ আর সাপের ভয় ছিল

এতবাল। ইংবাজ শাসনের আমলে শহর বনগ্রামেব উৎপত্তি হয়ে নাম হল নূতন বনগ্রাম। আর পূর্বেব বনগ্রাম এখনও পুরাতন বনগ্রাম নামে একটি গ্রাম এখনও বর্তমান আছে শহর থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে ইছামতী তীরে। এখন বনগ্রামের আয়তন ক্রমশ বড হচ্ছে। নব বনগ্রাম নামকরণ করা হয়েছে এক অংশের।

বনগ্রামের যে অংশে এখন বসতি বিস্তাব, বিশেষ করে হচ্ছে ইছামতী তীবে— সেই অংশের একটি গ্রাম আজও আছে চাঁপাবেড়িয়া নামে। দীর্ঘকাল ধবে বন জঙ্গলে ভর্তি হযে ছিল গ্রামখানি। আব অল্প কয়েক ঘর লোক ভেঢ়ে বামড়ে পড়ে ছিল মাত্র। এখন এই চাঁপাবেড়িয়া ইছামতী নদী থেকে এক মাইলেরও অধিক দূরে। কিন্তু একদিন এই চাঁপাবেড়িয়া ইছামতী নদী-তীরে ছিল বিবাট গণ্ডগ্রাম। বহু শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ছিল এখানে। ভাগীরথী তীবের ভট্টপল্লীব বা নবদ্বীপের সঙ্গে এই গ্রামেব তুলনা কবা চলত। টোল, চতুষ্পাঠী ছিল। দেশ-বিদেশ থেকে বহু শিক্ষার্থী আসতেন শিক্ষা লাভ করতে ঐ চাঁপাবেড়িয়া গ্রামে। এখনকার চাঁপাবেড়িয়া,নূতনগ্রাম, নব বনগ্রাম ছিল ইছামতী গর্ভে।

তখন নদীপথই যাতায়াতেব প্রধান পথ ছিল। সেজন্তে নৌকার প্রচলন ছিল খুব। মুসলমান আমলেও সুদূর মুর্শিদাবাদ, আগ্রা, ইংরাজ আমলের প্রথমদিকে কৃষ্ণনগর এই নদী পথেই লোকে যাতায়াত করত। নদীর তীরে দুই পাড দিয়ে গুণ টানার পথ ছিল। নদীর জল থেকে আট হাত বাদ দিয়ে তবে তীরের জমির মালিক সীমানা নির্দেশ করতেন।

বনগ্রাম তখনকার দিনে কেবলমাত্র ব্যবসার কেন্দ্রই ছিল না। বড বড় টোল চতুষ্পাঠীও ছিল। চাঁপাবেড়িয়া নাওভাঙ্গার তীরে ছয়ঘরিয়ায় সংস্কৃত চর্চার বিরাট কেন্দ্র ছিল। শোনা যায় মহাপ্রভু, "শ্রীচৈতন্তদেব" হওয়াব পূর্বে তাঁর ছাত্রাবস্থায় চাঁপাবেড়িয়ার টোল দেখতে এসেছিলেন।

বৃটিশ শাসনের সময় নীলকুঠি গড়ে ওঠে বাংলার প্রায় সকল স্থানে কিন্তু তাব প্রধান কেন্দ্র ছিল বনগ্রামের অন্তর্গত মোল্লাহাটি ইছামতী তীরে। বনগ্রাম থেকে জল পথে দেশ বিদেশ যাতায়াতের সুবিধা ছিল বলেই ব্যব-সায়ের দিক থেকে বনগ্রাম উন্নত ছিল। গোপালনগর, গাঁড়াপোতা, মঙ্গলগঞ্জ, রাণীগঞ্জ (ঘাটবাওড়) তখনকার দিনে উন্নত ধরণের গঞ্জ ছিল।

বর্তমান বনগ্রাম শহর অঞ্চল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। দস্যু ও তস্করের আশ্রয়স্থল। কেবলমাত্র নদীতীরে প্রাচীন বাড়ী বলতে মুস্তাফি বাড়ী শহর

উৎপত্তির বহু পূর্বেই ছিল। তিনটি শিব মন্দিরের এখন দু'টি ভেঙ্গে পড়েছে। অবশিষ্টটির ভগ্নদশা, তবুও তিনটি শিব একত্র রূপে সেখানেই পূজা দেওয়া হচ্ছে। মুস্তাফি বাড়ীর অতীত ইতিহাস দিতে গেলে বংশগত বা ব্যক্তিগত ইতিহাস লিখতে হয় সেকারণেই সেটা না দেওয়াই ভাল মনে করছি। সমাজ বা সাধারণের প্রতি মুস্তাফিদের কোন ভাল অবদান নেই। বনগ্রামের পূর্বপাড়ায় কয়েক ঘর লোকের বাস ছিল। ধীবর শ্রেণীর সংখ্যাই অধিক। ইছামতীর মোতি আহরণ পেশা ছিল সে কারণে তাদের কারো কারো অবস্থা উল্লেখযোগ্য ভাবে সম্পদশালী ছিল। এছাড়া মণিকার এক ঘর ছিলেন। এখন পূর্বপাড়া ঘন বসতি পূর্ণ অঞ্চল।

যশোহরের কালী পোদ্দারের নাম চিরকাল লোকে স্মরণে রাখবে। কারণ তিনিই প্রথমে বনগ্রামের মধ্য দিয়ে একটা দীর্ঘ পথ প্রস্তুত করান। এই পথের নাম এখন "বনগ্রাম-চাকদহ রোড"। যশোহর থেকে ভাটপাড়া বা ভট্টপল্লী পর্যন্ত এই পথ প্রথম প্রস্তুত করা'ন হয়। এখন এই পথের উন্নতি হয়েছে। মাতৃভক্ত কালী পোদ্দার তাঁর মায়ের আদেশে এই পথ নির্মাণ করান। তাঁর মা গুরু গৃহ ভাটপাড়ায় পাল্কি করে যাওয়ার সময় পথে বড় কষ্ট পান সে কারণে ছেলেকে ঐ পথ নির্মাণ করতে বলেন গঙ্গার তীর পর্যন্ত। যাতে সকলের গঙ্গা স্নানে যাওয়ার সুবিধা হয়।

বৃটিশ শাসনের প্রথম দিকে এই পথেই গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী চলাচল করত। লোকে তখনকার দিনে পায়ে হেঁটে যাতায়াত করত বেশীর ভাগ। বৃটিশ আমলের প্রথম দিকে ঘোড়ার গাড়ী করে ডাক যেত বনগ্রাম থেকে চাকদহ পর্যন্ত এই পথে। প্রতি পাঁচ মাইল অন্তর ডাক গাড়ীর ঘোড়া বদল করার ব্যবস্থা ছিল। গোপালনগর, বেলে, নেঁউলিয়ায় ঘোড়া বদল করার ব্যবস্থা ছিল। পথিকদের বিশ্রাম ও স্নানাহার করার ব্যবস্থা ছিল ঐ সকল স্থানে। তাকে তখন চটি বা সরাই বলা হ'ত। ১৮৮৭-৮৮ খৃষ্টাব্দে বনগ্রাম—শিয়ালদহ রেল লাইন খোলার পর এই পথের প্রয়োজন অনেক অংশে কমে যায়। তার পূর্বে রাজধানী কলকাতা বা জেলা শহর কৃষ্ণনগর যেতে হ'লে এই কালী পোদ্দারের পথ দিয়ে চাকদহ পর্যন্ত যেতে হ'ত। তার পর ট্রেনে উঠে কলকাতা বা কৃষ্ণনগর।

ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হলে বাংলা দেশে টোল চতুষ্পাঠী, মাদ্রাসা—মক্তব আর কেউ চায় না; তখন রাজ ভাষা ইংরাজী নিয়েই চলছে মাতামাতি। কিন্তু এদেশে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল তার

অনেক দিন পরে। বনগ্রাম মহকুমার প্রাচীনতম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল মহেশপুর (এখন বাংলাদেশ) তারপর বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় ইং ১৮৬৮ সালে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত আরম্ভ করা হয়।

বনগ্রাম শহর হ'ল। ইংরাজ সরকার স্থাপন করলেন বিচারালয়। ইছামতী নদীর তীব জয়ন্তীপুর থেকে আদালত তুলে নিয়ে এলেন বনগ্রামে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মুন্সেফকোর্ট এবং ডাক বাংলার গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ করা হয়। এই গৃহ দুইটির ঠিকাদারি করেন সুখপুখুরিযা নিবাসী যদুনাথ দত্ত মহাশয়*।

কোর্ট স্থাপন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে বুদ্ধিজীবী, আইন ব্যবসায়ী, আমলা গোমস্তার দল ও ছোট ছোট ব্যবসাদারেরা চারপাশ থেকে এসে জমতে লাগলেন। ক্রমে গড়ে উঠল মহকুমা শহর। বনগ্রামের গুরুত্ব বাড়ল। খেয়াতরী উঠে গিয়ে হল ভাসমান সেতু। অন্যান্য ব্যবসায়কেন্দ্র যেমন গোপালনগর, গাড়াপোতা, মঙ্গলগঞ্জ, রাণীগঞ্জের সৌভাগ্যে ভাঁটা পড়ল। তবে পূর্বে কোম্পানীর আমলের আদালত যেখানে ছিল সেই জয়ন্তীপুর ক্রমশ জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ল। এখন সে গ্রাম পূর্বপাকিস্তানের (বাংলাদেশ) সীমান্তের নিকট। সেকারণে ঐ গ্রামের গুরুত্ব বেড়েছে। অনেক সরকারী অফিস হয়েছে। প্যাটরাপোল ষ্টেশন এর সংলগ্ন। এখন জমজমাট।

নূতন বনগ্রাম শহর হল বটে কিন্তু দীর্ঘকাল বাজারের দোকানগুলি ছিল খড়ের চাল আর বাঁশের বেড়ার। ১৯১৪-১৫ সালেও মাত্র খান পাঁচেক পাকা দোকান ঘর ছিল বনগ্রাম শহরে। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। প্রায়ই মহামারী দেখা দিত। সে কারণে জনসংখ্যা বনগ্রামে খুব কম ছিল। বনগ্রামের ভাসমান সেতু যাকে লোকে—"বোটের পুল" বলে সেটা ১৭৬০-৬২ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী করা হয়। একদিন ঐ ভাসমান সেতুই বনগ্রামের সৌন্দর্য ছিল। এখন আর সেতুর সে যত্ন নেই। তখন দূর থেকে বিশেষ করে রাত্রে নৌকা

---

* প্রতাপাদিত্যের রাজস্ব সংগ্রাহক কালনীর দত্তের বংশধর। বাগআঁচড়া থেকে সুখপুখুরিয়ায় আসেন। এই বংশের কিছু অংশ বনগ্রামে বসতি করেন বনগ্রাম প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর। বনগ্রামের দত্তপাড়া এই দত্তদের নামেই। (যশোহর-খুলনার ইতিহাস, সতীশ মিত্র পৃঃ ২২২)

কবে আসার সময় যখন সেতুটির প্রত্যেক বোটে লাইট পোষ্টের উপর কেরো-
সিন আলো জলত তখন যেন ছবির মত দেখাত। এখন সেতুর সে যত্ন নেই।
নূতন 'রায় ব্রীজ' হলেও এই সেতুর গুরুত্ব বেড়েছে বৈ কমে নি। এখন দিবা-
রাত্র লোক জনের; গাড়ীঘোড়ার আনাগোনা অনেক অংশে বেড়েছে; কিন্তু
যত্ন ক্রমশ কমছে। পূর্বে সেতুর দু'ধারে মোটা লোহার শিকল দিয়ে বেলিং
করা ছিল। প্রতি বৎসর রঙ্ করা হ'ত বোটগুলোতে আর রেলিং-এ। এখন
সে সেতু পূর্ব সেতুর কঙ্কাল বলা চলে। দু'ধারে জনবসতির চাপে,
দোকানের চাপে দূর থেকে দেখা যায় না। এখন বিপজ্জনকও হয়েছে।

এখন বনগ্রাম পৌর প্রতিষ্ঠানের অধীনে জন সংখ্যা যেমন বেড়েছে
আয়তনও বেড়েছে। পুরাতন পল্লীগুলির জনসংখ্যা বেড়েছে সেই সঙ্গে সঙ্গে
অনেক নূতন নূতন পল্লী গড়ে উঠেছে। যেখানে ছিল কৃষিক্ষেত্র সেখানে
উঠেছে ইমারত। যেখানে ছিল বড আম বাগান সেখানে হয়েছে সরকারী
বাজার। বনগ্রামের যে অংশে কোর্টের আমলা আর পিয়াদারা থাকতেন সেই
অংশকে বলা হত আমলাপাড়া ও পিয়াদাপাড়া এখনও সেই নাম-ই চলছে ঐ
দুটো অংশের।

যে অংশে ছিল মহাশ্মশান, জঙ্গলে ঢাকা, দিনের বেলায় লোকে যেতে
সাহস করত না সেখানে এখন জনবসতি পিচঢালা রাস্তা বিজলি বাতি,
মহাবিদ্যালয়। সেই অংশই এখন নব বনগ্রাম।

রেল লাইনের দুধারেই এখন পল্লী গড়ে উঠেছে। গান্ধীপল্লী, সুভাষপল্লী
প্রভৃতি। মতিগঞ্জের আসেপাশেও অনেক পল্লী গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে
শিমুলতলা একদিন ছিল নদীগর্ভে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই পল্লীর উৎপত্তি
ক্রমশঃ আয়তন বাড়তে বাড়তে এখন বিরাট আয়তনের গ্রাম। যে গ্রামের
প্রবেশ পথে ছিল এগারটা বিরাট বিরাট তেঁতুল গাছ সকল সময় অন্ধকার
করে রাখত, সেখানেই এখন পাকা রাস্তা বিজলি বাতির আলো ঝলমল
করছে।

কোর্ট, কাছারি, স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল একে একে
শহর-জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে। কলেরার বার্ষিক পরিক্রমা এবং
ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সহ্য করেও বনগ্রাম ব্যবসার কেন্দ্র হিসাবে তদানীন্তন
যশোহর জেলার একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। পাট, মুগ, কলাই,
ছোলা ইত্যাদি যথেষ্ট রপ্তানি হত বনগ্রাম মারফৎ। বিশেষ করে এখানকার
সোনামুগ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বলে নাম ছিল। তা ছাড়া বনগ্রামের কাঁচাগোল্লা

সন্দেশ এরূপ খ্যাতি অর্জন করেছিল যে কলিকাতায় নিত্য প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হ'ত। তরিতরকারীর উৎপাদন যথেষ্ট ছিল, এমন কি হাটে এক পয়সায় পাঁচ-দশ সের বেগুন—কেনার খরিদ্দার হ'ত না। কারো বিষণ্ণ মুখ দেখলে লোকে বলত—"বেগুন বেচা মুখ করে আছ কেন?" শীতের হাটে অনেকদিন নানা প্রকার সব্জী বিক্রী হ'ত না বলে ফেলে রেখে যেত। আজ মৎস্যহীন ইছামতী নদী দেখলে বিশ্বাস হতে চায় না যে এককালে এই নদীতেই ছিল অফুরন্ত মাছ।

বনগ্রামের স্বাধীনতা আন্দোলনের অবদান সম্পর্কেও কিছু বলার প্রয়োজন আছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা যে বনগ্রামেরই সুসন্তান দীনবন্ধু মিত্র, এ কথা বললে বোধ হয় অতিশয়োক্তি হবে না।

পরবর্তী ক্ষেত্রে ১৯২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা থেকে কিছু পরিচয় দেওয়া অযৌক্তিক হবে না। বনগ্রামের কংগ্রেসের কার্যালয় ছিল ছয়ঘরিয়া গ্রামে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে যখন বনগ্রাম থেকে স্বেচ্ছাসেবক দলে দলে যাচ্ছে কাঁদবিলায় সেই সময় যশোহরের পুলিশ কমিশনার ছিলেন মিঃ এলিসন্। সেই ইংরাজ কর্মচারীর অত্যাচারের কাহিনী হয়ত অনেকের মনে আছে। এই বনগ্রামের ওপর এলিসন্ নির্মম অত্যাচার করেছিল। ছয়ঘরিয়ায় বনগ্রাম কংগ্রেসের কার্যালয় ছিল বিজয়কুমার ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী। সেইখানে হানা দেয় এলিসন্। বিজয় ঘোষ মহাশয়ের ওপর যে কি পৈশাচিক অত্যাচার চালিয়েছিল তা বর্ণনাতীত। এছাড়া স্বেচ্ছাসেবকদের তো কথাই ছিল না। স্কুলের ছাত্র মাত্রেই পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। বনগ্রাম স্কুলের কতিপয় ছাত্রদের জন্য তদানীন্তন দফ্তরী নির্মম প্রহার খেয়েছিলেন এলিসনের হাতে। অর্ধমৃত অবস্থায় রাস্তার নয়নজুলিতে ফেলে যায় স্কুলের দফ্তরী চন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে। এই এলিসন্ নিরীহ পথচারীকেও তার সামনে পেলে রেহাই দিতনা। স্বাধীনতা আন্দোলনের শরিক হিসাবে বনগ্রাম তার যোগ্য কাজ করেছিল। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা হয়েছে।

বনগ্রামে বড় বড় ডাকাত দলের অস্তিত্ব ছিল যেমন, তেমন আবার চুরির আশঙ্কায় গৃহস্থকে বিনিদ্র থাকতে হতনা। ডাকাতদল ও তাদের অত্যাচার চলেছে কোম্পানীর আমলের প্রথম দিক পর্যন্ত। তারপর চুরি ডাকাতি বড় একটা হতনা।

বনগ্রামে শিক্ষা ব্যবস্থা তেমন কিছু ছিলনা। সারা মহকুমায় একটা

মাত্র উচ্চ বিদ্যালয়। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ কেবলমাত্র সঙ্গতি সম্পন্ন ঘরের ছেলেরাই ভোগ করতেন। ইচ্ছা করলে তারা কলকাতায় গিয়ে লেখাপড়া শিখতে পারতেন। তার পূর্বে'ত মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করাও সঙ্কটজনক ছিল। ১৮৬৮ খ্রীঃ পূর্বে কোন বিদ্যালয় ছিল না। গ্রাম্য পাঠশালার বিদ্যাই তখনকার লোকের শিক্ষার দৌড় ছিল। অবশ্য এ চিত্র পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ জায়গাতেই ছিল।

বনগ্রামে খেলাধূলারও একটা বিশেষ স্থান ছিল। যশোহর জেলার মধ্যে অন্যান্য মহাকুমা অপেক্ষা বনগ্রামের খেলোয়াড়দের খ্যাতি সর্বত্র ছিল। এখন যে মাঠকে স্টেডিয়াম বলা হয় ঐ মাঠের কিয়দাংশ বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের, অবশিষ্ট অংশ ছিল বনগ্রাম টাউন ক্লাবের মাঠ। ঐ মাঠে প্রায় প্রতিদিনই প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলা হ'ত। ভাল ভাল বাইরের 'টীম' এবং বাছা বাছা খেলোয়াড় ঐ মাঠে তখনকার দিনে খেলতে আসতেন। প্রতিদিন বেলা চারটে বাজতেই জনস্রোত চলত মাঠের দিকে। সঙ্কীর্ণ কাঁচা রাস্তাদিয়ে জল কাদা জঙ্গল পার হয়ে ঐ মাঠে খেলা দেখতে যাওয়াতে কি বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল বনগ্রামের প্রতিটি লোকের। শনি, রবিবার ছিল বিশেষ দিন। বাইরের দলগুলি ঐ দিনেই খেলতে আসতেন। তখন দলে দলে প্রতিযোগিতা ছিল কিন্তু বিদ্বেষ ছিল না। হার-জিৎ হ'ত কিন্তু মারামারি হ'ত না। তখনকার এম, এস ক্লাব (মতিগঞ্জ) আই, এফ, এ-তেও খেলেছেন।

যান বাহন বলতে গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, ভাড়াটে ট্যাক্সি প্রথম আসে এ শহরে ১৯৩০ সাল থেকে। তখনকার পর্দা প্রথা আভিজাত্য বলে গণ্য হত। ঘোড়ার গাড়ীর দরজা বন্ধ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলারা যাতায়াত করতেন। বাজার থেকে ষ্টেশনে চার জনের শোয়ারের ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া প্রত্যেকের চার পয়সা লাগত।

বনগ্রাম শহর সৃষ্টি হওয়ার পর মানুষ সাংস্কৃতিক দিকটাও উপেক্ষা করেনি। বনগ্রাম ও গোপালনগর 'ট' বাজারের চাঁদনিতে (এখন লুপ্ত) প্রতি বৎসর বারোয়ারী যাত্রা অনুষ্ঠান হ'ত। এর অর্থ বনগ্রামের ব্যবসায়ী মহল সংগ্রহ করে দিতেন। সারা বছরের কেনা-বেচার উপর টাকা প্রতি ঈশ্বর বৃত্তি নামে একটা কর আদায় করা হত। কলিকাতা থেকে তখনকার দিনের নাম করা যাত্রার দল অভিনয় করতে আসতো। তিন চার দিন ধরে এ অনুষ্ঠান চলত। স্কুলের ছাত্রদের বসবার একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকত যাত্রার আসরে! শিক্ষকদের অধীনে ছাত্রেরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিত। তখনকার দিনে

যাত্রার পালা ছিল খুব দীর্ঘ। সন্ধ্যায় আরম্ভ হ'ত আর ভাঙ্‌ত যখন তখন পরদিন প্রায় সকাল।

এছাড়া আশ পাশের অনেক গ্রামে ছিল মনসার ভাসানের দল রামায়ণ গানের দল, ঝুলন যাত্রার দল। মাঝে মাঝে ভাগবৎ পাঠ ও কীর্তন গানের আসরও বসত। ঝুলন যাত্রা ও মনসার ভাসানের দলের অভিনেতাদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে হ'ত কৃষকদের উৎসব ডাকসংক্রান্তি। শীতের প্রারম্ভে অনেক গ্রামে প্রতি সন্ধ্যায় বাড়ি বাড়ি "স্যাঁক কল" বা ফলুই এর গান গেয়ে বেড়াত কৃষক যুবকেরা। বনগ্রাম থানার পাশে বাঁধা ঘাটের উপর হরিসভার ঘরে হরিসভা বসত। পরবর্তীকালে বনগ্রাম ও আশপাশ গ্রামে বিশেষ করে ইছাপুর, ছয়ঘরিয়া ও গোবরাপুরে থিয়েটার ক্লাবের সৃষ্টি হয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এই থিয়েটারে অভিনয় করতেন।

ইছাপুরে চৌধুরী বাড়ি প্রথম যে বার থিয়েটার হয় সেবার সিনের অভাবে শতরঞ্চি টাঙিয়ে অভিনয় করা হয়। পরবর্তীকালে ছয়ঘরিয়া ইছাপুর, গোবরাপুরে সিন ও স্টেজ পাকাপাকি ভাবে করা হয়। বনগ্রামেও থিয়েটার স্টেজ ও সিন তৈরী হয়। এখন সে সবই লুপ্ত। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ক্লাবগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল যেমন আবার সহযোগিতাও ছিল তেমন-ই। অনেক শৌখিন অভিনেতা একাধিক ক্লাবেও অভিনয় করতেন। নারী চরিত্রে পুরুষেরাই অভিনয় করতেন। বনগ্রামের উকিল মোক্তারদেরও থিয়েটার ক্লাব ছিল। অভিনয়ও তাঁরা করতেন খুব উচ্চ স্তরের। ঐ থিয়েটার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে তাঁরা নিজেরা নাটক ও লিখতেন। হরিপদ মুখোপাধ্যায় উকিল [খ্যাত সাহিত্যিক শংকরের পিতৃদেব] কয়েকখানি ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক লেখেন ও অভিনয় করেন। তাঁর সেই নাটক কলিকাতার তদানীন্তন "মনমোহন থিয়েটার'এ অভিনয় হ'ত।

এখন বনগ্রামের অনেক উন্নতি হয়েছে। বনগ্রামে পৌর প্রতিষ্ঠান হয়েছে। জন সংখ্যাও পৌর এলাকায় বর্তমানে প্রায় ছাপ্পান্ন হাজার। সিনেমা হল তিনটে, টাউন হল আর পাবলিক লাইব্রেরীটাও অনেক বড় হয়েছে। পাঠাগার হিসাবে সাধুজন পাঠাগারের নামও উল্লেখ করা যায়। অভিনয় করার 'হল' ও হয়েছে ললিতমোহন বাণীভবন নামে। কিন্তু সে হলে স্টেজের অভাব লক্ষিত হয়। ঐ হলের স্থলেই গড়ে উঠেছিল থিয়েটারের স্টেজ যদিও সেটা বহু পূর্বের ঘটনা নয় তবুও বলতে হয় সেখানে অভিনয়

করার মত সুবৃহৎ স্টেজই ছিল। এই স্টেজ নির্মাণ করার পিছনে কয়েকজন অভিনয় প্রিয় বনগ্রামের সন্তানদের কায়িক ও আর্থিক অবদান ছিল। তাঁদের অনেকেই এখনও বর্তমান আছেন তবে যাঁদের অবদান অধিক ছিল তাঁদের বনগ্রাম হারিয়েছে। তাঁরা দু'জন উদয় ইন্দু তরফদার ও সতীশচন্দ্র রায়। এখন বনগ্রামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হামেশাই হয় কিন্তু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সে পরিবেশ আর ফিরে আসবে না। এখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অর্থে মাইক, হৈ-চৈ হট্টগোল।

যাত্রা অভিনয়েও বনগ্রামের অভিনেতাদের যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। যাত্রার দলের মধ্যে মতিগঞ্জের বয়েজ অপেরা, এবং পূর্বপাড়া অপেরা পার্টির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বয়েজ অপেরা পার্টি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। বয়েজ অপেরা পার্টির দক্ষ অভিনেতাদের মধ্যে হাজরাকালি নাথ ছিলেন অন্যতম। তাঁর পুত্রই এখন যাত্রা-নাট্যকার কানাইলাল নাথ। তবে শান্ত বা শুদ্ধ পরিবেশে এখন অভিনয় দেখা দুরাশা। তখনকার দিনে যাত্রা-থিয়েটার অনুষ্ঠানে টিকিটের প্রচলন হয়নি। এখন শ্রোতার সংখ্যাধিক্য আছে টিকিট-এর প্রচলনও হয়েছে। এখন শব্দ যন্ত্রে চিৎকার সম্ভবত মানুষের উৎসাহের সঞ্চার করে। এখন কৃত্রিমতার যুগ খাঁটি জিনিষ, খাঁটি মানুষ যেমন মেলে না সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে খাঁটি হতে গেলেও হয়ত সবই মাটি হয়ে যাবে। একদিন এটাই ইতিহাস হবে।

আজকের এই বর্তমান অতীত হয়ে ভবিষ্যৎ কালের মানুষদের স্মৃতিপটে সুন্দর হয়ে ফুটে উঠবে। সভ্যতা সংস্কৃতি কোনটাই 'ত স্থিতিশীল নয়। পূর্বে ভাল ছিল, কি এখন ভাল হয়েছে এ নিয়ে তর্ক করা চলে না।

ইছামতী নদীর কথা দিয়ে এই পরিচ্ছেদ আরম্ভ করেছিলাম। ইছামতী নদীর কথা দিয়েই শেষ করছি। ১৯৩৬ এবং ১৯৩৮ সালে ইছামতী তার ভীষণ মূর্তি দেখিয়েছিল। ১৯৩৮ সালের বন্যাই সমধিক প্রবল। এখন নদীর ধারে মতিগঞ্জে রাস্তার দুইপাশে যে দোতালা বাড়ী দেখা যায় তখন সেগুলি ছিল একতলা। ইছামতীর জল স্ফীত হয়ে একতলা বাড়ী সম্পূর্ণ গ্রাস করেছিল। তার উপর দিয়েই খেয়া তরী পার হয়েছে। এখন ইছামতী ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। আর মানুষ ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে, এলাকা বৃদ্ধি করছে, ইমারত গড়ছে ইছামতীর পরিত্যক্ত ভূ-ভাগে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের নিরাপত্তার জন্য বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ধরণের নৌকা নিয়ে এসে নদীর উভয় তীরে সারি দিয়ে বেঁধে রাখে। ক্রমে সেই সকল নৌকা গেল জলে

ডুবিয়ে। তার ওপর বালি আর পলি পড়ে ইছামতীর খোল ভরাট করল। অবশেষে যুদ্ধের শেষের দিকে অবশিষ্ট নৌকা তুলে মেরামত করে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করা হল। দিন রাত সমানে নৌকা মেরামতের কাজ চলতে লাগল। শিমুলতলা নৌকা মেরামতের প্রধান কার্যালয় হল। দিবারাত্র দুম দাম্ শব্দ, আর জল থেকে তোলার সময় মজুরদের বিভিন্ন উৎসাহসূচক চিৎকার। সাময়িক কর্মসংস্থান দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে হয়েছিল বটে ; কিন্তু সে ইছামতী বনগ্রাম বাসীর কাছ থেকে হারিয়ে গেল আর ফিরে আসবে না। এখন প্রায়শই অক্ষম গর্তে বয়ে আনে বন্যার জল, সাগরে পাঠানোর আগে ভাসায় শহর বনগ্রামকে। সংস্কারহীন হতশ্রী ইছামতী তবুও বনগ্রামের প্রাণ স্বরূপ।

নদী-মাতৃক বঙ্গভূমির অংশ বনগ্রামের প্রাণ কেন্দ্রের সুর বহন করছে ইছামতী যুগ যুগ ধরে। এর তীরের কত গ্রামের সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিহ্ন ধ্বংস স্তূপের নিচেয় কালের প্রহর গুনছে। বনগ্রামের কবি ও সাহিত্যিকদের কথা বলতে গেলে বনগ্রামের নদীগুলির কথা পুনরায় উল্লেখ না করে তাদের পরিচয় দিতে গেলে কি যেন অভাব মনে হয়। ইছা আর মোতি সমৃদ্ধ ইছামতী রুদ্র গতি প্রায় হলেও এরই বুকে তরী ভাসিয়ে যশোহরের প্রতাপাদিত্য ভেসে গেছেন আগ্রার পথে। এই ইছামতীর বুকেই মানসিংহের সেনা বাহিনী লড়েছে বাংলার গৌরব প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে। এই ইছামতীর তীরেই পড়ে আছে সুখপুখুরিয়ায় প্রতাপের নৌ সেনাপতি কালিচরণের ভগ্ন ইমারতের চিহ্ন আর দোয়া। জয়পুর, মোল্লাহাটী নীলকর কুঠিয়াল সাহেব-দের কুঠির ক্ষতচিহ্ন এই ইছামতী তীরেই সেই অতীতের অত্যাচার প্রপীড়িত জনগণের কথা স্মরণ করাচ্ছে।

এই ইছামতীর কুলকুল ধ্বনি তুলেছিল বিভূতিভূষণের কানে। বনকাব্যের সুর-এর তীরে তিনি দেখেছিলেন বনিয়্যবুড়ো গাছ, তিতপল্লার হলুদ রঙ-এর ফুল, ঘেঁটু আর আসশ্যাওড়ার ঝোপ আর তার আকুল করা রূপ। ইছামতীর উপনদী যমুনা, যে যমুনা বহন করে চলেছে ব্রজধামের বার্তা। সেই যমুনা তীরে চৌবেড়িয়ার চতুর্বেষ্টিত দুর্গে আকবরের সেনাপতি মানসিংহ ঘোষণা করেন আকবরের বঙ্গবিজয়। যার পটভূমিতেই রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছিলেন তাঁর 'বঙ্গবিজয়' উপন্যাস বনগ্রামের মহকুমা শাসকের গৃহ প্রাঙ্গণে বকুল-তলায় বসে। এই যমুনার কাজল কালো জলে কত কীর্তি বিলীন হয়েগেছে তার তরঙ্গ আঘাতে। যমুনা আজ মৃতপ্রায়। তার প্রাণের স্পন্দন আজ আর নেই। যমুনার তীরে চৌবেড়িয়া গ্রামের সন্তান দীনবন্ধু তাঁর বিপ্লবী লেখনী স্পর্শে প্রকাশ করলেন নীল দর্পণের পৃষ্ঠায় নীল বিদ্রোহ। যা শুধু

ভারতে নয় আলোড়ন তুলেছিল সারা বিশ্বে। এর পর দেখি ইছামতীর শাখা নদী নাওভাঙ্গা। যার প্রবল জলোচ্ছ্বাসে আর স্রোতের তাড়নে শত শত নৌকা ভাঙত। সেও আজ স্রোতহীন নিষ্প্রাণ। তার তীরেই এখন পড়ে আছে বিশ্ব বিশ্রুত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাস ভবনের ধ্বংসস্তূপ।

ইছামতীর আর একটি শাখা নদী কোদলা। কোদলার তীরেই মাথা-ভাঙার মাঠ আর জঙ্গল। এখন জন বসতিপূর্ণ হলেও অতীত ইতিহাস হারিয়ে গেছে কালের পাষাণ তলে। বনগ্রামের প্রাচীন সভ্যতা আর সংস্কৃতির চিহ্ন ছড়িয়ে আছে এই মাঠেই। এই কোদলার খেয়াঘাটে খেয়াতরী বাইতেন যে ভগবান দাস, তিনিই পরে কালনার পরম বৈষ্ণব যোগী, অদ্বৈত মহাপ্রভুর শিষ্য, ভগবান দাস গোস্বামী। এই কোদলার তীরেই রাজকোলের রাজবাড়ীর ধ্বংসস্তূপ, এই কোদলার তীরেই কুলিয়া গ্রামে জন্মেছিলেন কাশ্মীর রাজার প্রধান মন্ত্রী নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় আর প্রধান বিচারপতি ঋষিবর মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়।

ইছামতীর আরও দুইটি শাখা নদী বেত্রবতী (বেতনা) আর হাঁকোর। এই হাঁকোরের তীরেই ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের আদালত। এখন পরিত্যক্ত গ্রাম জয়ন্তীপুর। এ ছাড়া আছে মরালী নদী। এখন মরালীর মরাল গতি রুদ্ধ। গঙ্গা আর যমুনার যোগসূত্র রচনা করেছিল এই মরালী। তার তীরে দীর্ঘকাল জঙ্গলে ঢাকা ছিল শিমুলিয়া শ্রীনগরের সকল শ্রী। এ ছাড়া বনগ্রামে আছে বহু বাঁওড়। যেগুলি ইছামতী আর তার শাখানদীর পথ পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। এমনি এক বাঁওড়ের তীরে গোবরাপুর এখনও শাক্তশৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের মিলন ক্ষেত্রের সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই বনগ্রামের পথে গেছেন ঠাকুর হরিদাস। হরিদাসপুরে তার কয়েকদিনের অবস্থিতির কথা স্মরণ করাচ্ছে। এই পথের ধারে হীরার গাছ জানাচ্ছে হীরা নটীর বৈরাগ্যের স্মৃতি চিহ্ন। তন্ত্র সাধনার কেন্দ্রস্থল ছিল এই বনগ্রাম। এখানে যেমন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তন্ত্রসাধকদের সাধন পীঠ তেমনি ছড়িয়ে আছে বৌদ্ধ সংস্কৃতির ছাপ।

কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টিতে বনগ্রামের নদী আর বন প্রকৃতির প্রভাব যথেষ্ট এ কথার সত্যতা তার কাব্য ও সাহিত্যেই নিহিত। সাহিত্য সৃষ্টির আর রস পরিবেশনে বনগ্রামের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। বিখ্যাত মোহনদাস বৈরাগী (সরকার) গোপালনগরে জন্মেছিলেন। ছুটগান রচনা করে তখনকার দিনে বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়ে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের

নীতিকে সম্পূর্ণ বর্জন করে সেই যুগেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে সাহিত্যে আধুনিক রসসিঞ্চন করে গ্রাম বাংলার সর্বহারা জনগণের ব্যথা বেদনার রূপ ফুটিয়ে তুললেন বনগ্রামের সন্তান তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'স্বর্ণলতায়'। দীনবন্ধু, রাখালদাস,বিভূতিভূষণের কথা উল্লেখ বিশেষ করে করার দরকার মনে করি না। তারা সরস্বতীর বরপুত্র বিশ্ববিশ্রুত। এই ক্ষুদ্র লেখনীতে সে বিশালকে ধরতে প্রয়াস পাওয়া নিরর্থক। বিস্মৃতির অতল তলে যারা ডুবতে চলেছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি। তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে গরীবপুরের গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় প্রেমের কবি রূপে পরিচিত ছিলেন। 'বেলা' 'পরিমল' ও 'পত্রপুষ্প' তার কাব্যগ্রন্থ গভীর রসানুভূতির বিকাশ। যমুনাতীরে ইছাপুর গ্রামের সন্তান বনগ্রামের খ্যাতনামা উকিল যাঁর পুত্র বর্তমানে সাহিত্য জগতে 'শঙ্কর' নামে তরুণ বয়সেই প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন সেই হরিপদ মুখোপাধ্যায়। একদিন তিনি নাটক রচনা করে তদানীন্তন অভিনয়প্রিয় জনগণের মনের খোরাক দিয়েছেন। 'দধীচি, 'রামপ্রসাদ 'রাণীদুর্গাবতী' প্রভৃতি নাটক তদানীন্তন মনমোহন থিয়েটারে দীর্ঘকাল অভিনীত হয়েছে। এ সময় যাঁরা সাহিত্য চর্চা করতেন ও সংস্কৃতির দীপ্তি উজ্জ্বল রেখেছিলেন তাদের মধ্যে গরীবপুরের বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়, বনগ্রামের সুখ্যাত দত্ত বংশোদ্ভব জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত। চারুচন্দ্র রায় বৈরামপুর গ্রামের সন্তান, বনগ্রামের পল্লীবার্তা পত্রিকার স্রষ্টা। 'গল্পে তুফান' ও 'নিকার বিবি' তার গ্রন্থ দুইখানি তখনকার দিনে বহু সমাদর লাভ করেছিল। চারুচন্দ্রের পুত্র মনোজকুমার রায়ের কথাও ভোলার নয়। তিনি শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না সাংবাদিকও ছিলেন।

তখনকার দিনের আর বর্তমান কালের মধ্যে বনগ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতির এতকাল যে দুইজন সেতু রচনা করে রেখেছেন সেই দুইজন সাহিত্যিক এর নাম বিশেষভাবে করা যায়। মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় বিভূতি-ভূষণ এর অগ্রজ সুহৃদ অপর জন শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ এর মিতে। মন্মথনাথ প্রবন্ধ রচনায় আর বিভূতিভূষণ ছোট গল্পে কৃতিত্বের অধিকারী। বিভূতিভূষণের মিতে বিভূতি মুখোপাধ্যায় এর রচিত 'অক্রুর সংবাদ' আর 'সুর সপ্তক'। মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি লোকান্তরিত হয়েছেন। তার বাড়ির বহিঃপ্রাঙ্গনের লিচুগাছ এখনও অনেককে স্মরণ করায় তাঁদের লিচুতলা ক্লাবের কথা। এই লিচু গাছের তলায় বসে সাহিত্য আলোচনা চলত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তার মিতে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকের। আজ আর

বৈকালিক সে আসরের চিহ্নও নেই।

শিমুলতলার অধিবাসী শিবপ্রসাদ ঘটক-এর কথাও বেদনার সঙ্গে মনে পড়ছে। তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন প্রৌঢ়ত্বের প্রথম ধাপে পা দিয়েই। তাঁর 'শেষ প্রতিশ্রুতি', 'মনিশিখা,' 'শর্ব্বরী' উপন্যাস তিনখানি প্রকাশ লাভ করেছিল। এখনও অনেক লেখাই তাঁর প্রকাশিত হয় নি।

কবি মনীন্দ্রনাথ রায় ইনিও ইহধাম ছেড়েছেন কয়েক বৎসর। বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হত। তাঁর কবিতা গভীর রসানুভূতির দাবি রাখে। তিনি শিক্ষাব্রতী ছিলেন। বনগ্রাম ঘোষ ইন্‌ষ্টিটিউশানের প্রাথমিক বিভাগে শিক্ষকতা করতেন।

ইদানীংকালের শক্তিমান এবং সুখ্যাত কাথাসাহিত্যিক 'শংকর' এর পিতৃভূমি এই বনগ্রাম। তাঁব সুবিখ্যাত উপন্যাসগুলি পাঠকের মনে অনাস্বাদিত রসদ যোগাচ্ছে এখনও। শংকর (মনিশংকর মুখোপাধ্যায়) এই বনগ্রামেরই নন্দন। আমলাপাড়া তাঁব পৈতৃক নিবাস।

বনগ্রামেব যে সকল সাহিত্যিক ও কবি বর্তমানে সাহিত্য ও কাব্যের সাধনা করে চলেছেন তাঁদের সকলের সঙ্গে এখনও পরিচয় ঘটেনি। যাঁদের সঙ্গে আমার কিছুটা পরিচয় আছে তাঁদের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয়।

বনগ্রামে লেখকের সংখ্যা উৎসাহের সঞ্চার করে। সকলের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। বনগ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতির তাঁরাই ধারক ও বাহক। বর্তমানে বনগ্রামের সাহিত্য পত্রিকার সংখ্যা আশার দ্যোতক। ছোট মহকুমা শহরের ও তার গ্রামের জনগণের প্রেরণার উৎস এই পত্র-পত্রিকাগুলিই বনগ্রামের জনগণের মানসিকতাব প্রতিফলন। বনগ্রামের বনরাজির মর্ম্মরধ্বনি একদিন বিভূতিভূষণকে প্রেরণা দিয়েছিল। বনগ্রামের বনবাজি পত্র-পুষ্প যে সুশোভিত একথা বলা চলে। নবীন প্রবীণের সাহিত্য সাধনার বিকাশ ঘটছে এই সব পত্র-পত্রিকায়। একদিন কত সাহিত্যসেবী ছিলেন যাঁদের সাধনা প্রতিফলিত হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। কত কাব্য কত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে অন্তরালে, অন্তরালেই প্রস্ফুটিত হওয়ার অভাবে ঝরে গেছে। ইতিহাস হয়ত তাদের নাম করবে না কিন্তু তাদের সেই প্রচেষ্টা অন্তরালে থেকেই আজকের সাহিত্য ও কাব্য সেবকদের প্রেরণা দিয়েছে। অতীতের সাহিত্য ও রুচিবোধের সঙ্গে বর্তমানে হয়ত মিলের যথেষ্ট অভাব আছে তবুও একথা বলব সেকাল সেকালই আর একাল একাল। সুতরাং ভাল মন্দের তুলনা ও বিচার কালই করবে; ইতিহাস করবে না। সকলের প্রচেষ্টাতেই বনগ্রাম মহিমান্বিত হয়ে ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করবে সর্বকালে সর্বযুগে।

সাতভেয়ে কালীতলা

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল বন্যায় সারা ভারত প্লাবিত হ'লেও, বিপ্লবী বঙ্গ সন্তানদের অনেকে সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নি। তাঁরা বৌদ্ধধর্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধবাদী সাধক আর ধর্মবেত্তাদের বিষয়ে যতদূর জানা যায় তাতে দেখা যায় যে তাঁরা তান্ত্রিক ছিলেন। সেই সব তান্ত্রিক সাধকদের নীতি যুদ্ধে ও শাস্ত্র সঙ্গত যুক্তিতে পরাভূত করতে শঙ্করাচার্যেরও অনেক চেষ্টা করতে হয়েছিল। সেই অতীত দিনের তান্ত্রিক সাধক অধ্যুষিত ইছামতী তটেই আজকের এই বনগ্রাম।

প্রাকৃতিক গভীর অরণ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বহু তান্ত্রিক সাধক তন্ত্রসাধনার উপযুক্ত জায়গা বলেই এই নির্জন বনগাঁয় তাঁদের আশ্রম স্থাপন করেছিলেন অনেক জায়গায়। তাঁরা সে সকল স্থানে কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সাধনায় রত থাকতেন। তান্ত্রিক সাধকরা অহিংস ছিলেন না। দেবতার তৃপ্ত্যর্থে তাঁরা কেবল মাত্র পশু বলি দিতেন তা নয় নরবলিও দিতেন। তারা কেবলমাত্র ধ্যানধারণায় রত থাকতেন এ রকমও দেখা যায় না। দেশ ও ব্রহ্মণ্যধর্মের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে বৌদ্ধধর্মের শক্তিশালী প্রচারকদের বিরুদ্ধে তাঁরা একটা জোরাল সংঘ গঠন করেছিলেন। শক্তি স্বরূপিনী কালীমাতার পূজা শেষ করে তাঁরা তাঁদের কর্তব্য পথে অগ্রসর হতেন।

এই তান্ত্রিক সাধকদের সংঘকে একটা শক্তিশালী সৈন্য দল বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁদের সংঘের ব্যয়ভার লুণ্ঠিত সম্পদ থেকেই নির্বাহ করা হত। সুমহান ব্রাহ্মণ্য ধর্ম রক্ষার জন্য তাঁরা রাজধর্ম-পুষ্ট লোকেদের সঙ্গে প্রায়ই সংঘর্ষে লিপ্ত হতে বাধ্য হতেন। বনগ্রামে সেই তান্ত্রিক সাধকদের ঐতিহাসিক নিদর্শন আজও বিদ্যমান।

"সাত-ভেয়ে কালীতলা" নামে সর্বজন-পরিচিত যে পীঠস্থান এতদঞ্চলের হিন্দুদের কাছে পরম পুণ্যময় স্থান বলে পূজিত হয়ে আসছে, তা একদিন অতীতের সেই তান্ত্রিক সাধকরাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্তমানে অতীতের সেই পাষাণময় দেবীমূর্তি বটগাছের গহ্বরে ঢাকা পড়ে গেছে। তবুও, সেই যুগ-সন্ধিক্ষণের মাহাত্ম্য আজও দেশবাসীর অন্তরে চিরজাগ্রত হয়ে আছে। কালচক্রের দুর্বার গতির পিছনে নানা রকম সংস্কার আর কিংবদন্তী থেকে যায়। অতীত ঐতিহ্যের কোন বিশেষ নিদর্শন বর্তমানে না পাওয়া গেলেও ঐসব সংস্কার আর কিংবদন্তীর থেকে অনুমান করা যায় যে কোন বৃহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই সাধকেরা তাঁদের সাধনায় রত থাকতেন। তাঁদের যে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য ছিল, এরকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সে কারণে তাঁদের এই শক্তি সাধনা যে কোন একটা মহত্তর উদ্দেশামুখী ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

দীর্ঘ ঘটনাবলী যার কোন লিখিত বা অন্য কোন প্রকার প্রামাণ্য নিদর্শন নেই, সেই সকল ঘটনা কৌতুহলী লোকের অন্তরে সদাই দোলা দিয়ে থাকে। মনে প্রশ্ন জাগে, যাঁরা ডাকাত, লুণ্ঠন আর হত্যা যাঁদের ধর্মের অঙ্গ, তাঁদের এরূপ সাধনা একটা ভণ্ডামী বৈ আর কি! কিন্তু একথা সত্য যে ঐ 'সাত-ভাই' সকলেই সংসার ত্যাগী সাধক ছিলেন। দেশাত্মবোধ আর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রীতিই তাঁদের ঐ ধর্মে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করতে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেন। নিজের প্রভাব বিস্তারের জন্য হর্ষবর্দ্ধন অহিংসা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ছল, বল, কৌশল সবই প্রয়োগ করেছিলেন, তবুও ভারতের অন্যান্য অংশের মত বাংলাকে সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধ ধর্মের প্লাবনে প্লাবিত করতে পারেন নি। তান্ত্রিক সাধকরাই তাঁর সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেন। এই তান্ত্রিক সাধকরা তাঁদের শক্তি ও চেষ্টা কেবলমাত্র যে বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, এমন নয়। ভারতের অন্যান্য অংশেও তাঁদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু বাংলাই ছিল তাঁদের সংঘের প্রাণ কেন্দ্র।

বনগ্রামকে কেন্দ্র করে পূর্ব পশ্চিমে ও উত্তরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁদের প্রভাবাধীন ছিল। দক্ষিণে সমুদ্র ও ইছামতী নদীর সঙ্গে বৃহত্তর নদ-নদীর সুবিধাজনক সংযোগ থাকায় ঐ সব ধর্মবেত্তারা এই বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগকেই তাঁদের কর্ম-কেন্দ্র হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন।

বৌদ্ধ পাল রাজাদের আমলেও দেখা যায় যে, তাঁরা ইছামতী তীরের এই বিপ্লবী তান্ত্রিকদের দমন করতে পারেন নি। পরবর্তীকালে বাংলা-

দেশের নানা স্থানে বৌদ্ধ মন্দিরের ও মৃত্তিকা নিম্নে প্রোথিত বুদ্ধ মূর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, বর্তমানেও পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু বনগ্রাম বা তার চতুষ্পার্শ্বের অঞ্চলে আজও সেরকম কিছু আবিষ্কৃত হয়নি। এর থেকে অনুমান করা যায় যে এতদঞ্চলের তদানীন্তন অধিবাসীরা শক্তি উপাসকই ছিলেন।

"সাত ভাই" প্রতিষ্ঠিত "ডাকাতে কালী" বলে অভিহিত হলেও চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অনুমান করতে পারেন যে, যাঁরা সাধক সংসার ত্যাগী জনকল্যাণ বা দেশাত্মবোধ ছাড়া ব্যক্তিগত সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ঐরূপ কাজ করতে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কোন মহত্তর উদ্দেশ্যে সিদ্ধিলাভ করার মানসে দেবতার আশীর্বাণী নিয়ে কর্মপথে অগ্রসর হবার জন্য তারা এই পুণ্য পীঠস্থান প্রতিষ্ঠা করেন।

ঐ সাতভাই বাংলাদেশের যাঁরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের বাড়ি যে লুণ্ঠন করতেন তা নয়। বৌদ্ধদের ধরে এনে মায়ের সামনে বলি দিতেন। লুণ্ঠিত সম্পদ তারা দুস্থ জনদের বিতরণ করতেন। সত্য অসত্যের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে গেলে হয়ত আজ অনেক কাহিনী অবান্তর বলে মনে হবে তবুও সবই যখন অন্ধকারে তখন এই সব প্রচলিত কাহিনী আর আর মানুষের বিশ্বাস অন্ধ হলেও এক্ষেত্রে তার মূল্য না দিয়ে পারা যায় না। এরকম দস্যু বৃত্তির সম্বন্ধে বহু কাহিনীই শোনা যায়, দস্যুদের সহৃদয়তার পরিচয় অনেক পাওয়া যায় কিন্তু এই তান্ত্রিক সাধকরা তার কিছুটা ব্যাতক্রম বলে মনে হয়। সবই রহস্যাবৃত আর সে রহস্য ভেদ করাও বর্তমানে অসম্ভব। সে কারণে সরল বিশ্বাস আর সহজ প্রমাণের উপর ভিত্তি করে কাহিনী রচনা করা ছাড়া উপায় থাকে না।

দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে, অতীতের যুগসন্ধিক্ষণে যে সাধকেরা এই কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরা অমরধামে গমন করেছেন। তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টাকে বর্তমানে ডাকাতি বললেও আজও ধর্মপ্রাণ হিন্দু জাতি অতীত দিনের ঐ পুণ্য পীঠস্থানের মাহাত্ম্য সর্বান্তকরণে স্বীকার করেন। এমন কি জাগ্রত দেবতার নানারূপ উপাখ্যানও প্রচলিত হয়ে আসছে। পীঠস্থানে বর্তমানে শনি ও মঙ্গলবারে ভক্তজনের বিশেষ ভিড় হয়ে থাকে। পৌষ সংক্রান্তির দিনে বিপুল জনসমাগম হয়। ঐ দিন মা তাঁর সন্তানদের যেন শত হস্তে অন্ন দান করেন। বনগ্রামের স্থানীয় বিশেষ উৎসব বলতে ঐ দিনটাকেই বোঝায়। ও'দিনে পীঠস্থানে কোন বর্ণবৈষম্য স্থান পায় না

বা কোন আভিজাত্যের আড়ম্বরও ঠাঁই পায় না। মহাশক্তি স্বরূপিণী মহাকালী তাঁর ভক্ত সন্তানদের দিয়েই তাঁর স্নেহ মাখা হাতে সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করেন।

কালীমাতার জাগ্রত সত্তা সম্বন্ধে যে উপাখ্যানটি শোনা যায় তা বেশী দিনের সৃষ্টি নয়। ইছামতী নদীর উপর রেলের সেতু বনগ্রাম ষ্টেশন থেকে সোজাসুজি ভাবে নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি এই পীঠস্থানের মাহাত্মো। বর্তমানে যে বিশাল বটগাছটার অভ্যন্তরে মায়ের পাষাণ মূর্তি লুকিয়ে আছে, এই বটগাছের চারিদিকে গভীর আর দুর্গম জঙ্গল ছিল। খ্রীষ্টান ইউরোপীয় রেলের কর্মীগণ বনগ্রাম ষ্টেশন থেকে যশোর খুলনা পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ করার কালে পথিমধ্যে এই বটগাছটি কাটার প্রয়োজন বোধ করেন। আর ঐ বট-গাছের ঠিক নিচেয় ইছামতী নদী অতিক্রম করার জন্য একটি সেতু নির্মাণের সঙ্কল্প করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় গাছের গায়ে কুঠার আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের রক্তেরন্যায় রক্ত বার হতে থাকে। একাজে যে সাহেব নিযুক্ত ছিলেন তিনি রক্ত বমি করে মারা যান তখনই। শেষ পর্যন্ত রেলেপথ কর্তৃপক্ষ তাঁদের সেতু নির্মাণের স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। তখন রেল কোম্পানী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী হলেও সেই প্রচ্ছন্ন দেবতার বিপুলভাবে পূজার ব্যবস্থা করেন। সেই থেকে 'সাত ভায়ে' কালীর মাহাত্ম্য দিকে দিকে প্রচারিত হয়ে পড়ে। অনতিকাল মধ্যে ঐ স্থান পুণ্যময় পীঠস্থানে পরিণত হয়। কোম্পানীর আমল যতদিন ছিল ততদিন এখানে রেল কর্তৃপক্ষ পৌষ সংক্রা-ন্তিতে পূজা দিতেন। বর্তমানে জাগ্রত দেবতা জ্ঞানে ভক্তবৃন্দ সাতভাই প্রতিষ্ঠিত কালীমাতার পূজা দিয়ে থাকেন। এখনও এখানে ছাগ বলির ব্যবস্থা আছে। অনেকে মানৎ করে গাছের গায়ে ঢিল অথবা ইঁট বেঁধে রাখেন। কামনা পূরণ হলেই তারা মাকে ভার মুক্ত করেন। শক্তি-স্বরূপিণী মহাকালী অনন্তকালের দরবারে তাঁর সন্তানদের দুঃখভার লাঘব করার অনুরোধ জানান। সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে নিজের মাহাত্ম্য অক্ষুন্ন রাখেন।

আজ জনবসতি বেড়েছে শুধু তা নয় লোক সংখ্যাও বিপুলভাবে বেড়েছে। আবার যাতায়াতের ব্যবস্থাও ভাল হয়েছে। আগেকার নৌকা করে যাওয়া আসার প্রথা তো আছেই তা ছাড়া পীচের সড়ক, রামনগর রোড, কালীতালার উপর দিয়েই গিয়েছে। নিত্য বাস, লরি, রিক্সার আনাগোনা তাতেও লোকজন যায় মায়ের থানে অর্ঘ্য দিতে। কালীতলায়

রান্না করে খাওয়াটা পুণ্যের কাজ বলেই অনেক মনে করেন তাই সেখানে বিশেষ করে পৌষ মাসে বিরাট যজ্ঞস্থল হয়ে ওঠে। পৌষ সংক্রান্তিতে এখানে বিশাল মেলায় মিলিত হন বহু মানুষ আজকাল শব্দযন্ত্র. না হলে কোন পূজাতেই যেন প্রাণের স্পন্দন তোলে না। তাই মাইক সহযোগে নৌকা করে যাওয়াটা একটা নূতন ফ্যাশন হয়েছে। আর সেখানে একাধিক শব্দ যন্ত্রের বিকট আওয়াজ মায়ের চেলা চামুণ্ডাদের মার কাছ ছাড়া করেছে। সেই অশরীরী চেলা চামুণ্ডারা এতকাল মানুষের কত অজনা আশঙ্কার উদ্রেক করত আর আজ শব্দ যখন ব্রহ্ম তখন ব্রহ্মদৈত্য কেন স্বয়ং ভূতনাথও জেগে উঠে অমরধামে গেছেন। সত্য কথা বলতে কি আজ দোকান পসার বেড়েছে জনবসতি হয়েছে চারিধারে কিন্তু মায়ের প্রতি যে ভক্তি তার উৎস বোধ হয় শুকিয়ে গেছে। আজ হট্টগোল প্রিয় ভক্তজন সেই হট্ট মন্দিরে মায়ের অট্টহাস্য ডুবিয়ে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন। মা দয়াময়ী সবই উপেক্ষা করে সন্তানদের সকল দৌরাত্ম্য নিশ্চয় নরীবে সহ্য করছেন !

৩

বনগ্রামের কথ্যভাষা

বনগ্রামের আঞ্চলিক কথ্যভাষারও একটা বিশেষত্ব ছিল। বর্তমানে অবশ্য অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন আঞ্চলিক কথ্যভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে। যার ফলে বনগ্রামের যাঁরা প্রাচীন অধিবাসী তাঁরা তাঁদের অতীতের ভাষার বৈশিষ্ট্য একরকম হারিয়ে ফেলেছেন। বর্তমানে নদীয়ার শান্তিপুর, কৃষ্ণনগরের কথ্যভাষার প্রভাব বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হচ্ছে যাঁরা বনগ্রামের নবাগত তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ আঞ্চলিক কথ্যভাষা যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করে চলেছেন। বনগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা তাঁদের কাছে কোন বিশুদ্ধ আদর্শ স্থাপন করতে সক্ষম হয়নি। সেই কারণে তাঁরা বনগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় প্রভাবিত হতে পারেন নি।

বনগ্রামের আঞ্চলিক কথ্যভাষা বাঙ্গাল বা ঘটি কোন পর্যায়ে পড়ে না। পূর্ববঙ্গের ভাষায় যেমন একটা টান বা সুর আছে বনগ্রামের ভাষায় তার বিশেষ অভাব। উপরন্তু ক্রিয়াপদে তারতম্য বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

যেমন:—কোরতি পাল্লাম না। নেতি খেতি ব্যালা গেলো যেতি পাল্লাম না। খবানি, হঅচ্ছে, দিয়েলো, খেয়েলো, ইত্যাদি। আবার দেখা যায়—লেবু।। নেবু, আম॥ আঁব, কাঁঠাল॥ ক্যাটাল। তুমি কেডা। হাগা কন্‌ থে কতা কচ্চো (কোথা থেকে কথা বলছ)। কোর কাঁদায় শোর (কুয়োর ধারে শুয়োর)। গেলাম॥ গ্যেলাম, বৈঠা॥ বোটে, দাঁড়িয়ে॥ দেঁইড়ে, ওখানে॥ ঐ ঠাওি,. বাঘ॥ বড় শেয়াল, উনান॥ আকা, তর্ক

তক্কো। তোমার আর নছল্ল। কয়তি হবে না।

মুগের ডাল ॥ মুগীর ডাল, মটরডাল ॥ বুটির ডাল, পুবের ঘর ॥ পুবীর ঘর, কুলের অম্বল ॥ কুলীর অম্বল, নেমে যা ॥ উলেযা, ধরতে পারলে না ॥ ধরতি পাল্লে না, শোবো কোথায় ॥ শোবানি কনে, পড়তে গিয়েছিলাম ॥ পড়তি গিয়েলাম। এদিকে আয় ॥ হ্যাদে আয়, ওহে ॥ হ্যারা, লোক ॥ মিনসে, কড়কিয়া ॥ কড়াংকে, শতকিয়া ॥ সট্‌কে, রাগ বা ক্রোধ ॥ টেংরী ইত্যাদি।

ডাক্তার বল্‌চে বড্ড শক্ত ব্যামো ওষুধ না খেলি ব্যামো সারবে কনথে। "গোয়ালে গরু তোলার সময় হচ্ছে (গৈলি গোর তোলার সময় হঅচ্চে) ব্যান ব্যালা গাংএর ঘটে বাসন মাজদি গিয়েলাম। ঘাটের ধারে ভস্‌চাজ্জিদির চড়ায় পেল্লায় এ্যাক কচ্ছোম উঠেলো ডিম পাড়তি। আমার সোমর না পেয়ে হুড় হুড় করি নামতি নাগল।" "ওদিক পানে ঝাসনে বাপ্‌ গোত্তি ঘুঁতোবে।" "ইদিপানে নিওম হোলো গিয়ে ধানে বড় মাল্‌তো।"

এ অঞ্চলে "অ" শ্রুত "ব" শ্রুতি বা অপিনিহিতি বা স্বরাগম ইত্যাদির নিদর্শন শব্দে খুব কম মেলে।

তবে স্বর সংগতির কিছু নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়, যেমন :— উড়ানী ॥ উড়্‌নী, কুঁজা ॥ কুঁজো, মিথ্যা ॥ মিথ্যে, ইচ্ছা ॥ ইচ্ছে, ফিতা ॥ ফিতে, বিকাল ॥ বিকেল, দেশী ॥ দিশি, মুলা ॥ মুলো, নৌকা ॥ নৌকো, পূজা ॥ পুজো, বিনা ॥ বিনি বা বিনে, কুলা ॥ কুলো, বেগুন ॥ বাগুন ইত্যাদি।

বর্ণ সমীকরণ বা সমীভবনও লক্ষ্য করা যায়, যেমন :—অধর্ম ॥ অধম্ম, কর্ম ॥ কম্মো, গল্প ॥ গপ্‌পো, কর্পূর ॥ কপ্‌পুর, চরণামৃত ॥ চন্নমেত্তো ইত্যাদি।

অসমীকরণ বা বিষম বর্ণতা, যেমন :—রাঙা ॥ নাঙা, শরীর ॥ শরীল, লাঙ্গল ॥ নাঙ্গল, লাউ। নাউ, নৌকো ॥ লৌকা, নৌকো বা লা। কাঁকড়া ॥ ক্যাকড়া, লবঙ্গ ॥ লংগ ইত্যাদি।

বর্ণ বিকৃতি, যেমন :—বাষ্প ॥ ভাপ, ধাইমা ॥ দাইমা, কিছু ॥ কিচ্ছু, দরজা ॥ দর্জা, প্রণাম ॥ পেন্নাম ॥ ইত্যাদি।

ঘোষীভবন, যেমন :—কাক ॥ কাগ, শাক ॥ শাগ, নেড়ে ॥ মেগে। ইত্যাদি।

এ অঞ্চলের কতকগুলি প্রচলিত ছড়ার উল্লেখ করা যায়। যেমন :—

(১) নিতি পারি খেতি পারি দিতি পারি নে,

বলতি পারি কইতি পারি সইতি পারিনে।

(২) ও শিব্‌লি অস্‌ দিবি;
যে তোমার মুকের বাণী
অস্‌ ছেড়ে 'গুড় দোবানি।

(৩) বড কথা মনে পোলা আঁচাতি আঁচাতি,
ঠাকুরঝিরে নিয়ে গ্যালো নাচাতি নাচাতি।

(৪) কচুর পাতায় পারত যতি জল মানাতি,
বাবুরা কিনতো না আর ট্যাকা দিয়ে কলের ছাতি।

(৫) রাম ছাগলে পারত যদি বাবুদের নিয়ে যেতি,
বডবাবু পালত কি আর মানুষ মারা পাগলা হাতী।

সভাতে এ মিনতি।

এবার অশিক্ষিত যাত্রাদলের অভিনয়ের কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। লিখিত ভাষা কণ্ঠস্থ করেও অভিনয়কালে তা ভুলে গিয়ে নিজস্ব খুশীমত কথা মুখ দিয়ে বার হ'ত। করুণ রসের জায়গায় হাস্য রসের সৃষ্টি হ'ত। (অবশ্য সংলাপও তথাকথিত গ্রাম্য শিক্ষিত লেখকের লেখা।) লেখক ও অভিনেতা অধিকাংশ মুসলমান। [রামের বনবাস]

দশরথ—বাপ্ রাম, তুই বোনে ঝাসনে বাপ্, তুই বোনে গেলি পর মোর পরাণডা খেন্‌চে খেন্‌চে ওট্‌পে। এবারডা মোর কথা নাক্ বাপ্।

রাম—না মুই ঝাবুই, ঝাবুই, ঝাবুই।

দশরথ—ঝাবি তা ঝা, ঝা বেটাব ছেলে ঝা।

[প্রহ্লাদ চরিত]

জয়, বিজয়—কনে আম কনে কেষ্ট কনে বনমালী হরি, বেম্ম শাঁপ পড়্‌ছে মাথায়।

[মনসার ভাসানে একটি নৃত্য গীতের অংশ]

রামা মুন্দোভরাস বোলে মোরে ডাকছিলে কেডা? আমি থাকি চাক্‌দার ঘাটে জাললি পার সেডা। (নৃত্য)

আবার আর একটি বাক্যের নমুনা, যেমন:—

আসছেন এবার গ্যাঁজাতে ॥ আস্‌ছেন এবারডা গ্যাঁজাতি। "ডাক্তার-বাবু, খোকার বাপের কাল ব্যানে জর এয়েলো চৌপর দিন রাত বেব্‌ভুল, তালা মেরে পড়ে ছেলো। এখন ডাকলি পর একটু সোমর নেচ্চে।"

১৯২৪।২৫ খ্রীঃ থেকে বসিরহাট অঞ্চলের বেশ কিছু সংখ্যক লোক এসেছেন এ অঞ্চলে। তারা নূতন বসতি স্থাপন করেছেন—নূতনগ্রাম,

চর পোলতা, চর চাঁপাবেড়িয়া ইত্যাদি অঞ্চলে। তাছাড়া শিমুলতলা এবং বনগ্রামের আসে পাশেও অনেক গ্রামে তাঁদের কিছু কিছু বসতি ঘটেছে। তাঁদের কথিত ভাষায় এ অঞ্চলের ভাষা প্রভাব বিস্তার করলেও তাঁদের কথ্য ভাষায় এখনও কিছু শব্দ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে।

কয়েকটি শব্দ, যেমন :—

শোওয়া—শোবা, প্রণাম—সাবা, খাওয়া—খাবা, দক্ষিণ—দখিন, হলুদ—হলদি, দিয়ে—দে, নামা—লাবা, নাদা—ডাবা, দোয়াত—দোৎ, দাদাঠাকুর—দাঠাউর।

কি করছ – কি করতিচাও, দিয়েছ—দেচাও, শক্ত—টুংকো।

একটা বাক্য, যেমন : ময়রা মশায়, বিরখণ্ডিতি কি ছানা দেচাও? হুঁ দেচাও, সেতটা দ্যাওনি নইলি এ্যাতো টুংকো হবে কেন?

নীলাম্বরেরা বাড়ী গিয়েছিল॥ নীলাম্বর আস বাড়ী গেলো। শীত লাগছে॥ শীত্তি লাগতিছে।

দাওয়া বা বারান্দাকে এ অঞ্চলে বলে পিঁড়ে কিন্তু বসিরহাট অঞ্চলের আগত যাঁরা তাঁরা বলেন "হাৎনে"।

কাস্তে কে বলেন কাঁচি, পাতিয়া বা পেতে কে বলেন পেড়ে তবে একথা ঠিক বহিরাগতদের ভাষার প্রভাব এ অঞ্চলের ভাষার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এখনও গ্রাম অঞ্চলে কথ্য ভাষায় স্থানীয় প্রভাব যথেষ্ট আছে। পরিবর্তন যা ঘটেছে তা স্থানীয় কিছু সংখ্যক শহর ঘেঁষা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, যাঁরা ছিলেন, যাঁরা কলিকাতা বা নদীয়া অঞ্চলের কথ্য ভাষা ব্যবহার করতেন তাঁদের কথ্য ভাষার প্রভাব স্থানীয় লোকেদের ভাষার উপর, পড়ে আসছিল দীর্ঘদিন ধরে। তারপর বঙ্গ ভঙ্গের পর বাহিরাগতরা যেমন সচেষ্ট হয়েছেন শান্তিপুর, কৃষ্ণনগরের ভাষাকে আয়ত্ব করতে স্থানীয় লোকেরাও সেরকমভাবে সচেষ্ট হয়েছেন ঐ ভাষা থেকে নিজেদের কথ্য ভাষা করে নিতে।

মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের লোকেদের এতদ্ অঞ্চলের লোকেরা উত্তুরে বলে থাকেন। তাঁদের বসতি কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে না থাকলেও কিছু সংখ্যক বনগ্রামের আসেপাশের গ্রামাঞ্চলে আছেন। বৈবাহিক সম্বন্ধ সূত্রে অথবা কর্মস্থল হিসাবে এখানে এসে এ অঞ্চলে থেকে গেছেন। তাদের ভাষার কয়েকটি উদাহরণ দিলাম, যেমন :—

বাবা ভাত খাচ্ছেন—বাবা ভাত খেলছে। দাদা মাঠে গিয়েছেন—দাদা মাঠে খেলছে।

কয়েকটি শব্দ, যেমন :-খড়—খ্যার, তেল --ত্যাল, বেল - ব্যাল ইত্যাদি।

পূর্ববঙ্গের জন সংখ্যাই অধিক হলেও তাঁরা বিশেষ কোন এক অঞ্চল থেকে আসেন নি সেখানেও বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন কথ্য ভাষা। যেমন ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোহর প্রভৃতি অঞ্চলের বিভিন্ন কথ্য ভাষা এবং বিভিন্ন টান বা সুর। তাঁদের পূবের আঞ্চলিক ভাষা সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেন নি আবার অনেকেই স্থানীয় লোকেদের মত শান্তিপুর, কৃষ্ণনগরের কথিত ভাষাকে আপন করে নেবার চেষ্টা করেছেন। বনগ্রামে আদিবাসীর সংখ্যাও কম নয়। তাদের আদিবাসী বলা হলেও তারা নীলকর সাহেবদের আমদানী সাঁওতাল পরগণার। তাঁরা স্থানীয় ভাষায় কথা বললেও কথার একটা স্বতন্ত্র টান এখনও আছে। আবার কারও কারও নেই।

বনগ্রামের মুসলমান জন সমাজের ভাষারও অনেক শব্দের স্বাতন্ত্র্য আছে। তাঁরা স্থানীয় ভাষায় কথা বললেও অনেক শব্দ যা ব্যবহার করেন তা হিন্দু বা অন্য সম্প্রদায়-এর লোকেরা ব্যবহার করেন না।

যেমন : - জল ॥ পানি, ঘড়া ॥ ডাবোর, আমি ॥ মুই, আমার ॥ মোর, আমাদের ॥ মোদের, সকাল বেলা ॥ বেনব্যালা, তামাক ॥ তামুক, সম্বন্ধী ॥ সুমুন্দি, মাদুর ॥ বিচেন, অভাবে ॥ আবানে, আঁচড়ান ॥ হ্যাঁচড়ান, দোয়া ॥ দ, মাচান ॥ বাণ, ওয়াড় ॥ তফন, ছোকরা ॥ ছ্যামড়া, ছুকরী ॥ ছেম্ড়ী, নেকড়া ॥ ভাঙা, কুকুট ॥ কুক্ড়ো, শীত ॥ জাড়।

আবার :—পিসী ॥ ফুপু, মাসী ॥ খালা. কাকা, জ্যাঠা। চাচা, মামা ॥ মামু, দিদি ॥ বু, বড়দাদা ॥ মিঞাভাই, দাদামশায় ॥ নানা। ইত্যাদি।

আলুভাতে ॥ আলুছানা,	ল্যাম্পো ॥ টেমি,
ব্যঞ্জন বা তরকারী ॥ ছালোন,	প্রদীপ, পীদিম ॥ চ্যারাক্,
সজনের ডাঁটা ॥ খাড়া,	হ্যারিককান ॥ হেরকেন,
পাটালী ॥ ছিম্নি,	নারিকেল ॥ নেরকোল,
ডিম ॥ আণ্ডা.	বাতাসা ॥ বাসোতা,
ডাঁটা ॥ ড্যাটা,	বাতাস ॥ বাসাত,
প্রাণ ॥ জাহান,	বেড়াল ॥ মেকুর,

কয়েকটি বাক্য, যেমন :—

ছ্যামড়া দোর ধ'রে দেঁড়িয়ে অইচিস্ ক্যান হ্যাদে আয় এই ঠণ্ডি দ্যাড়া।

দ্যার আক্কেলটা গুকুচ এক ফোঁটা পানি দেলে না। খোদা মোদের মাটি হ্যাঁচডানে জাত করেছে; এক ফোঁটা পানি না পলি চাষ করবানি কন্‌থে।

হয়ত এমন একদিন আসবে যখন এ অঞ্চলের কথ্য ভাষার কোন পার্থক্য দেখা যাবে না। শিক্ষার প্রসার যত ঘটবে মনে হয় ভাষার শুদ্ধি তত ঘটবে। এখনও গ্রামাঞ্চলে অশিক্ষা ও অজ্ঞতা যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। শুদ্ধ অশুদ্ধির বিচারে কোন মাপকাঠি ভাষার ক্ষেত্রে নির্ণয় করা দুরূহ।

লিখিত ভাষার একটা মান বা মাপকাঠি আছে। সেখানে শুদ্ধ অশুদ্ধির বিচার চলে। কিন্তু কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে মানুষ যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করে। তবে অনেকক্ষেত্রে এই স্বাধীনতার সীমা অতিক্রম করে অনেক অশ্লীল শব্দ স্বাভাবিক ভাবে বাক্যে ব্যবহার করা হয়। অভ্যাসের দোষে অনেক সময় শালীনতা রক্ষাটাও বাধ্যতামূলক মনে করেন না।

আবার অনেকের নানাপ্রকার মুদ্রাদোষও দৃষ্ট হয়। বাক্যে সহজ এমন কতগুলি শব্দ প্রায়শই ব্যবহার করেন যার কোন অর্থ হয় না। কেউ কেউ বাক্যে অশ্লীল শব্দ প্রয়োগে অভ্যস্ত। মুদ্রা দোষের মত বাক্যের সঙ্গে অশ্লীল ভাষা জুড়ে দেন।

এখানে মুদ্রাদোষের একটা নমুনা দিচ্ছি। ১৯৩৮ সালে কোন এক সম্মানিত ব্যক্তির বাক্য—নিজ কানে শুনেছিলাম ভুলতে পারিনি। সেবার প্রবল বন্যা হয়। সে সময় সে ভদ্রলোক আর একজনকে বলছেন: "উরে আক্কাস! হ্যাদেগিয়ে—ধরগিয়ে, তোমার গিয়ে ইদিপানে মুছলোবে। পানির যে বেজায় ব্যাগ।"

(আক্কাস জলের প্রবল বেগ। উরে আক্কাস। পানির বেজায় ব্যাগ। এছাড়া আর সবই তাঁর মুদ্রাদোষ।)

অনেকের মুদ্রাদোষ এরূপ সুপরিচিত হয়ে ওঠে যে একাধিক ব্যক্তি একই নামে থাকলে মুদ্রাদোষের পরিচয় দিয়ে তার সঠিক পরিচিতি নেওয়া যায়। উপাধিব উল্লেখ করার দরকার হয় না।

যেমন: একাধিক কালীপদ এক গ্রামে ছিলেন। তার মধ্যে একজনের মুদ্রাদোষ ছিল "মানে" আবার একজনের মুদ্রাদোষ ছিল "এ্যানা" এঁদের এক-জনকে বলা হত "মানে কালী" অপরজনকে বলা হত "এ্যানা কালী।"

ভবিষ্যতে বনগ্রামের ভাষা শুদ্ধ হোক আর অশুদ্ধই হোক হয়ত কথিত ভাষার একটা সাম্য আসবে। তবে রুচি-সম্পন্ন হোক এটাই কাম্য। আর তা শিক্ষার প্রসারের দ্বারাই সম্ভব। দীর্ঘ ছাব্বিশ বছরে যা আশা করা

গিয়েছিল তা ঠিক জনগণ পেয়েছে? শিক্ষা বর্তমানে অশিক্ষা, তবুও সেটা সকলের ভাগ্যে জুটছে না। সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের মাপকাঠি যেখানে "অর্থ" সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই জনজীবনে শিক্ষার গুরুত্ব কমতে বাধ্য হয়। মৌলিক গালভরা শিক্ষায় উন্নতির জন্য দেশপ্রেমিকদের বাণীর স্বার্থকতা কোথায়! ভারত জুড়ে সর্বত্রই সার্টিফিকেট লাভের সার্কাস চলছে! হয়ত পশ্চিমবঙ্গে মাত্রাধিক্য ঘটে থাকবে? কিন্তু কেন? মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের কোন সুযোগ নেই বা প্রচেষ্টাও নেই। পূর্বে ধর্মের অনুশাসনে অনেকে সংযত হওয়ার চেষ্টা করত। বর্তমানে ধর্ম শব্দের অর্থ করলে তার কিছু থাকে না। ধর্মের যে আদর্শ সেটি শাশ্বত নয়। একাধিক মত ও পথ এবং তার শিক্ষার ব্যবস্থাও নেই। কারা ধার্মিক আর কারা অধার্মিক তার সংজ্ঞা এক বা একাধিক মিললেও বাস্তবের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। বিশেষ করে হিন্দুদের ধর্মাচারণ উৎসব আনন্দের অঙ্গীভূত। সেখানেও উচ্ছৃঙ্খলা, সেখানেও অশ্রদ্ধা। আমাদের আঞ্চলিক ভাষা যাই থাকুক না কেন, যত অশুদ্ধই হোক না কেন, যত অশ্লীল শব্দ ভাষায় থাক না কেন বলব সেখানে শিক্ষার অভাব ছিল, কুশিক্ষা ছিল না। মানুষ সরল প্রাণ মন নিয়েই কথা বলত। তাই মনে হয় কি যেন হারিয়ে গেল, কি যেন পাওয়া যাচ্ছে না। "হ্যাদে আয় বাপ, পানিপান্তা বাগুণ পোড়া দিয়ে খাযে মাঠ পানে যা" সে যায়গায় বলছি, "এদিকে এস'ত গোপাল, বেগুনের কাবাব আর ঠান্ডি-পোলাও-এর ব্রেকফাষ্ট করে ট্রাকটার চালানোর চাকুরি করোগে।'

৪

ছয়ঘরিয়া

বনগ্রাম থেকে মাত্র এক মাইল দূরে যশোহর কলিকাতা রাস্তার ধারে যে গ্রামখানা মন্দির ও বড় বড় পাকা বাড়ির ভগ্নস্তূপ বুকে নিয়ে অতীত কালের পদচিহ্ন ধারণ করে আছে সেই গ্রামের পরিচয় মানুষের অজানা। জগৎ বিখ্যাত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃভূমি এই ছয়ঘরিয়া গ্রাম। একদিন ধনে জনে পূর্ণ ছিল এই গণ্ডগ্রামটি। বনগ্রাম শহর উৎপত্তি হওয়ার বহু পূর্বেই এই গণ্ডগ্রামের উৎপত্তি হয়েছিল।

রাজা রামচন্দ্র খাঁর জামাতার বংশ ধরেরাই এই গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বে এ অঞ্চল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। খরস্রোতা নাওভাঙ্গা নদী বয়ে যেত গহীন জঙ্গলের বুক চিরে। দিশি দিশি হ'তে বাণিজ্য তরণী যেত কত দূরের যাত্রী আর পণ্যসম্ভার নিয়ে। জ্ঞাতি কলহের জন্য রামচন্দ্র খাঁর জামাতার উত্তরাধিকারী ছয় ভ্রাতা তাঁদের পৈতৃক রাজ্যের অধীন এই অঞ্চলের জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন করেন।

এই অঞ্চলেও অতীতে তান্ত্রিক কাপালিকগণের আধিপত্য ছিল। গ্রামের ভিতর প্রবেশ করলেই আজও সেই তান্ত্রিক কাপালিকগণের প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির দেখা যাবে। অবশ্য তখন মন্দির ছিল না। গ্রাম পত্তনের সময় যে দেবীমূর্তি দেখা গিয়েছিল, খড়ের ঘরে তাঁর নিত্য পূজার ব্যবস্থা করা হয়। পরে রাখাল সরকার ১৩১৫ সালে কোঠা ঘর নির্মাণ করেন। ১৩৪০ সালে পঞ্চানন ঘোষ কালী মন্দিরের সামনে বারান্দা নির্মাণ করেন।

প্রথমে গ্রামের প্রতিষ্ঠাতাদের কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। আজও তাঁদের বংশধরেরা অনেকেই এই গ্রামের মাটি আঁকড়ে প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকায় দিন যাপন করছেন। আবার অনেকে রুজির তাগিদে দেশান্তরে গিয়েছেন। কলিকাতাও অনেকে বসবাস করছেন। অবশ্য এখন তাঁরা আর মুখোপাধ্যায় পদবীধারী নন। পরবর্তীকালে তাঁরা হয়েছিলেন রায়চৌধুরী।

রামচন্দ্র খাঁ ও তাঁর জামাতা বাংলার মুসলমান শাসক হোসেন শাহের অনুগ্রহ পুষ্ট ছিলেন। রমাবল্লভ মুখোপাধ্যায় তাঁরই জামাতা রায়চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত হন ও বহু ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন তিনি। তখনকার দিনে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সন্তান যবন দান পুষ্ট রামচন্দ্র খাঁ বিত্তবান ও প্রতিপত্তিশালী হ'লেও তদানীন্তন ব্রাহ্মণ সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। বিত্ত দিয়েও তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণদের চিত্ত জয়ে সক্ষম হন নি।

অবিভক্ত বাংলার বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত বেনাপোলের সন্নিকট কাগজ পুকুরিয়া গ্রামে রামচন্দ্র খাঁর প্রাসাদ ছিল। হুসেন শাহের অনুগ্রহে তাঁহার রাজ্যসীমা সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর শাসন কঠোর ছিল আয় ও ছিল প্রচুর। হুসেন শাহ শৈশবে শান্তিধর নামে ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে প্রতি পালিত হন কিছুকাল। তিনিই পরবর্তীকালে হুসেন শাহ কর্তৃক রাম খাঁ উপাধিতে ভূষিত হয়ে রামচন্দ্র খাঁ নামে পরিচিত হন। রামচন্দ্র খাঁ বঙ্গেশ্বরকে কর দিতেন না। তিনি বিলাস ব্যসনে প্রচুর অর্থব্যয় করলেও পুণ্য কাজেও প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। রামচন্দ্র খাঁর কাগজ পুকুরিয়ার প্রাসাদের নিম্নে মাটির তলায় অনুরূপ প্রাসাদ ছিল। এই দুর্গে প্রবেশ করার একটি মাত্র দরজা ছিল। এবং সে দরজা এমন জায়গায় ছিল যে কারও সহজে তার সন্ধান পাওয়ার উপায় ছিল না। হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ কর আদায়ের জন্য সৈন্য সামন্ত নিয়ে আসছেন এই সংবাদ পেয়ে রামচন্দ্র খাঁ তাঁর পরিবার বর্গ ধন দৌলত নিয়ে দুর্গে প্রবেশ করেন এবং ঐ দরজার চাবি তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য কালুকে দেন। দরজা বন্ধ করে সে যেন কোন গোপনস্থানে আত্মগোপন করে থাকে। নবাব সৈন্য চলে গেলে যেন চাবি খুলে দেয়। নবাব এসে রামচন্দ্রকে না পেয়ে ঐ গ্রাম ও তার আসেপাশে অকথ্য অত্যাচার করে ফিরে যাওয়ার সময় পুকুর ধারে একগাছে কালুকে দেখে। এক সৈন্য তীর নিক্ষেপ করে। কালু তীর বিদ্ধ হয়ে গাছ থেকে পুকুরে পড়ে -মারা যায়। ফলে রামচন্দ্র খাঁ দুর্গে আটক থাকেন কয়েকদিন।

তাঁর জামাতা হুসেন শাহের কর্মচারী ছিলেন, তিনি গোপন পথের সন্ধান জানতেন। তিনি গৌড় থেকে এসে তাকে উদ্ধার করে গৌড়ে নিয়ে যান। সেখানে হুসেন শাহের পরিচয় দিয়ে রামচন্দ্র খাঁ নিষ্কৃতি পান।

পরবর্তীকালে রামচন্দ্র খাঁর জামাতার বংশধর রমাবল্লভ মুখোপাধ্যায় খুরম বিদ্রোহের সময় সম্রাট জাহাঙ্গীরকে সাহায্য করেন সে কারণে জয়পুর ও মূলঘর পরগণার জায়গীরদারী লাভ করেন। রমাবল্লভ ইছাপুরে অন্নমতি দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁর ছয় পুত্র। ছয় পুত্রের একজন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বর্তমানে গঙ্গা সাগরের মেলা যেখানে হয় সেইস্থান তার অংশে পড়ে। সেইস্থান গুরুদেবকে দান করে সংসার ত্যাগ করেন। অপর এক ভাই নিঃসন্তান ছিলেন। আর এক ভাই বিবাহের কিছু পূর্বে মারা যান। তিন ভাই যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ গোবরাপুরে বসতি স্থাপন করেন। অপর দুই ভাই ছয়ঘরিয়ায় বসবাস করেন। তাঁরা ছয় ভাই ছিলেন বলেই এই গ্রামের নামকরণ করেন ছয়ঘরিয়া। বড় ভাই এর বংশধর প্রমোদ, মেজ ভাই এর বংশধর মন্মথ (বিলু) এবং ছোট ভাই এর বংশধর নির্মল এখনও গ্রামেই বাস করছেন। গ্রামে অন্যান্য বহু বর্ণের লোক আসেন বসবাস করতে। জমিদার তাদের আশ্রয় দেয়। জমিজমা দেন। ক্রমে জনবসতি গড়ে উঠল। কিন্তু তাঁরা রামচন্দ্র খাঁর জামাতার বংশধর এই অপরাধে পতিত ব্রাহ্মণ সুতরাং ব্রাহ্মণ সমাজে তাঁরাও পতিত ছিলেন।

জমিদার তখন ব্রাহ্মণদের আহ্বান জানান, কিন্তু কেউই প্রথমে নবাব অনুগ্রহ পুষ্টি রামচন্দ্র খাঁর জামাতার বংশধরদের অনুগ্রহভাজন হতে চাননি। তখন চাতুর্য ও বিত্তই তাদের সকল কালিমা মুছে দিল। রাজত্ব ও রাজকন্যার প্রলোভনে একে একে বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি কুলীন কুলোদ্ভবেরা ধরা দিলেন। আজও তাঁদের বংশধরেরা বর্তমান। বাংলা ও বাংলার বাইরে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছেন এখন তাঁরা। গ্রামেও অনেকে এখনও বসবাস করছেন। ক্রমে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এসে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। প্রতিষ্ঠিত হোল টোল চতুষ্পাঠী। এখন আর তার অস্তিত্ব নেই। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের অনেক কৃতি সন্তান দেশ ও দশের মুখ উজ্জল করেছেন এবং করছেন। এই বংশে রাখালদাস জন্মগ্রহণ করেন। লারকানা ও পাঞ্জাবে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার আবিষ্কর্তা এই বিশ্ববিশ্রুত প্রত্নতাত্ত্বিক এই গ্রামেরই সন্তান। চট্টোপাধ্যায় বংশেও অনেক কৃতি সন্তান জন্মেছেন ও এখনও খ্যাতিবান

অনেকে জীবিত আছেন। তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে যাঁরা ছয়ঘরিয়ায় তাদের কীর্তি স্থাপন করে গেছেন, তাঁদের কিছু পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি।

রায়চৌধুরীদের কন্যার পাণিগ্রহণ করে যাঁরা এই গ্রামে বসবাস করতে আরম্ভ করেন ক্রমে তাঁরাও ধনে জনে চৌধুরীদের অপেক্ষাও প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠেন। সদাশিব চট্টোপাধ্যায় জোড়া শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন কালীমন্দিরের পার্শ্বে ১২২৭ সালে। আজও সেখানে নিত্য পূজা হয়ে থাকে।

বন্দোপাধ্যায় বংশের কন্যা চৌধুরী ঘরনী হয়ে প্রতিষ্ঠা করেন ছয়-ঘরিয়া পূর্বপাড়ায় দুটি শিবমন্দির ১২৫৯ সালে - যে দুটি আজও বড়ঠাকুরাণীর মন্দির নামে খ্যাত। চৌধুরী কুলোদ্ভব অতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর বাড়ির সম্মুখে বহিঃদ্বারের দুই পার্শ্বে দুটি শিব হীন শিব মন্দির আছে। এই লিংগ দুটি অনধিক কালই স্থানান্তরিত হয়েছে। এখন পড়ে আছে শূন্য মন্দির অতীতদিনের সাক্ষী হয়ে। মন্দিরের ইঁটের কারুকার্য নোনা ধরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের কথা এই মন্দির দুটি কার প্রতিষ্ঠিত সে পরিচয় আজ আর মেলে না। ছয়ঘরিয়া গ্রামের রাস্তা পাকা তাও খুব বেশী দিনের নয়। ১৩১৪ সালে কায়স্থ বংশ খ্যাত কলিকাতার লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকিল রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ এই রাস্তা নির্ম্মাণ করেন। রাস্তার নাম-করণ হয় তাঁর স্বর্গত পিতার নামে চন্দ্রকান্ত রোড। গ্রামের প্রবেশ মুখে যশোহর রোডের সংযোগস্থলে ফলকে লেখা ছিল। সে ফলক ও স্তম্ভ স্বাধীনতা লাভের পর ভেঙ্গে ফেলা হ'য়েছে।

এই গ্রামে ক্রমশঃ এক বলিষ্ঠ সমাজ শৃঙ্খলা গড়ে ওঠে। নাওভাঙা নদীর তীরেই সকল সঙ্গতি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ অট্টালিকা নির্মাণ করেন, প্রত্যেকের বাড়ির খিড়কি দরজা নাওভাঙ্গা নদীর ঘাটে। মেয়েদের স্বতন্ত্র ঘাট, সে ঘাটে পুরুষের কোন সময়েও যাওয়ার অধিকার ছিল না যে খাঁ-এরা ব্রাহ্মণ সমাজ পরিত্যক্ত হ'য়ে ব্রাহ্মণ সমাজচ্যুত হয়েছিলেন, তাঁরা রায়চৌধুরী হ'য়ে হলেন সমাজপতি। আশে পাশের গ্রামও তাঁদের জমিদারীর আওতায় ছিল, সুতরাং সমাজপতি হওয়া তাঁদের সহজ সাধ্য হ'ল। তাঁরা সামাজিক নিমন্ত্রণে গেলে ফুলের মালা ও চন্দনের ফোঁটা লাভ করতেন মর্যাদা স্বরূপ। সামাজিক নিমন্ত্রণে কারও বাড়ি অন্নগ্রহণ করতেন না। ফলাহার বা লুচি মিষ্টান্ন গ্রহণ করতেন। কাল পরিক্রমায় লুপ্ত হ'য়ে গেল অতীতের সকল গৌরব।

এই ছয়ঘরিয়া গ্রামে নিত্য হাট, বাজার বসত, এখন সেই স্থানকে বলা হয় হাটখোলা। দোকান পসার নিত্য প্রয়োজনের জিনিস যোগাত। আমোদ প্রমোদ সব সময় স্বচ্ছল লোকের প্রাণ প্রাচুর্যের পরিচয় দিত। চৌধুরী বাড়ি, বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ি, চট্টোপাধ্যায় বাড়ি দুর্গোৎসব হ'ত। চৌধুরীরা বহু শরিক হয়ে ভাগ হ'য়ে গ্রামের এপাড়া ওপাড়া বসত বাড়ি নির্মাণ করে স্বতন্ত্র পূজা করতেন। আবার আদি পূজা যেখানে হয়েছিল; সেখানে পূজাও করতেন—তাকে বলত সাজার বাড়ির পূজা। এই দুর্গা পূজায় ছাগ বলি হ'ত। চারদিন সমানভাবে অতিথি অভ্যাগত নিমন্ত্রিত বহু লোক ভূরি ভোজে আপ্যায়িত হতেন। "দিয়তাং ভূজ্যতাং" চলত সারা গ্রাম জুড়ে। আমার শৈশবের কথা মনে পড়ে। নিমন্ত্রণ খাওয়ার পর ফেরার পথে বড় হাঁড়ি ভর্তি খাবার পেতাম। চাইতে হ'ত না। গৃহস্থের ব্যবস্থাই ছিল খাবারের হাঁড়ি ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেওয়া। আজ এই খাদ্য সঙ্কটের দিনে এ সব কথা একান্তই বিস্ময়। যে পরিমাণ সন্দেশ ভাণ্ডারে স্তূপাকার হ'ত যে পরিবেশনের সময় কোদালে করে বালতি ভর্তি করে পরিবেশন করতে নিয়ে যাওয়া হ'ত। এইজন্য চট্টোপাধ্যায়দের বলা হ'ত 'কোদাল কাটা চাড়ুয্যে'। এসব উৎসবে নহবৎ বসত। গ্রামে বাজানদার-পল্লী ছিল। এখন তাঁরা আর কেউ সেখানে নেই। পরে মুসলমান হয় ও ক্রমে একে একে স্থান ত্যাগ করে। তাদের রুজির পথ বন্ধ হয়, জমিদারদের আয়ে ভাঁটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। আজ একমাত্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতেই কৌলিক দুর্গাপূজা কোন রকমে টিকে আছে। আর কোন বাড়ীতেই এখন আর দুর্গাপূজা হয় না। পরিবর্তে হয়েছে সার্বজনীন পূজা। কালীবাড়ির পার্শ্বেই দোলমঞ্চ। দোল উৎসব চলত বিরাট আকারে। সদাশিব চট্টোপাধ্যায় দোলমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। এখন দোলমঞ্চ অবলুপ্ত। এ ছাড়া চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন উৎসব হ'ত। বারমাসে তের পার্বণে গ্রাম মুখর হ'য়ে থাক'ত। গরীব দুঃখী সকলেই সেই অনাবিল আনন্দে অংশ গ্রহণ করত—উপভোগও করত প্রাণ ভরে। কালের নিষ্ঠুর আঘাতে একে একে সকল দীপ নিভতে আরম্ভ করল। রুজি রোজগারের তাগিদ আসতে লাগল, পাশ্চাত্য সভ্যতা ভেঙে দিল প্রাচীন সমাজ আদর্শ। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রবল হ'ল। গ্রাম পরিত্যক্ত হয়ে জঙ্গলাকীর্ণ হতে লাগল। প্রকৃতি নিজের হাতে রূপ দিয়ে চললেন অট্টালিকা মন্দিরের গায়ে। চুন বালি খসা ইটের গায়ে দেখা দিল বড় বড় বট অশ্বত্থের গাছ। তবুও তার মধ্যে কেহ কেহ রয়ে গেলেন গ্রামের টানে ভিটে আঁকড়ে।

জমিদারীর অংশের মুনাফা আদায় করে দিন তাঁদের কাটতে লাগল। প্রবাসী যারা তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ আজও রক্ষা করে থাকেন।

এই গ্রামের যাত্রা থিয়েটার ইত্যাদিরও যথেষ্ট সুনাম ছিল। বাঁধানো স্টেজ ছিল চৌধুরী বাড়িতে। তখন থিয়েটার যাত্রার জন্য জনসাধারণের অর্থ লাগত না বা টিকিট কিনতে হ'ত না। গ্রামের জমিদার মধ্যবিত্তেরা এই অনুষ্ঠান করতেন আনন্দ পেতে আর তার অংশ দিতে।

বহু জনসমৃদ্ধ গ্রাম হিসাবে ছয়ঘরিয়া এতদ অঞ্চলের সর্বাগ্রে গণ্য। আজ অতীত সমাজ আদর্শ ভেঙ্গে পড়েছে। যাঁরা প্রবাসে আছেন, তাঁদের সঙ্গে গ্রামের কোন সামাজিক যোগাযোগ নেই। যাঁরা আছেন গ্রামের ভিটা আঁকড়ে তাঁরাও নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছেন অর্থনৈতিক চাপে—জনারণ্যে হারিয়ে ফেলেছেন নিজেকে। এখন সমাজ শৃঙ্খলা নতুন ধারার মাঝে তার পুরাতন ঐতিহ্যকে হারিয়ে ফেলেছে।

বঙ্গভঙ্গের পরে বহিরাগত বহু লোক এসে বসবাস করছেন এই গ্রামের মাটিতে। অতীতের কত স্মৃতি-বিজড়িত হয়ে লুকিয়ে আছে—হয়ত তাঁদের কানে কানে বলতে চেষ্টা করে। সে মর্মবেদনার কথা কারও কর্ণগোচর হয় না। কত রুদ্ধ আবেগ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে পথের ধারে, নদীর ঘাটে—মাঠে। কে শুনবে সে কথা? কে বুঝবে সে শব্দ, ব্রহ্ম ভেদ করে আসা প্রতিধ্বনির অর্থ? যেখানে ছিল "দিয়তাং ভুজ্যতাং" সেখানে এখন রেশনের লাইন দিতে হচ্ছে। ডোলের জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের দ্বারে মাথা খুঁড়তে হচ্ছে। এ কালের অভিশম্পাত যুগ পরিক্রমায় অন্ধকারের পূর্ব অঙ্কের পালা চলেছে বাংলার বুকের উপর দিয়ে। এই গ্রামের জমিদারদের ও গ্রামবাসীর কত জমি হারিয়ে গেল বঙ্গভঙ্গের অভিশাপে।

অতীতের শ্রী মুছে গিয়ে যে নূতন শ্রী ফুটে উঠেছে গ্রামের নূতন পরিবেশে—সেখানে কোন শৃঙ্খলা, বন্ধন বা নৈতিক আদর্শ কিছুই নেই। অতীত সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ ধ্বসে গিয়েছে নূতন সমাজতন্ত্রের গুরুভারে। এখন সেই কলরোল আর শোনা যাবে না—পাওয়া যাবেনা আর সেই হারিয়ে যাওয়া সুখময় দিনের সাদর অভ্যর্থনা। এখন টোল নেই, নতুন বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে—গড়ে উঠেছে উচ্চ বিদ্যালয়—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষা করতে আর ঠাকুর হরিদাসকে স্মরণ করতে গড়ে উঠেছে বালিকা বিদ্যালয় গ্রামের বাহিরে, যশোহর রোড রাস্তার পাশে। এরই পাশাপাশি গড়ে উঠেছে গীর্জা। বৃটিশ শাসন কালে সামাজিক চাপে দৈন্য জরজর অবহেলিত

সমাজের বুকে বিদেশী মিশনারীরা তাদের স্থান করে নিল। অনেক নিম্নবর্ণের হিন্দু ধর্মান্তরিত হল। এই গীর্জা সাক্ষ্য দিচ্ছে অতীত সমাজ ব্যবস্থার অপব্যবহারের কুফল। এ ভজনালয়ের ঘণ্টাধ্বনি জানায় তার বৈপ্লবিক বিজয়বার্তা। মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টার ধ্বনি আর ভেসে আসেনা বায়ু স্তর ভেদ করে। ছয়ঘরিয়ায় মুসলমান সমাজও ছিল। এখনও দু এক ঘর আছে কায়-ক্লেশে। তারাও ধর্মান্তরিত হিন্দু—ঐ গ্রামেরই।

এখন ছয়ঘরিয়ায় যাঁরা বসবাস করছেন, তাঁদের গ্রাম্য সমাজ কিছু নেই—নানা জায়গায় নানা জন এখনও পরস্পর যোগাযোগের দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। সকলেই মধ্যবিত্ত। সুতরাং এ দুর্দিনে সকলেই উদরান্নের জন্য অস্থির। সে কারণে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের বোঝা বহন করতেই জীবনান্ত। তবুও মধ্যবিত্তের স্বাভাবিক ধারাগত বৈশিষ্ট্যে বর্তমান দেশ ও কালের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে নূতন ভাবে গ্রাম্যজীবন গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। অবশ্য সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই আছে দলাদলি, রেষা-রেষি, রাজনীতি আর দ্বন্দ্ব কলহ।

সীমান্ত সংলগ্ন গ্রাম ছয়ঘরিয়া, সুতারং সীমান্তের আবিলতার আকর্ষণে ধরা দিয়েও অনেকে বিত্তবান হয়েছেন। তাঁরা সমাজে আর অবহেলিত নন। বর্তমান যুগধর্মে অর্থ অনর্থের মূল নয় প্রতিষ্ঠা ও প্রতি-পত্তির হাতিয়ার, সুতরাং তাঁদের সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি। মানুষ অবস্থার দাস তাই সে ভয়াল প্রতিষ্ঠাকেও সম্ভ্রম দেখাতে বাধ্য হতে হচ্ছে অনেককেই। বিদ্যা, জ্ঞান, ধর্ম, নীতি এসব এখন কেতাবে সীমাবদ্ধ। জীবনক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের সংগ্রামে তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। তার উজ্জ্বল নিদর্শন হিসাবে সেই সংগ্রামী মানুষদের তুলে ধরলে বিতর্কের অবকাশ থাকে না। তাই কবির এই উক্তিটি এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয় "সিংহের দেশে বিচরিছে শিবা/ব্যর্থ বিড়ম্বিত খল কোলা-হলে"।

৫

সুখপুকুরিয়া

ঘাটবাঁওড ও রাণীগঞ্জের পশ্চিম সীমানা থেকেই সুখপুকুরিয়া গ্রাম। ইছামতী এর দক্ষিণ সীমানা ছুঁয়ে বরাবর পশ্চিম দিকে চলে গেছে। গ্রামখানি দৈর্ঘে দেড মাইল আর প্রস্থে এক মাইল। গ্রামের উত্তর ভাগে বিল ও দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। মাঠের পাশ দিয়েই বনগ্রাম বয়ড়া সড়ক।

সুখপুকুরিয়া এতদ্ অঞ্চলের একটি সুপ্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামের পূর্ব নাম কি ছিল তার পরিচয় এখন আর মেলে না। সুখপুকুরিয়া নামকরণ পরে নূতন ভাবে করা হয়েছিল। আর সে নামকরণের পশ্চাতে একটা চমকপ্রদ কাহিনীও বর্তমান আছে। সে কাহিনীর উল্লেখ না করলে সুখপুকুরিয়ার সকল পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই কাহিনীর প্রথম অংশ সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের 'যশোহর-খুলনার ইতিহাসে' পাওয়া যায়।

সুখপুকুরিয়া গ্রামের প্রবেশ পথ দুইটি। একটি ঘাটবাঁওড পি, টি, স্কুলের পাশ দিয়ে বরাবর পশ্চিমদিকে গিয়েছে ইছামতীকে সমান্তরালে রেখে। আর একটি ঘাটবাঁওড়ের ধীবর পল্লীর মধ্য দিয়ে পশ্চিমদিকে গিয়েছে। এই পথেই পড়বে মৃধা পাড়া। মুসলমান পল্লী। এখন দু'চার ঘর তাঁদের আছেন। অনেকেই বঙ্গভঙ্গের পর বিনিময় সূত্রে পূর্ববঙ্গে গিয়ে বসবাস করছেন। তাদের অভাব পূরণ করছেন নবাগত কয়েক ঘর হিন্দু পরিবার। মৃধা পাড়ার পরই রায় বাগান। এই রায়বাগানকে ভিত্তি করেই সুখপুকুরিয়া গ্রামের নামকরণ হয়েছিল। সে কারণে সেই পরিচয়টাই আগে দিয়ে রাখছি।

যশোহর জেলার বর্তমান ঝিকরগাছা রেলষ্টেশনের নিকট ব্রাহ্মণনগর—

এখন সেই স্থানের নাম লাউজানি। (১) গুড়গাঞিভুক্ত শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ মুকুট রায় নামে এক জমিদার ছিলেন। দিল্লীর পাঠান সুলতানের কাছ থেকে পাঞ্জা লাভ করে মুকুটরায় বিরাট জমিদারীর মালিক হন। (২) তাঁর জমিদারী উত্তরে পাবনা থেকে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত, পূর্বে ফরিদপুর থেকে পশ্চিমে বর্দ্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মুকুট রায়ের দুই রাণী। (৩) বড় রাণীর লীলাবতীর সাত ছেলে আর এক মেয়ে। "সাতে ভাই চম্পার" যে বাহিনী এতদ্ অঞ্চলে শোনা যায় সে এই সাত ভাই ও তাদের অপরূপা সুন্দরী ভগিনী চম্পাবতী।

রাজা মুকুট রায় তাঁর ছোটরাণীর উপর কোনও কারণে অসন্তুষ্ট হন ও তাঁকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ইছামতী নদীর তীরে বর্তমান বনগ্রাম থেকে প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে একটি অট্টালিকা ও তৎসংলগ্ন বৃহৎ ফলের বাগান নির্মাণ ক'রে সেই স্থানে ছোট রাণীকে নির্বাসন দেন। রাণীকে নির্বাসিত করলেও বোধহয় তার ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্য ভূসম্পত্তি, অর্থ আর কয়েক জন কর্মচারী দিয়েছিলেন।

রাজা মুকুট রায়ের কন্যা চম্পাবতীর অসামান্য রূপ লাবণ্যের কথা শুনে বড়খান গাজী বা বড়গাজী নামে এক উদ্ধত গাজী তাঁকে বিবাহ করার সঙ্কল্প করেন। যবন বিদ্বেষী রাজা মুকুট রায়ের কাছে কালু নামে এক মুসলমানকে পাঠিয়ে দেয় বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে। মুকুট রায় গাজীর ঔদ্ধত্যে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে গাজীর দূত কালুকে বন্দী করে রাখেন। বঙ্গেশ্বর হোসেন শাহ মুকুট রায়ের যবন বিদ্বেষের খবর জানতেন, সেকারণে মুকুট রায়ের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। গাজীও তার অপমান আর নৈরাশ্যের প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে বঙ্গেশ্বরকে এই ঘটনা অতিরঞ্জিত করে হোসেন শাহকে উত্তেজিত করে। হোসেন শাহ মুকুট রায়কে উক্ত বন্দী মুসলমান কালুকে মুক্তি দেবার আদেশ দেন আর বিচারের জন্য মুকুট রায়কে তাঁর দরবারে হাজির হতে আদেশ পাঠান। কিন্তু মুকুট রায় বঙ্গেশ্বরের কোন আদেশেই কর্ণপাত না করে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হতে থাকেন। হোসেন শাহ মুকুট রায়কে শাস্তি দেবার জন্যে সসৈন্যে অগ্রসর হন; কিন্তু মুকুট রায়ের কাছে তিন তিন বার ঘোর যুদ্ধে পরাজিত হন। শেষ পর্যন্ত নানা কূট কৌশলে মুকুট রায় পরাজিত ও বন্দী হন। রাজার পরিবার বর্গ একটি কূপ গর্ভে আত্ম বিসর্জন দেন। রাজা শেষে মুক্ত হয়ে শোকে আর অপমানে আত্ম-

(১) প্রদীপ, ১৩১১ সাল, আশ্বিন। (২) গৌড়ের ইতিহাস ২য় খণ্ড ৬৯ পৃঃ
(৩) কুশদহ কাহিনী। ৩য় বর্ষ, ৬৬, ১১১, ১৩৮ পৃঃ

হত্যা করেন। রাজার কনিষ্ঠ পুত্র কামদেব রায় আর কন্যা চম্পাবতী বড় খান গাজীর হাতে ধরা পড়েন। তাঁদের বলপূর্বক মুসলমান করা হয় চম্পাবতীকে বড খান গাজী বিবাহ করলেও তাঁর হাতেই নিহত হন। এই চম্পাবতীই চম্পাবিবি যাঁর সৎ কাজের অনেক নিদর্শন আজও খুলনা জেলার অনেক জায়গায় আছে। কামদেব রায় মুসলমান ফকির হন। তার নামে গোবরডাঙ্গার কাছে যমুনা নদীর তীরে চারঘাটে একটি দরগা আছে। হিন্দু মুসলমান সকলেই তা পবিত্র বলে মনে করে থাকেন।

রাজা মুকুট রায়ের ছোট রাণী নির্বাসিত হওয়ার পর তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্মায়। রাজা মুকুট রায় ইছামতী তীরে যে ফলের বাগান করেছিলেন তার অধিকাংশ ছিল আমগাছ। এই আমগাছের প্রত্যেকটির নিচে অর্থ আর অলংকার পুতে রাখেন। বঙ্গ ভঙ্গের সময় পর্যন্তও অট্টালিকার ভগ্নাংশ, ইটের স্তুপ, পুকুর আর তার বাঁধান ঘাট, স্নানাগার ও অট্টালিকার চারিধারে পয়ঃপ্রণালী বর্তমান ছিল। আজ সেই সুন্দর ফলের বাগানও নেই আর অট্টালিকাও নেই কেবলমাত্র পুকুরটাই আজও অতীতের সাক্ষ্য হয়ে বর্তমান আছে। সম্পত্তি ক্রমান্বয়ে হস্তান্তর হতে হতে এখন উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গবাসীদের বসতি হয়েছে। কে জানতে চেয়েছে সেই মুকুট রায়কে ? তার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের কে! তবুও এখনও ঐ পল্লীকে রায়বাগান বলা হয়। আজ বাগানের কোন চিহ্ন নেই। মানবের প্রয়োজনে তাব প্রতিটি গাছই তার. সকল ঐতিহ্য হারিয়ে একে একে আত্মদান করেছে। আজ এই বিজ্ঞানের যুগে অনেক বাস্তব ঘটনাকে কাহিনী বলতে হয়। কারণ প্রমাণ দেখানোর মত কোন কিছু অবশিষ্ট এখন নেই। ঐ প্রতিটি গাছের নিচের যে সম্পদ মুকুট রায় পুতে রেখেছিলেন তার প্রত্যেকটির থেকেই বটগাছের মত বোয়া নেমে ছিল। আব সেই স্থান খুঁড়ে অনেকেই অর্থ পেয়েছেন। কে পেয়েছে না পেয়েছেন সে প্রমাণ করতে যাচ্ছিনা। গ্রামের প্রাচীন অধিবাসীরা সকলেই একথা এখনও বলেন। ১৯২৩-২৪ সালেও এই ধন প্রাপ্তির ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেছে। তবে যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের কোন মঙ্গল হয় নি। তখন অনেক সংস্কারও ছিল। সে কারণে অনেকে এরূপ সম্পদ এড়িয়ে চলতেন। যাঁরা লোভ সংবরণ করতে পারেন নি তাঁরা নিয়েছেন, ধ্বংসও হয়েছেন। বঙ্গ-ভঙ্গের পূর্বে মাত্র কয়েক ঘর ঐ গ্রামের অধিবাসী কোন রকমে টিকে ছিলেন—যে গ্রামে একদিন চার সহস্র লোক বাস করত। গোটা গ্রাম খানাই জঙ্গলাকীর্ণ শ্বাপদ-সঙ্কুল হয়ে উঠেছিল। পরিবর্তনশীল মহাকাল আবার

পরিবর্তন এনেছে কিন্তু নূতন ভাবে নূতন সমাজ ব্যবস্থায়।

রাজা মুকুট রায় যে গ্রামে নির্বাসিত করেছিলেন ছোট রাণীকে সেই গ্রামের বর্তমান নামকরণ বহুদিন পরে হয়েছিল। সে সম্বন্ধেও এক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। তার সঙ্গে অবশ্য ঐতিহাসিক সত্যও জড়িত আছে যার নিদর্শন আজও বর্তমান। সে কারণে অলৌকিক ঘটনা সমাবেশিত হলেও কেবলমাত্র সত্যটুকু গ্রহণ করলেও সুখপুকুরিয়ার বৈশিষ্ট্য অনুমিত হবে।

রাজপুত্রের বহুদিন যাবৎ কোন সন্তানাদি ছিল না। অতঃপর তিনি তাঁর বসত বাটির অনতি দূরে পশ্চিম দিকে একটি পুষ্করিণী খনন করে তার উত্তর তীরে একটি বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা নির্মাণ করেন। পুষ্করিণীর দক্ষিণ তীরে নির্মাণ করান পঞ্চানন্দের মন্দির। সেই পুষ্করিণীতে 'যক' প্রতিষ্ঠা করেন। পুষ্করিণী খনন করার পর জলঘর প্রস্তুতের পূর্বে পুষ্করিণী গর্ভে একটা ছোট ঘর নির্মাণ করে তার মধ্যে সংসারের সকল জিনিষ রেখে একটা প্রদীপ জ্বেলে একটা বড় শিকল দিয়ে একটা শিশুর কোটিদেশ বেঁধে জল ঘর ছেড়ে পুষ্করিণী জলে পূর্ণ করে দেয়াই নাকি সন্তান কামনায় "যক্" দেওয়া বলে। এই নিষ্ঠুর কাহিনীটি অলৌকিক, কিম্বা কেবলমাত্র রূপকথাও হতে পারে, কিন্তু পুষ্করিণী আর তার তীরের অট্টালিকার অস্তিত্ব আজও প্রত্যক্ষ করা যায়।

'যক্' দেওয়ার পর রাজপুত্রের পর পর দুটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। প্রথমপুত্রের নাম রাখা হয় কালীচরণ। তাঁর জন্ম ১৫৪৩ খ্রীঃ হয়েছিল। সুন্দর সুগঠিত দেহ অদ্ভুত শক্তিশালী। স্বাধীন রাজরক্ত তাঁর ধমনীতে যে প্রবল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করত তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর কার্যাবলীতে। তখন বাংলা মোগল বাদশাহের অধীন। প্রতাপাদিত্য যশোহর প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীনতা ঘোষণা করার সঙ্কল্প করছিলেন। সে সময় কালীচরণ রায়ও বাংলার স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর তাঁর সেই স্বপ্ন সার্থক করার জন্যে এক বিরাট স্থল ও নৌ সৈন্য গঠন করেন। ইছামতী তীর থেকে একটা প্রশস্ত খাল কাটান তাঁর বাড়ী পর্যন্ত। সেই খাল ছিল কালীচরণের গুপ্ত পোতাশ্রয়। এই খালকে এখন 'যুগীন দোয়া' বলে। এখন সেখানে ধান চাষ হচ্ছে। কয়েকটা পুকুরও কাটা হয়েছে। ১৯২৭-২৮ সালেও এই খাল গভীর ছিল আর বার মাস জল থাকত। বর্তমান ইছামতী তীরে খালের সংযোগস্থল রুদ্ধ হলেও তার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। এই খালের উপর দিয়ে বর্তমানে রাস্তাও হয়েছে। একটি সাঁকোও আছে।

রাস্তাটি নির্মাণ করা হয় ১৯০২ খ্রীঃ ঘাটবাওড় পি, টি, স্কুলের পাশ থেকে মাধবপুর পর্যন্ত। এতদ-অঞ্চলের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎ প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়-এর চেষ্টায় ও গ্রামবাসীদের সহযোগিতায়। সাঁকোটি ১৯২৬ সালে ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের চেষ্টায় নির্মিত হয়েছিল। এর পূর্বে রাস্তা বলতে কিছু ছিল না। পায়ে চলা একটা পথ রায় বাড়ির পাশ দিয়ে মুধা পাড়ার মধ্য দিয়ে ঘাটবাঁওড়ে যাওয়া যেত। তখনকার দিনে যানবাহন বলতে ছিল পালকি আর নৌকা।

প্রতাপাদিত্য ইছামতী বক্ষ দিয়ে গঙ্গানদী ধরে মোগল দরবারে যান। সেখান থেকে ফেরার পথে ইছামতী তীরে সুখপুকুরিয়ার এই বীরকে দেখে আকৃষ্ট হন। সেই প্রথম প্রতাপের সঙ্গে কালীচরণের পরিচয় ও বন্ধুত্ব। প্রতাপাদিত্য কালীচরণের গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করেন। শঙ্কর ও সূর্যকান্তও প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে ছিলেন। কালীচরণও অকৃতদার ছিলেন। তিনি তার সৈন্যসহ প্রতাপের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে।

আশ্চর্যের বিষয় কালীচরণের গৃহত্যাগের কয়েকদিনের মধ্যেই পুষ্করিণীর তীরের বাড়ি তার চতুপার্শ্বস্থ ভূমি ও পঞ্চানন্দের মন্দিরসহ পুষ্করিণী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। সে পুষ্করিণী আজও বর্তমান। তাকেই এখন এতদ অঞ্চলের লোকে "দোয়া" বলে থাকেন।

দোয়ায় আজও বারমাস জল থাকলেও কচুরীপানা আর পাঁকে পূর্ণ হয়ে এসেছে। ১৯৩০—৩২ সালেও সুনির্মল জলপূর্ণ গভীর জলাশয়ই দেখা গেছে। এতদ অঞ্চলের অধিবাসীরা এই জলই পানীয় জল রূপে ব্যবহার করতেন।

দোয়ার দক্ষিণ তীরে এখনও পঞ্চানন্দের পূজা প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লপক্ষে হয়ে থাকে। ছাগ বলি আজ ও হয়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে পঞ্চানন্দের পূজার পর হয় এই গ্রামের রক্ষা কালী পূজা। এই অনুষ্ঠান প্রতি বছর যথেষ্ট আনন্দ উদ্দিপনার মধ্য দিয়ে হয়ে আসছে। বর্তমানে পূর্বের প্রাণ প্রাচুর্যের স্পর্শ পাওয়া যায় না। হয়ত অতীত মধুর আর বর্তমান বেদনা দায়ক বলে, হয়ত বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন লোকের সমাবেশে গ্রামের অতীত সমাজের আদর্শ দানা বেঁধে ওঠে নি বলে। তবুও অনুষ্ঠান এখনও হয়।

কালীচরণ প্রতাপের সঙ্গে যশোহর যান। তিনি প্রতাপের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তাঁর বীরত্ব কাহিনী ইতিহাসের পাতায় দেখা যায়।

কালীচরণ নামে প্রতাপের একাধিক সেনাপতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই কালীচরণ ছিলেন তাঁর নৌ সেনাপতি। কালীচরণের বাবা মা সন্তান কামনায় 'যক্' দিয়ে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করে কালীচরণ ও তার ভ্রাতাকে লাভ করে সুখী হন। সেই থেকেই গ্রামের নাম করণ হয় সুখপুকুরি, তাঁর থেকেই আজ সুখপুকুরিয়া।

রায় বংশই এককালে গ্রামের বহু ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তারা ব্রাহ্মণদের নিষ্কর ভূসম্পত্তিও দান করেন। কালক্রমে এই গ্রাম এক বৃহৎ গণ্ড গ্রামের রূপ গ্রহণ করে। আবার নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নানা জমিদার এই গ্রামের মালিক হন। যার ফলে এই গ্রামে দেখা দেয় তিন জমিদারের তিন কাছারি বাড়ি।

বর্তমানে রায় বংশের সকল প্রদীপই নিভে গেছে। একটি মাত্র রায় বংশের কন্যা বর্তমান আছেন। তাঁর স্বামী আর, এম, এস, এ চাকুরী করেন। সোদপুরে তাঁর বর্তমান বাড়ি। এছাড়া অপর কারও পরিচয় পাওয়া যায় না। অবশ্য আত্মীয়-স্বজন অনেক থাকতে পারেন।

দোয়া সম্বন্ধে যে অলৌকিক রূপকথা প্রচলিত তার কিছুটা এখানে উল্লেখ করা যায়। শোনা যায় গ্রামের কোন ক্রিয়াকলাপ হলে "দোয়ার" তীরে গিয়ে পান সুপারি দিয়ে "যক্ষকে" আগের দিন অপরাহ্নে নিমন্ত্রণ করে আসতে হত। পরদিন প্রভাতে বাসন-কোসন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সকল বস্তুই দোয়ার তীরে সুন্দর সুসজ্জিত অবস্থায় পাওয়া যেত। আবার কাজ শেষ হয়ে গেলে সেগুলো অনুরূপভাবে পরিষ্কার করে ফিরিয়ে দিতে হত। অপরাহ্নে তীরে সাজিয়ে রেখে আসতে হত। পরদিন আর তা দেখা যেত না। কোন সময় এক গৃহস্থের বাড়ি থেকে একটি পিতলের প্রদীপ খোয়া যায়। সেই থেকে আর বাসন-পত্র পাওয়া যায় না। এ কাহিনীতে সত্য কতটুকু আছে জানিনা। তবে অতীতের গৌরবময় দিনের সাক্ষী দোয়া আজও বর্তমান আছে। তার পঙ্কিল গর্ভে কত মূল্যবান সম্পদ নিহিত আছে তাই বা কে জানে? সুখপুকুরিয়া গ্রামের ঐতিহ্যের সাক্ষ্য দিতে বোধ হয় আজও দোয়া ভরাট হয়ে ওঠেনি। বর্তমানে এই দোয়া পাট পচাবার সাহায্য করে গ্রামবাসীদের অশেষ কল্যাণ সাধন করছে বলতে হবে। সম্প্রতি এই দোয়ার পশ্চিম তীরে একটা ছোট পুষ্করিণীও কাটা হয়েছে।

হায়রে কালের আমোঘ আঘাত। কোথায় রাজা মুকুট রায় কোথায় সেই অতীতের সুখপুকুর, কোথায় সেই বীর শ্রেষ্ঠ কালীচরণ আর কোথায়বা সেই রায়বাগান। সবই এখন স্বপ্নের মত কাল্পনিক উপাখ্যান।

হয়ত দেশবাসী দোয়ার প্রষ্টার কথা ভুলে গিয়েছেন। পরবর্তীকালে হয়ত কেউ তার ঐতিহ্যের কোন অনুসন্ধানও পাবেন না, কিন্তু সুখপুকুর তার অতীত দিনগুলির গৌরবময় স্মৃতি তার নিভৃত অন্তঃস্থলে বিষাদের সঙ্গে যুগ যুগ বহন করবে। বিপ্লবী বাঙ্গালীর রক্ত এইভাবে কালের অমোঘ আঘাতে ক্ষণিকের তরে স্তিমিত হলেও তার উষ্ণতা হারায় না। তাই বোধহয় যুগে যুগে অনার্য বাঙ্গালীর বিপ্লবের সন্ধান পাই। যে বীর কালীচরণ একদিন মোগলের দাসত্ব থেকে বঙ্গ জননীকে মুক্ত কবার স্বপ্ন দেখে প্রতাপের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন, তার নশ্বর দেহ পুণ্যময় উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হলেও তাঁব বিপ্লবী সত্তা আজও সুপ্ত থেকে শুধু সুখপুকুরিয়া কেন সারা বাংলার নিভৃত অন্তবে গুমবাচ্ছে হয়ত কোন সুদিনের প্রতীক্ষায়।

সুখপুকুরিয়া গ্রামের অপর প্রবেশ পথ ঘাটবাঁওড পি, টি, স্কুলের পাশ দিয়ে ইছামতীকে দক্ষিণে সমান্তবালে রেখে বরাবব পশ্চিমদিকে সুখপুকুরিয়া গ্রামে প্রবেশ করেছে। এই পথটাই মাধবপুব পর্যন্ত গেছে। বর্তমানে এই পথই সুখপুকুবিযার প্রধান পথ।

এই পথেব প্রবেশ মুখেই ছিল বাণীগঞ্জের বিবাট হাট। কয়েকটি বট ও অশ্বত্থ গাছ ছিল তাদের বিশাল দেহেব শাখা প্রশাখা বিস্তাব কবে। আজ তাদেব একটাই অবশিষ্ট আছে হাটেব দক্ষিণ পশ্চিম সীমানায়। গত দ্বিতীয মহাবিশ্বযুদ্ধের সময এই হাটে সৈন্যদেব ছাউনি হযেছিল কিছুদিনের জন্য। সেই থেকেই হাট আব বসে না। বাস্তা ঘাটেব উন্নতিব জন্য বনগ্রাম শহর এখন আব দূবে নয। হাটের প্রয়োজনও গ্রামবাসীদেব কাছে অনেক কমে গেছে।

কিছু পশ্চিমে অগ্রসর হলেই দেখা যেত রাস্তার ডানধারে বৃহৎ জিউলিগাছ। অতবড জিউলিগাছ আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। গাছের ব্যাস প্রায় তিন হাত। এই গাছটাকে বলা হত ঝাপান তলা। এই গাছে হ'ত চৈত্র সংক্রান্তিতে বীর উৎসব। লাঠি, সড়কি, তলোয়ার ইত্যাদির ক্রীড়া প্রদর্শনী। আশপাশ ও দূর দূরান্তের গ্রামের যুবকরা এসে এই প্রদর্শনীতে যোগ দিত। আর দর্শক সমবেত হত হাজাব হাজার। কোম্পানীর আমলেই এই বীর উৎসব বন্ধ হয়। তবে এ গাছটা দাঁড়িয়েছিল গর্বভরে আর রোমন্থন করত কত বীরের স্মৃতি কথা। পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা গরুর বাছুর হওয়ার পর প্রথম দিন দোহন করে যে দুধটুকু পেত, তা সবটা নিয়ে এসে ঢালত এই গাছের তলায়। জানিনা কোন অদৃশ্য দেবতা এই বৃক্ষে আশ্রয় করেছিলেন! তবে লোকের

বিশ্বাস ছিল এই গাছে প্রথম দিনের দুধ দিলে গাভীর দুধ বেশী হয় আর বাছুরের স্বাস্থ্যও ভালো থাকে।

আজ আর সেই গাছ নেই। তার মাহাত্ম্যের কথাও লোকের বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেছে। ১২৩৮ সালে প্রবল বন্যায় এই গাছটি মারা যায়। এই গাছের পশ্চিমে রাস্তার পাশে ছিল বিরাট আম বাগান। আজ আর তার চিহ্ন নেই, এখন গড়ে উঠেছে সেখানে লোকালয় বঙ্গ ভঙ্গের পর থেকে। এখন এই পথের দু-ধারেই জন বসতি গড়ে উঠেছে। অতীতে একদিকে যে জন-বসতি লুপ্ত হয়েছিল ম্যালেরিয়া আর অবহেলায় আজ আবার তা নূতন করে গড়ে উঠেছে প্রয়োজনের তাগিদে, জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে।

এর কিছু পশ্চিমে অগ্রসর হলেই যুগীন দোওয়া, যেখানে একদিন ছিল কালীচরণের নৌ-ঘাটি। আজ যুগীন দোওয়া ভরাট হয়ে এসেছে, তার বুকের উপর দিয়েই হয়েছে রাস্তা। কেবল মাত্র একটা সাঁকো আছে এই খালের মাঝে। এখন এই খালে ধান ও পাট চাষ হয়। স্থানে স্থানে পুকুরও কাটা হয়েছে দু'একটি। আশেপাশে লোক বসতি হয়েছে। যুগীন দোওয়া পার হলেই পথের ধারে ডান দিকেই গ্রামের রক্ষা কালীতলা। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণের শুক্লপক্ষের শনি অথবা মঙ্গলবার যে কোন দিন পূজা হত খুব ঘটা করে। ছাগবলি হ'ত। এখনও পূজা হয় আনুষ্ঠানিকভাবে। সে ভক্তির আবেগ এখন দুর্লভ। এই কালীতলাতে একটি কৃষ্ণকায় চতুষ্কোন পাথর দেখা যাবে। এই পাথরখানা ছিল সুখপুকুরিয়ার দত্তদের বাড়িতে। এখন ঐখানা এখানে স্থান লাভ করেছে। কালীতলার আশপাশের অঞ্চলকে বলা হয় কাছারি পাড়া। এই গ্রামেই ছিল তিনজন জমিদারের কাছারি। নাটবের মহারাজার কাছারির নাম রাজার কাছারি। এখন সেখানে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়। তার উত্তরে ছিল সাতক্ষীরার গাঙ্গুলী-দের কাছারি। তার পূর্বে ছিল সাতক্ষীরার বাবুদের কাছারি। সব সময় এই অঞ্চল থাকত জম-জমাট। নায়েব, গোমস্তা, পাইক, বরকন্দাজদের বাড়ি ঘর। লোক জনের আনাগোনা। কালীতলার পূর্বপাশ দিয়া উত্তর দিক একটা গ্রাম্য পথ গিয়েছে। এই পথ ধরে কিছুদূর গেলেই ডান হাতে, পড়বে বাড়ুয্যে বাড়ি। এই বাড়ুয্যে বাড়িকে কেন্দ্র করে অনেক কাহিনী আছে। একদিন যা ছিল বাস্তব এখন তা কাহিনা। আবার হয়ত পরবর্তীকালে হবে ইতিহাস। এখন বাড়ুয্যে বাড়ির সেই কাহিনীই আরম্ভ করছি।

বাড়ুয্যে বাড়ির অনেক কাহিনী মন্থন করে যা পাওয়া যায় তার সত্য অসত্য বিচার বা বাছাই করার মত চিহ্ন এখন আর নেই বললেই হয়,

যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাও আশু-বিলুপ্তির অপেক্ষায়। ১৯৫৫-৫৬ সালেও অনেকে যা দেখেছেন এখন আর ত' নেই।

কোম্পানীর আমলের প্রথম দিকে বাংলা দেশ ইংরেজদের হাতে গেলেও নবাবী মসনদের মোহ কাটেনি, সে সময় মীরজাফর ইংরাজের গোলাম হয়ে বাংলার নবাবের সিংহাসন কলঙ্কিত করে বসে আছেন মুর্শিদাবাদে, যে সময় দ্বৈত শাসনের পীড়নে বাংলার ভাগ্যাকাশে নেমেছিল দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া, লুব্ধ কোম্পানীর কর্মচারীদের কর আদায় আর মুনফাখোর পুঁজিপতিদের অধিক মুনফার লোভে বাংলার সমস্ত শস্য হয়েছিল তাদের গুদামজাত, দেশে দেশে খাদ্যের অভাব না থাকলেও মরতে লাগল কৃষক আর দরিদ্র জনসাধারণ, সেই সময় বাংলার বিপ্লবী সত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন সুখপুকুরিয়ার এই বাড়ুয্যে পরিবার।

বাংলার কৃষক ও জনগণকে বাঁচাতে গিয়ে যে আগুন তাঁরা জ্বেলেছিলেন তার *প্রকাশ পায় দস্যুবৃত্তিতে। অর্থলোভী পুঁজিপতিদের শাস্তি দিতে* বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই দলের সৃষ্টি হয়েছিল দেখা যায়। যে সমস্ত বিপ্লবী সেই দুর্দিনে মাথা তুলেছিলেন, অসহায় শোষিত কৃষককুলকে বাঁচিয়ে রাখতে যাঁরা জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সুখপুকুরিয়া গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের নাম উল্লেখ করা যায়।

বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার ছিলেন মধ্যবিত্ত। চাষবাস আর কিছু জমিজমার মালিকানা। তখনকার দিনে এটাই সঙ্গতি-সম্পন্ন মধ্যবিত্তের পরিচয়। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার জমিদার বা গাঁতিদার কিছুই ছিলেন না। বাংলার দুর্দিনে অসহায় কৃষকদের বাঁচাবার জন্য দল গঠন করা হ'ল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হলেন দলপতি। তিনি সেই দলের সাহায্যে পুঁজি পতিদের গোলা লুঠ করতেন, আর লুঠ করা খাদ্যশস্য, টাকা-পয়সা দিতেন কৃষকদের আর দুস্থ লোকদের। সেই দলে দুজন সর্দার ছিলেন। তাঁরাই দলটাকে পরিচালনা করতেন। তাঁরা দুই সহোদর। নাম বগে আর বল্লা। জাতিতে তাঁরা গোপ। চিরকুমার পরমভক্ত কালী সাধক। সত্যই তাঁরা বাংলামার বীর সন্তান।

"দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন" এই নীতিই ছিল বিপ্লবী দলের মূলমন্ত্র। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই দলের থাকবার জন্য গোপন ঘর তৈরী করান তার নিজের বাড়ির বাইরের উঠানের নিচে মাটির তলায়। এবং তার বাড়ির প্রাচীরের ভিতর দিয়ে নিচেয় নামবার গোপন সিঁড়ি ছিল। আজও সেই ঘরগুলির ধ্বংসাবশেষ আছে মাটির তলায়। এখন

তার উপরের জমিতে বেগুন চাষ হচ্ছে, মাটির তলায় আর সে ঘরগুলিতে কেউ যায় না। উপরের বাড়ি ঘর লোপ পেয়েছে। বঙ্গভঙ্গের পর নূতন করে লোক বসতি হয়েছে। ১৯৫৪-৫৫ সালেও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পোড়া দোতলা বাড়িটা বট অশ্বত্থগাছ বুকে নিয়ে রস জুগিয়েছে। পূজার দালানের পদ্মের কাজ তখনও নষ্ট হয়ে যায়নি। চারিদিকে তখন ছিল গভীর জঙ্গল। প্রবেশ করা ছিল দুঃসাধ্য।

এই বিপ্লবীদল বাংলার নানা জায়গায় লুঠ করত। আর সেই লুঠের খাদ্যশস্য টাকা পয়সা দিত কৃষক আর দরিদ্র লোকেদের। কোম্পানী তাদের নাম দিয়েছিল ডাকাত। গ্রামবসীরা তাদের সেই মহান ব্রতকে কখনও সে চক্ষে দেখেনি। এই বিপ্লবীদল ইংরেজদের নীলকুঠি লুঠ করতেও ভয় পায়নি। বর্তমানে বনগ্রাম দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের ঠিক অপর পারে ইছামতী তীরে ছিল ইংরাজদের জয়পুর কুঠি। এখন সেইখানে অনেকে বাড়ি ঘর করে বসবাস করছেন। গুদাম আড়ৎ আরও কত কী? ঐ নীলকুঠি লুঠ হওয়ার পর কোম্পানী ঐ দল ধরার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। তখন নবাবী মসনদ আর নেই, কোম্পানী তখন সরাসরি শাসন ক্ষমতা অধিকার করেছে। দেশে শান্তি শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা চলেছে। চারি-দিকে ধর পাকড় করে ঐ দলের কিছু লোককে ধরেও ফেলেছে।

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি গাজনের উৎসবে দেশ মেতে উঠত। লাঠি তলোয়ার, সড়কি, বল্লম, মল্লক্রীড়া প্রভৃতির প্রতিযোগিতা চলছে তখন প্রতিদিন ঝাপান তলায়। এই উৎসবে বিচারক থাকতেন। পুরস্কারও দেওয়া হত বিজয়ীকে। বগে আর বল্লা দুই ভাই লাঠি খেলেছেন। তাঁদের বয়স তখন ষাট বছরের উপর। বেলা প্রায় শেষ হয় হয়। কোম্পানীর লোকেরা বন্দুক নিয়ে চারিদিক থেকে সেই প্রদর্শনী ঘিরে ফেলল বগে বল্লাকে ধরবে বলে। কিন্তু কোথায় তারা? টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা চক্ষের পলকে উধাও।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আগে থেকে জানতে পারেন কোম্পানীর গুপ্তচর ঘুরছে ধরার জন্য। শোনা যায় তাঁর যত ধন সম্পদ আর অস্ত্র-শস্ত্র যা কিছু গোপন করার মত ছিল সবই বাড়ির পূর্বদিকের যে পুকুর ছিল তার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। বগে বল্লা তখন থেকে গোপন ঘরে থাকতেন আর কালীপূজা করতেন।

বৈশাখ মাস, বেলা তখন দুপুর। বগে বল্লা দুই ভাই তখন মাটির তলায় সেই ঘরে ঘুমুচ্ছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ির সকলে তখন

খাওয়ায় ব্যস্ত। এই সুযোগে কোম্পানীর লোকেরা বাড়িতে হানা দেয়। পরিবারের সকল লোককেই আটক করে। তারপর তাঁরা মাটির নিচের সেই ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় বগে-বল্লার বুকের উপর বাঁশ দিয়ে কুড়ি বাইশ জন চেপে ধরে। বল্লা সেই অবস্থাব থেকেও পালিয়ে যায়। যাবার সময় কোম্পানীর দু-চার জনকে আহতও করে।

এই ঘটনার পর এই দলভুক্ত সন্দেহে প্রায় পাঁচশ জনকে ধরা হয়। গোয়েন্দা বিভাগের সাহায্যে বল্লাকে ধরা হয়। বল্লা তখন চালিতা পোঁতার ইছামতী তীরে গোঘাটা থেকে নদী পার হচ্ছিল সাঁতার দিয়ে। তার কাছে "এনোর" বাগানে বল্লা লুকিয়ে থাকত।

তখন এ অঞ্চলের সরকারী অফিস আদালত ছিল কৃষ্ণনগর। বনগ্রাম তখন নদীয়া জেলার অধীন আর বনগ্রামে তখন মহকুমা আদালতেরও প্রতিষ্ঠা হয়নি। তখন বনগ্রাম থেকে কৃষ্ণনগরে যাওয়ার জন্য যান-বাহন. চলার পথ ছিল না। কৃষ্ণনগরে যেতে হ'ত নৌকা করে। বল্লাকে নৌকায় চিত করে শুইয়ে মোটা দড়ি দিয়ে নৌকার কাঠের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। চালকাব ঘাটের কাছে নৌকা পৌঁচেছে, হঠাৎ বল্লা একটু পাশ ফিরে শুতে চাইল বাঁধা অবস্থাতেই। এতেই নাকি নৌকা উলটে গেল উপুড় হয়ে। প্রায় বার চৌদ্দ জন লোক মবল জলে ডুবে।

কোম্পানী বিচার করল বল্লার আর সেই পাঁচশজন লোকের। তাঁরা ডাকাত বলে প্রচারিত হতে লাগল। তাঁদের সকলকে ফাঁসির হুকুম দিলেন ইংরাজ বিচারক। ফাঁসির জায়গাও ঠিক হল বনগ্রামের কাছে। আজকাল যেখানে দাশ পাড়া তার অনতিদূরে নদীর তীরে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল। সেই গাছটাকে লোকে পরবর্তী কালে বলত ফাঁসি তলার গাছ। তার নিচের নদীর ঘাটকে বলাহত ফাঁসি তলার ঘাট। এই গাছে কপিকল টাঙিয়ে একে একে ফাঁসি দেওয়া হয় সকলকে কয়েক দিন ধরে।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রেহাই পেলেন ফাঁসির থেকে, কিন্তু তাঁকে তার থেকেও কঠোর শাস্তি দেওয়া হল। এ শাস্তি যে কত মর্মান্তিক তার পক্ষে হয়েছিল তা অনুমান করা শক্ত নয়। তাঁর সেই সন্তান তুল্য স্নেহের সহকর্মীদের মৃত্যুদণ্ড স্বচক্ষে দেখবার জন্য তাঁকে বাধ্য করা হল হাত পা বেঁধে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে।

এই হৃদয় বিদারণ দৃশ্য দেখতে দেখতেই সেখানে তিনি জ্ঞান হারান। আর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসেনি। তিনি তার সহকর্মীদের সঙ্গেই ইহলোক ত্যাগ করেন।

এতদিন লোকে তাঁর পোড়ো বাড়িটাকে ডাকাতে বাড়ি বলত। তাঁর বংশের এখনও কয়েক জন জীবিত আছেন তবে কেহই গ্রামে নেই। বাংলার বাহিরেও অনেকে চাকুরি করেন। সঙ্গত কারণেই তাঁদের পরিচয় দিলাম না। দীর্ঘদিন ব্যথা বেদনা বুকে করে ক্ষয়িষ্ণু পোড়ো বাড়িটা অতীত দিনের স্মৃতি রোমন্থন করত। আজ তা লুপ্ত। কে তার সেই অতীত স্মৃতি রক্ষা করার দায়িত্ব নেবে।

বাংলা স্বাধীন হয়েছে অঙ্গহীন হয়ে। আশ্রয় হীন কত গৃহস্থ সেই স্থানে ও আশপাশে সংসার পেতেছেন। বন জঙ্গল পরিষ্কার হয়েছে। কিন্তু সেই কৃষক দরদী, স্বদেশ সেবক, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা বা সেই কালী সাধক চিৎকুমার বীর বগে বলার কথা তাঁরা কেউই জানেন না। শোনা যাবে তাঁদের গবের কিছু নেই, শোনাযাবে তারা ডাকাত ছিল তারা ছিল লুটেরা।

বাড়ুয্যে বাড়ির ঠিক উত্তরে ছিল মুখুয্যেদের বাড়ি, রায় বাগানের ঠিক দক্ষিণে। সঙ্গতি সম্পন্ন গৃহস্থ। কোম্পানীর আমলে উচ্চ সরকারী পদের অধিকারী হয়ে বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করেন পুকুর কাটান আর প্রতিষ্ঠা করেন শিব মন্দির। মন্দির বৃহৎ না হলেও কারুকার্যের প্রশংসা করা যেত। এখন মন্দির শিবহীন। ১৯৫১ সালে বৃহৎ আকার কোষ্ঠী পাথরের শিবলিংগ চুরি হয়ে যায়। মুখুয্যে বাড়ির আর চিহ্ন নেই, মন্দির আর পুকুরটাই আছে সাক্ষী দিতে। উত্তরাধিকারগণ একে একে সকল সম্পত্তি হস্তান্তর করেছেন। বাড়িটাও সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে বিক্রি করে দিয়েছেন।

সুখপুকুরিয়ার উত্তর অংশে মুসলমান পাড়া। বঙ্গ ভঙ্গের পর মুসলমান পল্লীর কেহই স্থান ত্যাগ করেনি। এই পল্লীর লোকদের চালে চালে বাস ছিল। সময় সময় মহামারী আর ম্যালেরিয়ায় পল্লী উজাড় হ'ত। এখনও কয়েক ঘর আছে। সকেলরই মাটির বাড়ি ছিল। এখন দু'একখান কোঠা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। যারা আগে সম্পদশালী আর ধনে জনে বলীয়ান ছিলেন তাঁদের আজ চরম দৈন্য ও দেখা যায়। এদের সকলেই কৃষিজীবী আর ক্ষেত মজুর। পল্লীর কেন্দ্রস্থলে জুম্মাঘর আর পাকা ইঁদারা বহু কালের।

এছাড়া গ্রামে নবশাকের বাস ছিল। এখন তাঁরা সকলেই স্থান ত্যাগ করেছেন রুজি রোজগারের তাগিদে। গ্রাম্য জীবনের উপর নির্ভর করে আর তাদের চলত না।

গ্রামের মধ্য-বিত্ত সম্প্রদায়ই ছিলেন গ্রামের প্রাণকেন্দ্র। তারাও রুজি রোজগারের তাগিদে গ্রাম ত্যাগ করেছেন। যাঁদের ছিল মাটির বাড়ি আজও

তাঁদের ভিটে পড়ে আছে। যাদের পাকা বাড়ি ছিল তা এখন ধ্বংস স্তূপ হয়ে অতীতের সকল ঐতিহ্য গোপন করার চেষ্টা করছে ধীরে ধীরে। দত্তপাড়ায় দত্তরা নেই।

এই দত্ত পরিবারের পূর্ব পুরুষ প্রতাপাদিত্যের রাজস্ব সংগ্রাহক কালনীর দত্ত। বনগ্রামের দত্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। বাগআঁচড়া গ্রামে তাঁর বসতি ছিল। সেখান থেকে তাঁর বংশধরেরা প্রথমে সুখপুকুরিয়ায় আসেন। স্বরূপ নারায়ণ দত্তদের প্রপিতামহ বনগ্রামে বসতি করেন। স্বরূপ নারায়ণ টাকির জমিদারের খ্যাতনামা আমীন ছিলেন। স্বরূপনারায়ণের পুত্র বিষ্ণুচরণ দত্ত ইংরাজ আমলে ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল হয়েছিলেন। তিনি রায় সাহেব খেতাব পান (১৮৯২ খৃ.)। এই দত্তদের নামেই বনগ্রামের দত্ত পাড়া (যশোর—খুলনার ইতিহাস—পৃঃ ২২২)।

দত্ত পরিবারেই জন্মে ছিলেন যদুনাথ দত্ত। বনগ্রামের মুনসেফ্ কোর্ট আর ডাক বাংলা তার হাতেই তৈরী। বোসেদের কেউ কেউ পৈতৃক ভগ্ন গৃহে টিম্‌টিম্ করছেন। কাছারি পাড়ায় ঘোষেরা, দত্তেরা, গ্রাম ত্যাগ করে চলে এসেছেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে মুখুয্যে আর চক্রবর্তীদের কেউ কেউ এখনও পৈতৃক ভিটে আঁকড়ে আছেন। মুখুয্যেদের তিন পাড়ায় তিন ঘর আছেন। যাঁরা এই গ্রামের অধিবাসী সকলেই বঙ্গভঙ্গের পর নবাগত।

সুখপুকুরিয়ার গ্রাম্য সমাজ যা অতীতে ছিল তা হারিয়ে গেছে। পূজা পার্বণ ও নানা উৎসবে মুখর থাকত গ্রাম। মনসার ভাসান, সাঁাকফল বা ফলুই, যাত্রা, ডাক সংক্রান্তি, নবান্ন—এ সব উৎসব গ্রামবাসীদের প্রাণ প্রাচুর্যের পরিচয় দিত। বিরাট গ্রাম এখন আর এ পাড়া ও পাড়ার যোগাযোগ নেই।

অতীতের সমাজ ব্যবস্থা ও তার বন্ধন কত সুদৃঢ় ছিল তা এই গ্রামের উঁচুপোতাগুলো দেখলেই অনুমান করা যায়। নদীর তীরে প্রতিটি পরিবারের জন্য সু-উচ্চ পোঁতা নির্মাণ করে বাড়ি করা হয়েছিল। সু-পরিকল্পনা ব্যতীত সম্ভব নয়। তবে তার ইতিহাস হারিয়ে গেছে। বহু প্রাচীন এই গ্রাম; সুতরাং সব ইতিহাস আর কাহিনী উদ্ধার করা সম্ভব নয়। সুদূর অতীত সুদূরেই বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে যারা আছেন তারা অতীত নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। বর্তমানের নিত্য বেদনা আর ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় তাঁরা সদাই শঙ্কিত। দিন গত পাপক্ষয়, গতানুগতিক জীবন ধারার আবর্তে অতীত হারিয়ে যাচ্ছে। সংস্কৃতি বলতে আর এখন কিছুই নেই। সমাজ বলতেও আর কিছু নেই। তবুও রাজনীতি থেকে গ্রামের লোক

দূরে নেই। দল মত সবই আছে। বর্ণের বৈষম্য ঘুচেছে কিন্তু নীতির বৈষম্য দানা বেঁধেছে। শহরের অনতিদূরে উজাড় হয়ে যাওয়া গ্রামের এমন সার্থকরূপ আর বড় একটা দেখা যায় না এখন। যানবাহন চলাচলের যদি পাকা সড়ক থাকত তাহলে এই গ্রাম আদর্শ গ্রামের দাবী করতে পারত। সড়ক ব্যবস্থাই এই গ্রামকে এখনও পেছনে ফেলে রেখেছে। সামান্ত কোন জিনিসের প্রয়োজন দেখা দিলে ছুটতে হয় ঘাটবাঁওড় নয় বনগ্রামে। গ্রামে নিত্য প্রয়োজনের কোন দোকান নেই। পথের কষ্ট লাঘব করতে কেউ চায়ের দোকান খুলে বসে আছে সে চিন্তা করাটাও এ গ্রামে শুধু অস্বাভাবিক নয়, অসম্ভবও।

৬

বৈরামপুর

বনগ্রাম থেকে আট মাইল পশ্চিমে বনগ্রাম চাকদহ রোডের বাঁ হাতে বর্ধনবেড়িয়ার মোড। সেই মোড থেকে সর্পিল গতিতে একটা কাঁচা রাস্তা দক্ষিণ দিকে গেছে। এই রাস্তা ধরে বর্ধনবেড়ের মধ্য দিয়ে দুই মাইল গেলেই যে গ্রামটা পাওয়া যায় তার নাম বৈরামপুর। শোনা যায় আকবরের সেনাপতি ও অভিভাবক বৈরাম খাঁর-নাম অনুসারেই ঐ গ্রামের নাম রাখা হয়েছিল বৈরামপুর।

বনগ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামগুলির মধ্যে বৈরামপুর গ্রাম যে অধিক প্রাচীন একথা গ্রামবাসীরা দাবী করেন। এই গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা রাজা সুরেশ্বর রায়। তাঁর গ্রাম প্রতিষ্ঠারও একটা কাহিনী আছে। রাজা খেতাব তাঁর পূর্বে ছিল না। তিনি কায়স্থ কুলোদ্ভব 'পালিত' উপাধিধারী। আদি নিবাস বর্তমান খুলনা জেলার কোন অঞ্চলে ছিল। তিনি ভাগ্যান্বেষণে বের হন। গঙ্গাতীরে উত্তরপাড়ায় ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। নদী পথে দূর-দূরান্তর থেকে মাল আমদানি রপ্তানি ছিল তাঁর কাজ। ১৫৩৯ খ্রীঃ কোন এক সন্ধ্যায় আকাশে ঘনঘটাচ্ছন্ন মেঘ। একটা যাত্রী বোঝাই নৌকা তাঁর ঘাটে এসে ভিড়ল। নৌকার মাঝি তাঁর কাছে নৌকার যাত্রীদের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করল। সুরেশ্বর তাঁদের আশ্রয় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। অতঃপর নৌকার যাত্রীরা যখন তাঁর কাছে এলেন তখন তিনি দেখেন তাঁরা শুধু মুসলমান নন তাঁরা উচ্চ বংশসম্ভূত রাজপুরুষ। তাঁদের মধ্যে বোরখা আবৃতা নারীও আছে। যা হ'ক তিনি আতিথেয়তার ত্রুটি করেন নি। রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর নৌকা যাত্রীরা বিদায় নেওয়ার কালে নারী যাত্রীটি সুরেশ্বরকে একখানি পাঞ্জা দেন এবং গৌড়েশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। সুরেশ্বরকে তিনি হুমায়ুনের পত্নী নামে আত্ম পরিচয় দেন। কয়েক দিনের মধ্যেই সুরেশ্বর গৌড় যাত্রা করেন। হুমায়ুন

শের খাঁকে গৌড় থেকে বিতাড়িত করে নিশ্চিন্ত আলস্যে গৌড় বারাঙ্গনাদের নৃত্য গীতে সময় অতিবাহিত করছেন। পথশ্রান্ত সুরেশ্বর সর্বপ্রথম যার কাছে নীত হন তিনি বৈরাম খাঁ। বৈরাম খাঁ তাঁকে হুমায়ুন সকাশে নিয়ে যান। তাঁর আতিথেয়তার পুরস্কার স্বরূপ হুমায়ুন তাঁকে 'রায়' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং 'রাজা' খেতাব দেন ও বিরাট ভূ-ভাগ জায়গীর প্রদান করেন। নিজ বাটি নির্মাণের জন্য সুরেশ্বর এই অঞ্চলের মধ্যে এই স্থান নির্বাচন করেন এবং বৈরাম খাঁর নাম অনুসারে এই স্থানের নামকরণ করেন বৈরাম-পুর।

রাজা সুরেশ্বর রায়ের দু'পুরুষ পরে সন্তোষ রায়ের সময় জায়গীরের মুনাফা দাঁড়ায় এক কোটি টাকা, এ কারণে সন্তোষ রায়-এর রাজা খেতাবের জায়গায় হয় ক্রোড়ীশ্বর সন্তোষ রায়। তিনি একশত বিঘা জমির চতুর্দিকে সুগভীর গড় খনন করে তার মধ্যে বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং সে সঙ্গে পুকুর ও দীঘি খনন করান। সেই সঙ্গে দুটি শিব মন্দির নির্মাণ করে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া রাধাকৃষ্ণের মন্দির, দোলমঞ্চ, দুর্গা-পূজা মণ্ডপের দালান ও কৃষ্ণ বলরাম বিগ্রহও প্রতিষ্ঠা করেন পরবর্তীকালে।

বায়েশাচ গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁরা গ্রামে ব্রাহ্মণ এবং নবশাক যেমন কামার, কুমার, তাঁতি, ময়রা, বারুই, নাপিত এ ছাড়া গোয়ালা, ধোপা জেলে ইত্যাদি সকল শ্রেণীর জাতিকে এনে জমি-জমা দিয়ে গ্রাম্য সমাজ গড়ে তোলেন। সে সমাজ আজ না থাকলেও তার ক্ষীণধারা আজও বর্তমান। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা এখনও গ্রামে বাস করছেন তাঁদের মধ্যে চট্টোপাধ্যায়দের বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ভট্টাচার্যদের পঞ্চানন ভট্টাচার্য পুরোহিত বংশের ক্ষীণ শিখা। এ ছাড়া পরবর্তী-কালে বদন চৌধুরী নামে যে পশ্চিমা ব্রাহ্মণ এসে ছিলেন লোটা-কম্বল সম্বল করে এবং ভুষি মালের ব্যবসায় করে অগাধ ধনী হয়েছিলেন। তাঁর বংশধর নরেন ও গিরীন রায়চৌধুরী গ্রাম আঁকড়ে আছেন। বদন রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত একটি শিব মন্দিরও আছে জনবসতির থেকে দূরে পুষ্করিণীর ধারে। বদন চৌধুরীকে নিয়ে একটা ছড়াও এখন গ্রামবাসীরা বলেন।

"বদন চৌধুরী এ দেশে এল লোটা কম্বল সম্বল করে,
হ'লে সে বিরাট ধনী ভুষি মালের ব্যবসা ধরে।"

কায়স্থদের মধ্যে গ্রামের প্রবেশ পথে প্রথমেই পড়ে ঘোষেদের দ্বিতল অট্টালিকা, বহির্ভাগে প্রবেশ তোরণের থাম বর্তমান। ডাঃ বিনয় ঘোষ এ বাড়িতে বাস করছেন। এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন সারা ভারতের অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক অজয়কুমার ঘোষ। তাঁর পিতা রঘু ঘোষ কানপুর

প্রবাসী এবং ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। অজয়কুমার রুশ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কৈশোরকালে। পরবর্তীকালে কোন যোগাযোগ ছিল না।

এর পরই মিত্র পরিবার। বর্তমানে ধীরেন মিত্র ও তাঁর ভাই বাস করছেন। পৈতৃক একতলা বাড়ির সামনে দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেছেন। চাষবাস তাঁর সম্বল। পল্লীপ্রীতি তাঁর প্রবল। এ ছাড়া বিশ্বাস পরিবারে আছেন শ্যামল বিশ্বাস।

রায়েদের পূর্বের গৌরব রবি অস্তমিত। তাঁদের অনেকে গ্রাম ত্যাগ করে নাগরিক জীবন যাপন করছেন। বর্তমানে সুধাংশু রায়, সন্তোষ রায় এবং তাঁদের কয়েকজন জ্ঞাতি রায়গড়ে আছেন। বৃহৎ প্রাসাদের কিয়দংশ নিজ নিজ সুবিধামত সংস্কার 'করে বাস করছেন। শিব মন্দির দু'টি বিগত ১২৪১ বঙ্গাব্দে হরিদাস রায় কর্তৃক সংস্কার হলেও বর্তমানে ভগ্নদশা। মন্দির গাত্রে প্রাচীন কারুকার্য, রামলীলার খোদিত চিত্র আর স্পষ্ট বোঝা যায় না। এর পাশেই ছিল বিরাট দোলমঞ্চ, এখন ধ্বংসস্তূপ। দোলমঞ্চের পাশে তেলকদম গাছে বসে কুল্লো পাখি প্রহর ঘোষণা করত প্রহরে প্রহরে। তার অস্তিত্ব বহুকাল লুপ্ত হয়েছে। দোলমঞ্চের অনতিদূরে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে বলরাম রায় নূতন দোলমঞ্চ নির্মাণ করেছেন। এই দোলমঞ্চের পাশেই রাধাকৃষ্ণের মন্দির। কৃষ্ণ বিগ্রহ কোষ্ঠি পাথরের, রাধা অষ্টধাতু নির্মিত। এখনও সকল বিগ্রহের নিত্য পূজা হয়, তবে পূর্বের সে জাঁক-জমক নেই। শ্রীকৃষ্ণের অনেক অলৌকিক কাহিনীও শোনা যায়। রায় বাড়ি নিত্য অতিথি সেবা হ'ত। রাত্রিকালে কোন অতিথির আগমন ঘটলে শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত গৃহস্থকে অতিথি সেবা করার জন্য জাগিয়ে দিতেন। একবার এক রাত্রে একদল সশস্ত্র ডাকাত এসে রায়গড়ে হানা দেয়। শ্রীকৃষ্ণ বালকবেশে তোরণের দ্বার উন্মোচন করেন। ডাকাত দল ভিতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিশক্তি হারায়। তোরণ দ্বারও রুদ্ধ হয়ে যায়। নিরুপায় ডাকাতেরা সারারাত্রি শিব মন্দির প্রাঙ্গণে অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়। নিশাবসানে তারা ধরা পড়ে এবং সকল বৃত্তান্ত ব্যক্ত করে। কৃষ্ণের পূজা অন্তে তারা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায় এবং মার্জনা ভিক্ষা করে মুক্তি পায়।

এই কৃষ্ণ স্বপ্নে দেখা দেন এবং তাঁকে বৃন্দাবনের কুঁচবন থেকে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাধাকে রায় বংশ কর্তৃক ঐ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের পাশে প্রতিষ্ঠা করা হয়। রায় বংশের আর এক বিগ্রহ কৃষ্ণ বলরাম এ

মন্দিরেও স্বপ্নাদেশে প্রতিষ্ঠা করা হয় ও বিগ্রহ স্থাপন করা হয়। কৃষ্ণ বলরাম মূর্তি রায় বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি কারণ শ্রীকৃষ্ণ অন্নভোগ দাবি করেন; সে কারণে রায়দের পুরোহিত বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীকালে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১২০২ বঙ্গাব্দে ২৪শে অগ্রহায়ন এই কৃষ্ণ বলরাম বিগ্রহের সেবার জন্য বৃন্দপাল্লা গ্রামের সাড়ে তেইশ বিঘা এবং বৈরামপুর গ্রামে সাড়ে বাইশ বিঘা জমি দান করেন। তার আয়ে বিগ্রহ সেবা চলত। কিন্তু পুরোহিতেরা একে একে সকল সম্পত্তিই নষ্ট করে ফেলেন। অবশিষ্ট যা ছিল তা সরকার গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে কৃষ্ণ বলরামের স্থানচ্যুতি ঘটেছে। বৈবাহিক সূত্রে এবং বঙ্গভঙ্গে কুষ্টিয়ার অন্তর্গত খয়েরপুর গ্রাম থেকে আগত গুরুপদ চক্রবর্তী মহাশয় এই বিগ্রহের ভার নিয়েছেন। তিনি মুখোপাধ্যায়দের ভিটার ভগ্নস্তূপের পাশে গৃহ নির্মাণ করে বাস করছেন। কৃষ্ণ বলরাম এখন তাঁর গলগ্রহ। আয় উপার্জনের পথ রুদ্ধ। সরকার থেকে সামান্য বৃত্তির প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন, কিন্তু তা পাওয়া দুষ্কর হয়েছে। আবেদন নিবেদনেও সরকারী দপ্তরের কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

রায় বাড়িতে দুর্গাপূজা প্রায় চারশ' বছর ধরে আজও হয়ে আসছে বলে দাবি করেন রায়েরা। শুধু যশোহর নয় তদানীন্তন নদীয়া জেলার মধ্যে বৈরামপুর রায় বাড়ির দুর্গোৎসব প্রাচীনতম একথা গ্রামবাসীরা বলেন। পূজার দালান জীর্ণ, বোধনের বেলগাছ খুব প্রাচীন নয়। প্রাচীন গাছ বার্দ্ধক্যহেতু জীবন ত্যাগ করার পর নূতন গাছ পোতা হয়েছে।

রায়দের গড় দিয়ে ঘেরা একশত বিঘা জমির অধিকাংশ স্থানেই জঙ্গল আর ইটের স্তূপ। যারা বাস করছেন নিজ নিজ সামর্থ্যমত পরিষ্কার করেছেন, শরিকদের অংশ তাঁদের বসবাসের বিঘ্নস্বরূপ। যাঁরা ভিটে আঁকড়ে আছেন তাঁদের অবস্থায় ভাঁটা পড়েছে। চাষবাস করে দিনাতিপাত করছেন আবার কেউ। চাকুরিতে অবসর গ্রহণের পর গ্রামে এসে অবসর জীবন যাপন করছেন। এই বংশজাত চারুচন্দ্র রায় বনগ্রামে 'পল্লীবার্তা' সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের প্রবর্তক। বনগ্রামে প্রথম ছাপাখানার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সাহিত্যিকও ছিলেন। তাঁর লিখিত দু'খানি বই "নিকারবিবি" ও "গল্পতুফান"। বর্তমানে সে ছাপাখানা আর পত্রিকার অবস্থা শোচনীয় উপযুক্ত পরিচালক অভাবে। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পঙ্কজ রায় কোন প্রকারে টিকে আছেন। চারু রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র সুধাংশু রায় পৈতৃক বৃহৎ

অট্টালিকার কিয়দংশ সংস্কার করে কায়ক্লেশে বৈরামপুরে চাষবাস করে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁর অট্টালিকার সকল অংশই এখন ভগ্নস্তূপ।

স্বনামধন্য দেশরত্ন ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত এই গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। কযেক বছর হ'ল তিনি ইহধাম ত্যাগ করেছেন। গ্রামের দক্ষিণে তাঁর মাটির বাড়ি টালির চাল যুক্ত। তাঁর পৌত্রেরা এখন চাষবাস করছেন। ইন্দ্রনারায়ণ দেশ সেবার মহান ব্রত নিয়ে সকল খ্যাতি প্রতিপত্তি বিসর্জন দিয়ে রাজনীতি ত্যাগ করে এই ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত গ্রাম বসবাসের উপযুক্ত বলে মনে করেন ম্যালেরিয়া ক্লিষ্ট জনগণকে সেবা করার জন্য।

বৈরামপুর গ্রামে প্রায় তিনশত ঘর মুণ্ডা জাতীয় আদিবাসী বাস করছেন। তাঁদের আগমন বৃটিশ যুগে নীল চাষের সময়। বর্তমানে কৃষিকার্যে এরা যথেষ্ট উন্নত। এদের মধ্যে কিছু ক্ষেত মজুরও আছেন। আবার কেউ কেউ শিক্ষিত চাকুরিয়াও আছেন।

বৈরামপুরে মুসলমান বসতি বলতে তেমন দেখা যায় না। রায়দের দুর্গা প্রতিমা নির্মাণের জন্য একঘর পটুয়ার বাস ছিল। শেষ বংশধর মহম্মদ ভূষণ পোটো প্রতিমা নির্মাণ করতেন আর ছুতার মিস্ত্রীর কাজ করতেন। তাঁর হাতের অনেক কারুকার্য গ্রামে ছড়িয়ে আছে। ভূষণ নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর ভিটেয় একটা দরগা এখনও ভগ্নদশায় বর্তমান। হিন্দু মুসলমান এখনও দরগা তলায় দুধ দেয়। আর একজন মুসলমান অধিবাসী ছিলেন তাঁর নাম মোকে ফকির। চাষবাস তাঁর জীবিকা ছিল। নিঃসন্তান হওয়ায় সে বংশও শেষ। বর্তমানে গ্রামের ভিতর কোন মুসলমান গৃহস্থের বসবাস নেই। পাশের গ্রাম বর্ধনবেড়ে মুসলমান প্রধান। সেখানে একটা মসজিদও আছে।

১৯৪৭ সালে বঙ্গভঙ্গের পর এই গ্রামে বহু লোকের সমাগম ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে বারুজীবীর সংখ্যাই অধিক। তাঁরা তাদের জাতীয় ব্যবসা ও চাষবাসে যথেষ্ট স্বচ্ছলতা লাভ করেছেন।

এই গ্রামে বর্তমানে কৃষিই প্রধান জীবিকা। প্রাচীন ও নবাগত সকল অধিবাসীই চাষবাস করেন সেই সঙ্গে অন্য উপজীবিকাও আছে। অনেক পরিবারের কেউ না কেউ চাকুরি ব্যবসা ইত্যাদি কাজেও নিযুক্ত আছেন। বর্তমানে বিজ্ঞান ভিত্তিক কৃষি কার্যে অনেকে সমধিক উন্নত। তবে সরকার প্রদত্ত গভীর নলকূপের আনুকুল্য থেকে অনেকেই বঞ্চিত। যে ব্যবস্থায় নলকূপ বসান হয়েছে তাতে সীমিত পরিমাণ জমিই সেচের

আওতায় এসেছে। উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা থাকলে এ গ্রাম যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করতে পারত সে কথা বলার যথেষ্ট অবকাশ আছে। গ্রামে প্রবেশ পথে একদিকের মাঠ সরকারী জল পাচ্ছে অপর দিকের মাঠ ধু ধু করছে। এ বৈষম্য মূলক ব্যবস্থা গ্রামবাসীদের প্রাণে কাঁটার মত বিঁধছে। গ্রামে তিন জন গৃহস্থ গৃহে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালার সুযোগ পেলেও তাদের মাঠে গভীর নলকূপের জল পৌছায়নি।

নবাগতদের আগমনে গ্রামে শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু উন্নতি ঘটেছে। গ্রামের উত্তর সীমানায় একটা জুনিয়ার হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছে। দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠিত না হলেও গ্রামবাসীরা এতে যথেষ্ট উপকৃত। এরপর মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করতে গেলে গোপালনগর যেতে হয়।

বৈরামপুর গ্রামে প্রগতির ছোঁয়া বেশ লেগেছে। দেব দেবীর মন্দিরের পাশেই কুক্কুট বিহার করে বেড়াচ্ছে। অনেক গৃহস্থই এখন দেশী মুর্গী পালন করছেন। আবার কেউ কেউ নিতান্ত প্রাচীনত্বের ধারা বজায় রাখতে সচেষ্ট হলেও তাঁদের সন্তানেরা রাত্রে বিজলী বাতির আলোয় ব্যাডমিন্টন খেলছে। ঘরে ঘরে রেডিও বাজছে।

বৈরামপুর গ্রামের সব থেকে অসুবিধা রাস্তার। গ্রামবাসীরা জানান চাকদহ রোড থেকে যে পথ গ্রামের মধ্য দিয়ে পাল্লা পর্যন্ত গিয়ে গোপালনগর চৌবেড়িয়ার রাস্তায় মিশেছে। ঐ সাত মাইল পথ পাকা হলে যাতায়াতের ও পরিবহনের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হ'ত। বর্ষাকালে এই কাঁচাপথ শুধু দুর্গম নয় সঙ্কট জনক।

বৈরামপুরের পশ্চিমে আছে বিরাট বিল। এই বিল থেকে একটা প্রশস্ত খাল যমুনা নদীতে মিশেছে। আর একটি খাল গ্রামের পূর্বদিক থেকে ইছামতী নদীতে মিশেছে। এখন এই খালে ধান চাষ হচ্ছে। আগে এইখাল দুইটি যাতায়াত ও পরিবহনের পথ ছিল। এখন ভরাট হয়ে উঠেছে। বিল শ্যাওলা আর পদ্মদামে ভরে গিয়েছিল। এখন কিয়দংশ পরিষ্কার করা হয়েছে, মাছের চাষ করছেন একজন নবাগত। বিলে রক্ত কমল ফুটে থাকে।

বৈরামপুরে এখন যাঁরা আছেন তাঁরা নূতনভাবে নূতন জীবন ধারার সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। অপরদিকে কত অট্টালিকার স্তূপ 'বন' জঙ্গল নীরবে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করছে। সে ইতিহাস কে উদ্ধার করবে? কেই বা শোনাবে অতীতের সেই সুখ দুঃখের গুঞ্জন? হয়ত একদিন আবার সেই স্তূপ ও জঙ্গল মানুষের পদভারে

কম্পিত হবে। একদিন যে গ্রাম ম্যালেরিয়া আর মহামারীতে ধ্বংস হয়ে মুষ্টিমেয় অসহায় হতাশাগ্রস্ত লোক নিয়ে জঙ্গল আবৃত হয়ে শ্বাপদ সঙ্কুল করে তুলেছিল, সেই গ্রাম যে আবার ধীরে ধীরে জন কোলাহল মুখর হয়ে উঠেছে, অতীতের সকল জড়তা ও হতাশা দূর করে কর্ম ব্যস্ত জীবন ধারার সঙ্গে মিশে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে; এতে বিস্ময়ের কিছু নেই—এটাই অভিপ্রেত। সৃষ্টি, স্থিতি আর লয় জাগতিক নিয়ম চক্রাকারে ঘুরছে।

চৌবেড়িয়া

বনগ্রাম শহর থেকে চৌদ্দ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ২৭ পরগণা জেলার সীমান্তে নদীয়া জেলার সীমা ঘেঁষে যে কয়খানি গ্রাম যমুনা নদীর তীরে তাদের অতীত দিনের কত হারিয়ে যাওয়া সুখ দুঃখের স্মৃতি আজও রোমন্থন করে চলেছে তাদের মধ্যে অতি পরিচিত নাম চৌবেড়িয়া। বর্তমানে চৌবেড়িয়া বাংলার কেন ভারতের তীর্থ ক্ষেত্র বললে বোধ করি অতিশয়োক্তি হবে না। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র এই চৌবেড়িয়া গ্রামের মাটিতেই প্রথম পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন।

চৌবেড়িয়া গ্রামের উৎপত্তির ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে তার নামের মধ্যে। যে যমুনা নদীর তীরে চৌবেড়িয়া সে নদীকে দেখলে আজ বিশ্বাস হতে চায় না যে এ সেই যমুনা যার তীরে আগ্রা যার তীরে মথুরা বৃন্দাবন। যার তীরেই ব্রজের রাখাল শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী বাজত এ সেই যমুনা প্রয়াগ তীর্থে গঙ্গা আর সরস্বতী নদীর সঙ্গে মিশে ত্রিবেণী সঙ্গম-এর সৃষ্টি করে বহুজনের আকাঙ্খিত তীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। এ সেই যমুনা বাংলার মুক্তবেণী হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে গঙ্গা সরস্বতী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রবেশ করেছে নদীয়ার সীমারেখা দিয়ে অধুনা ২৪ পরগণা জেলার মধ্যে। প্রশস্ত স্রোতস্বতী যমুনা একদিন চৌবেড়িয়া গ্রামের চতুর্দিক বেষ্টন করে কুলু কুলু নাদে বয়ে যেত। পাঠান আমলের শেষের দিকে কাশীনাথ রায় নামে একজন কায়স্থ রাজা এইখানে দুর্গ

* নদীয়ার কাহিনী ২২৩ পৃঃ, কুশদ্বীপ কাহিনী ৭ ও ৮ পৃঃ, যশোর খুলনার ইতিহাস ৩৩১ পৃঃ

নির্মাণ করেন আর তার নামকরণ করেন চতুর্বেষ্টিত দুর্গ। যমুনা এর চতুর্দিকে পরিখার কাজ করত। কাশীনাথের এই সুরক্ষিত সুদৃঢ় দুর্গে প্রবেশ করাও খুব শক্ত ছিল।

বাংলা দেশে মোগল আধিপত্য বিস্তারের জন্য আকবরের প্রধান সেনাপতি মানসিংহ যখন পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাংলায় আসেন সে সময় কাশীনাথ মোগলদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। মোগল-পাঠান যুদ্ধে মোগলদেরই জয় হল। কাশীনাথের সাহস, বীরত্ব—আর যুদ্ধ কৌশলের কথা শুনে আকবর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তিনি কাশীনাথকে "সমর সিংহ" উপাধি দান করেন। এরপর কাশীনাথ অধিক দিন আর বাঁচতে পারেন নি। গুপ্ত ঘাতকের হাতে তিনি নিহত হন।

কাশীনাথের রাণী সেই গুপ্ত ঘাতককে চিনেছিলেন। সে একজন ক্ষমতালোভী মোগল অনুগ্রহপুষ্ট কর্মচারী। রাণী তার বিরুদ্ধে নালিশ জানান আকবরের কাছে। আকবরের রাজস্বসচিব টোডরমল্ল, সেনাপতি মানসিংহ আরও অনেক ছোট বড় কর্মচারী এলেন চতুর্বেষ্টিত দুর্গে। সেখানে দরবার বসল। টোডরমল্ল সেই বিশ্বাসঘাতক মোগল কর্মচারীকে উপযুক্ত শাস্তি দিলেন। এই চতুর্বেষ্টিত দুর্গেই বাংলা দেশে মোগলদের প্রথম দরবার। এই দুর্গ থেকেই সর্বপ্রথম আকবরের বঙ্গবিজয় ঘোষণা করা হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই চতুর্বেষ্টিত দুর্গের পটভূমিকায় বনগ্রামের মহকুমা শাসকের বাংলোর বকুলতলায় বসে তাঁর 'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাস রচনা করেন। এখন সেই ঐতিহাসিক দুর্গের কোন চিহ্নই অবশিষ্ট নেই। সমস্তই যমুনা গ্রাস করেছে। পূর্বের সেই চতুর্বেষ্টিত দুর্গের সংলগ্ন স্থান বর্তমান চৌবেড়িয়া, রাজার বাগান আর শেহালা গ্রাম তিন খানি এই নূতন নামে আজ বর্তমান।

বঙ্গবিজয় ঘোষণার কিছুকাল পরেই চতুর্বেষ্টিত দুর্গ তার সকল গৌরব ব্যথা বেদনা বুকে নিয়ে চিরতরে আত্মগোপন করেছে যমুনার গর্ভে। নূতন গ্রাম তিনখানি কত উত্থান পতন, দুঃখ কষ্ট, লাঞ্ছনার স্মৃতি বুকে নিয়ে আজও বেঁচে আছে। বৃটিশ আমলে নীলকুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলার বিভিন্ন স্থানে। ইচ্ছামতী তীরে মোল্লাহাটি ছিল তার প্রধান কার্যক্ষেত্র। যমুনা নদীর তীরে চৌবেড়িয়ার অপর পারে নিমতলার কুঠির ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র এই নিমতলার কুঠিকে কেন্দ্র করেই তাঁর বিখ্যাত 'নীলদর্পণ' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

বর্তমানে চৌবেড়িয়া যাওয়ার পাকা সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে

গোপালনগর থেকে নহাটার মধ্য দিয়ে। এই পথের উপরেই নীলকুঠির কিয়দংশ পড়েছে। অবশিষ্ট অংশে ভগ্ন ইমারত। বাঁধানো বড় বড় চৌবাচ্চা আজও আছে। যমুনা নদী এখন মজে গেছে স্রোতহীন কচুরিপানা আর শ্যাওলায় ভর্তি। যমুনার ক্ষীণ তণুর উপর কোন সেতু নির্মাণের প্রয়োজন হয়নি একটা সাঁকোতেই যমুনা অতিক্রম করে পাকা সড়ক পরপারে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। আর এই যমুনা নদী বয়েই একদিন আসত নৌকাযানে মোগল বহর, উজির, নাজির আরও কত কেওকেটার দল। এই যমুনা নদীতে নৌকাযানে আসতেন চৌবেড়িয়ায় দীনবন্ধু ভবনে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রসরাজ অমৃতলাল বসু প্রভৃতি স্বনামধন্য প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীগণ। যমুনার স্রোতধারা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এল গ্রামগুলোও হয়ে পড়ল যতায়াতের অযোগ্য বনজংগলময়। প্রবল ম্যালেরিয়ায় উজাড় করে দিয়ে গেল ঘন বসতিপূর্ণ গ্রাম।

পরিত্যক্ত গ্রাম পড়ে থাকল কতকগুলি অনগ্রসর কৃষক ও মধ্যবিত্ত নিয়ে। নীলকর কুঠিয়ালদের অত্যাচারে হৃত সর্বস্ব কৃষককুল অতীতের ক্ষত বুকে নিয়ে দিন গুণতে থাকল। উচ্চ-মধ্যবিত্ত যাঁরা তারা রুজি ও রোজগারের তাগিদে গ্রামের ভিটে ছেড়ে সরে এলেন শহরাঞ্চলে। বহু মনীষী পদধূলি পূত চৌবেড়িয়া অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে টিকে থাকল। বঙ্গভঙ্গের পর আবার নতুন করে জনবসতি হল। তাদের প্রয়োজনের তাগিদে গড়ে উঠেছে স্কুল, গড়ে উঠেছে সরকারী সাহায্যপুষ্ট পাঠাগার। গ্রামের বুকের উপর দিয়ে চলে গেছে পাকা সড়ক। নিত্য যান্ত্রিক যানবাহনের আনাগোনা। যে তীর্থক্ষেত্র দেখতে আজ প্রায়ই দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকেরা যান সেই তীর্থক্ষেত্রের হাল বড়ই বেদনাদায়ক। দীনবন্ধুর পৈতৃক বাসভবন অনেকখানি জায়গা জুড়েই ছিল। তিনিও কিছু অংশ বৃদ্ধি করে বসবাস করেন। যে অংশে তিনি থাকতেন সেই অংশ এখন ভগ্নস্তূপ। যে ঘরে বসে তিনি বঙ্কিম, ভূদেব, অমৃতলাল প্রভৃতির সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করতেন সে ঘরের একদিকের ছাদ ধসে গেছে। বট অশ্বত্থগাছের শিকড়ে সারা দেওয়াল ক্ষত বিক্ষত হলেও দেওয়ালের পঙ্খের কাজ আজও নষ্ট হয়নি। দীনবন্ধুর পৈতৃক আমলের বৈঠকখানার অংশ সংস্কার করে তাঁর একজন বংশধর শ্রীহৃদয়নাথ মিত্র মহাশয় বসবাস করছেন। দীনবন্ধুর জন্ম যে প্রসূতিআগারে হয়েছিল সেই স্থানে সে ঘরখানি নিশ্চিহ্ন। সেখানে একটা বৃহৎ বাবালাগাছ তার স্মৃতি বুকে নিয়ে গর্বভরে দাঁড়িয়ে আছে।

মোগলকে আমরা ভুলতে পারি, ভুলতে পারি তার বিজয়বার্তা। কাশীনাথকে আমরা ভুলতে পারি, ভুলতে পারি তার বীরত্বখ্যাতি। ভুলতে পারি আমরা তার সমর সিংহ নাম। কিন্তু নীলকর কুঠিয়ালদের অত্যাচার আমরা ক্ষমার দৃষ্টিতে উপেক্ষা করতে পারি না, ভুলতেও পারিনা। আর সেই সঙ্গে ভুলতে পারি না সেই বিদ্রোহী স্বাধীনচিত্ত সরকারী বেতনভুক দীনবন্ধুকে। যিনি ছিলেন দীনের বন্ধু। দীন অবহেলিত অত্যাচারিত কৃষককুলের বেদনার কথা যিনি জানিয়েছিলেন বৃটিশ সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে দেশে দেশে। যাঁর অমর লেখনীস্পর্শে নীলদর্পণের পাতায় পাতায় আজও জগৎবাসীকে সেই পরাধীন বাংলার নির্যাতন ও অত্যাচারের কাহিনী উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছে। সেই তীর্থক্ষেত্রের সংস্কার ও সংরক্ষণের যে প্রয়োজন ছিল একথা স্বাধীনতা লাভের তিরিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও দেশবাসী বুঝতে পারেনি। এটাই আমাদের লজ্জার কথা। দীনবন্ধুর স্মৃতির ‹পর্ণ করতে বনগ্রামে ইছামতী তীরে গড়ে উঠেছে দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়। কিন্তু যেখানে তাঁর বাড়ি ঘর গাছপালা হাহাকার করছে মৃত্যুযন্ত্রণায়, যে আওয়াজ আজ শব্দব্রহ্ম ভেদ করে গিয়ে পৌছুচ্ছে অমরধামে সে স্থানের কথা আমরা ভেবে দেখবার অবসর পাইনি। দীনবন্ধু জন্ম শতবর্ষও অনেক দিন পার হয়ে গেছে। তবে কেন আমরা স্বাধীনতা যজ্ঞের প্রথম বহ্নিশিখা যিনি প্রজ্বলিত করেছিলেন তাঁর জন্মস্থানকে আজও যোগ্য মর্যাদা দিতে পারিনি !

আজ চৌবেড়িয়া গ্রামের সমাজ জীবনেও নূতনত্বের ছাপ লেগেছে। সেখানেও দীর্ঘদিনের পতিত অবহেলিত গ্রাম্য সমাজের মাঝেই দেখা দিল হৃত সর্বস্ব বাস্তুহারা মানুষ। জীবন যুদ্ধে প্রতিযোগিতা চলছে। টিকে থাকার কত আশা আকাঙ্খা তাঁদের। তাঁদেরও মনে জীবনজিজ্ঞাসায় ঐ একই সুর। কবে তাঁরা বলতে পারবেন প্রাণ ভরে "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।" রাজনীতি কুটিলতা তাঁরা বুঝতে চান না—তাঁরা চান বাঁচার মত বাঁচতে। যে মাটির আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মন্ত্র সেই মাটিতে দাঁড়িয়েই তাঁরা পথ খুঁজছেন মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার জন্য। তাঁদের জীবন জিজ্ঞাসার সূত্র হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আবিষ্কারের আশায় প্রতীক্ষা করছে।

'যশোহর খুলনার ইতিহাস' সতীশচন্দ্র মিত্র এবং গ্রাম্য মানুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত কাহিনী অবলম্বনে।

ভাণ্ডারকোলা

গোপালনগর থেকে উখড়া সড়কের ধারে প্রায় সাড়ে চার মাইলের মাথায় সড়কের বাম পাশে ভাণ্ডারকোলা গ্রাম। এই গ্রামখানি দৈর্ঘ্যে দেড় মাইল। এখন সড়কপথে যাতায়াতের সুবিধা হয়েছে। সড়কের উপর দিয়ে গ্রামের বুক কাঁপিয়ে অটো, রিকশা যাত্রী বহন করেছে। লরী, ভ্যান রিক্সা, গো, মহিষ ও ঘোড়ার গাড়ী মাল বহন করছে। এই সড়ক কিছুকাল পূর্বেও ছিল দুর্গম। তারই আগে সড়কপথে যাতায়াতের কথা ভাবাও যেত না। তখন নদী পথেই ছিল একমাত্র পরিবহনের ব্যবস্থা।

আজ আর সে নদী নেই। এখন তার সোঁতায় হয়েছে পুকুর। সে নদীর নামও আজ কেউ বলতে পারেন না। স্থানীয় যাঁরা আছেন তাঁরা কেউই সাবেক কালের বাসিন্দা নন। নদীর সোঁতায় প্রবাহের চিহ্ন বর্তমান। গঙ্গা নদীর একটি শাখা চাকদাহ পালপাড়ার মধ্য দিয়ে মরালী নদী নাম নিয়ে শ্রীনগর, হিংনাড়ার ভিতর দিয়ে অধুনা চব্বিশ পরগণায় প্রবেশ করেছে; এর কিছু অংশের নাম বৈরামপুরে পদ্মবিল। বৈরামপুর হয়ে দীঘাড়ির মধ্য দিয়ে মরালী নদীর একটি শাখা ভাণ্ডারকোলার মধ্য দিয়ে চাঁদপাড়ার কাছে সোয়ানা, ছেকাঠির মধ্য দিয়ে ইছামতীতে মিশেছে। মরালীর এই শাখানদীটি এখন কোথাও খাল, কোথাও বিল আবার কোথাও বা পুকুর হয়ে রূপ পরিবর্তন করে নদী নামের গৌরব হারিয়েছে। আজ তার তীরের গ্রামগুলিই আছে। একদিন যেগুলি মনুষ্য পরিত্যক্ত জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। অনোন্যপায় মুষ্টিমেয় কৃষককুল এবং দু'এক ঘর মধ্যবিত্ত অধিবাসী নিয়ে যে গ্রামগুলি ভবিষ্যতে সুদিনের অপেক্ষায় টিকে ছিল সেই গ্রামগুলির মধ্যে ভাণ্ডারকোলা অন্যতম।

ভাণ্ডারকোলা গ্রামের উৎপত্তির কাহিনী যা শোনা যায় তাতে অনুমান করা যেতে পারে যে শ্রীনগরে ভাবানন্দ মজুমদার রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার

সময় থেকে এই গ্রামের উৎপত্তি। এই গ্রামখানি শ্রীনগর রাজার পরবর্তী-কালে কৃষ্ণনগর রাজার খাদ্যভাণ্ডার পূর্ণ করত বলেই এর নামকরণ করা হয়েছিল ভাণ্ডারকোলা। এখনও সে নামের সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়। এ গ্রামের লক্ষ্মীবিলে যথার্থই 'লক্ষ্মী বিরাজিত। এমন উর্বর ভূ-ভাগ এ মহকুমায় কদাচ দৃষ্ট হয়। অফুরন্ত শস্য ঢেলে দেন মালক্ষ্মী এই বিলের মাঠে আজও।

শ্রীনগরের রাজা পরবর্তীকালে কৃষ্ণনগরে রাজধানী স্থাপন করে পত্র-মিত্রসহ সেখানে চলে যান। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর স্নেহভাজন বনমালী মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণকে কয়েকটি তৌজি বন্দোবস্ত দেন। বনমালী মুখোপাধ্যায় ভাণ্ডারকোলায় তাঁর আবাসস্থল নির্মাণ করেন। তাঁর পুত্র দীনদয়াল মুখোপাধ্যায় প্রবল পরাক্রমশালী জমিদার হয়ে ওঠেন। তাঁর নাম আজও গ্রামবাসীদের মুখে মুখে। তাঁব প্রভাব প্রতিপত্তিব কথা তাঁর রাজোচিত মর্যাদার কথা আজও যেমন সকলে বলেন তেমন তাঁর দুঃখ বেদনাময় শেষ পরিণতির কথাও তাঁরা বলতে দুঃখ প্রকাশ করেন। আজ সেই জমিদার দীনদয়ালের প্রাসাদ সদৃশ অট্টালিকাব অস্তিত্ব লুপ্ত হলেও ভিত্তি বর্তমান আছে। ইঁট কাঠ বিক্রীত ও স্থানান্তরিত। কেবল তাঁর হাতে পোঁতা কয়েকটি নারিকেল গাছ আব তাঁব খিড়কির পুকুর কালের সাক্ষী হয়ে বর্তমান আছে। এখনও পুকুরের বাঁধানো ঘাট বর্তমান। সেই ঘাটে একদিন তিনি ছাড়া আর কারও স্নান করার অধিকার ছিল না।

লাটের খাজনার দায়ে দীনদয়ালের জমিদারী হস্তান্তরিত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে সেই জমিদারীর মালিক হন বি. সরকার। জমিদারী 'গেল দীনদয়ালও দীন হয়ে পড়লেন। আত্মসম্ভ্রম হারানোর ভয়ে একদিন রাত্রে দেশত্যাগ করেন। শেষ পর্যন্ত মদনপুরের নিকট কুলেরপাট গ্রামে এক কালী মন্দিরের পুরোহিতবৃত্তি নিয়ে জীবনের শেষ দুঃখময় জীবনের কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন।

এই মুখোপাধ্যায় পরিবারের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন চট্টোপাধ্যায় পরিবার। মুখোপাধ্যায় পরিবারের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অপারগ হয়ে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও হতমান হওয়ার পর চট্টোপাধ্যায় পরিবারের জানকীনাথ চট্টোপাধ্যায় গ্রাম ত্যাগ করে মাতুলালয় বৈরামপুরে চলে যান। তাঁর পুত্রই বৈরামপুর নিবাসী শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

এর পর ভট্টাচার্য্য পরিবার। দু'শ বছর পূর্বে ভাণ্ডারকোলায় কোন পাকা বাড়ী ছিল না। প্রথম পাকা বাড়ী এই গ্রামে ভট্টাচার্য্যদের।

এদের মধ্যে কালিদাস ভট্টাচার্য্য, বিজন ভট্টাচার্য্য এবং বিনয় ভট্টাচার্য্যের নাম উল্লেখযোগ্য। ভট্টাচার্য্য বংশের প্রথম চাকুরিজীবী (রেলে) উপেন ভট্টাচার্য্য। দীঘাড়ীর ঘটক (কায়স্থ) দের গুরুবংশ। ঘটকরা এলাহাবাদ প্রবাসী ; উচ্চশিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁদের আনুকুল্যে গুরুবংশের যাঁরা আছেন তাঁরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। কেউ কলিকাতা, কেউ কল্যাণী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে বসবাস করছেন। মাঝে মাঝে গ্রামে বেড়াতেও আসেন।

আর এক ব্রাহ্মণ পরিবারের অস্তিত্ব এখনও গ্রামে আছে তা ঘোষাল পরিবার। এঁরাও গ্রাম উৎপত্তির সময় থেকে এই গ্রামে বসবাস করছেন। এই পরিবারের রাসবিহারী ঘোষাল ও বিপিন ঘোষালের নাম শোনা যায়। রাসবিহারী ঘোষাল এক সময় "জুরার" ছিলেন।

এর পরেই এক বৈদ্য পরিবারের নাম উল্লেখ করা যায়। কালনা থেকে এঁরা এই গ্রামে আসেন। তাঁদের উপাধি হ'ল 'রাজ'। এই রাজ পরিবার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে আট দশ ঘরে পরিণত হয়। বর্তমান বৈদ্যদের মধ্যে শ্রীরাখালদাস সেন গ্রামে বসবাস করছেন। এই বৈদ্য পরিবার এক সময় এমন সঙ্গতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁদের একাধিক হাতীও ছিল সে সময়। রাখাল সেনের এক পূর্বপুরুষ একটি বৃহৎ পুকুর কাটা আরম্ভ করেন। পুকুর কাটা শেষ হওয়ার পূর্বে তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হন। স্বয়ং মহাদেব তাঁকে পুকুর সম্পূর্ণ করতে ও প্রতিষ্ঠা করতে নিষেধ করেন। সেই অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই পুকুর কাটার কাজ শেষ হলেও বর্তমানে এই পুকুরটিই এই গ্রামের বৃহত্তম জলাশয়। নূতন পুকুর নামে এই পুকুরের পরিচিতি। এই পুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম তীরের অনতিদূরে একটি অতি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। এখনও সেই ধ্বংসস্তুপ সেই অবস্থাতেই আছে। তারই অনতিদূরে একটি নাতিদীর্ঘ প্রস্তরখণ্ড লতা জঙ্গলের ঝোপের মধ্যে বর্তমান আছে। গ্রামের লোকে এটিকে 'বাবাঠাকুরের থান' বলে থাকেন। শিবরাত্রি ও চৈত্র সংক্রান্তিতে গ্রামের লোকেরা এখানে পূজা দেন। পৌষ মাসে গ্রামের মেয়েরা এখানে "পালুনি" উৎসব করে থাকেন। সেন পরিবারই এই স্তুপের বর্তমান মালিক হলেও এই মন্দির যে কতকাল পূর্বে নির্মাণ হয়েছিল এবং কে এই মন্দির নির্মাণ করেন তার কোন হদিস মেলে না। এই ধ্বংসস্তূপের অনতিদূরে একটি অতি প্রাচীন বিল্ব বৃক্ষ আজও ফলভারে নত।

ভট্টাচার্য্য বংশের বনমালী ভট্টাচার্য্যের কোন পুত্রসন্তান ছিল না।

একমাত্র কন্যা তাঁর পুত্র ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায় একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। গৃহের বহিঃপ্রাঙ্গণে এই লিঙ্গমূর্তি আজও বর্তমান। অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে আছে। শিবরাত্রি, চৈত্র সংক্রান্তি ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ দিনে শিবের মাথায় ফুল, জল ও বিল্বপত্র গ্রামবাসীরা দিয়ে থাকেন। দেড়শত বৎসর পূর্বে আনুমানিক ইং ১৮২৩ সালে এই লিঙ্গ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বনমালী ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাশিমবাজার মহারাজার অধীনে একজন গাঁতিদার ছিলেন।

দীনদয়াল মুখোপাধ্যায়এর বাড়ির পূর্বদিকে ছিল শচীন মুখোপাধ্যায়এর বাড়ি। ১৯১৬-১৭ সালে সেই বাড়ির ধ্বংসস্তূপ খরিদ করেন নহাটা শেরপুর নিবাসী কোন এক ব্যক্তি। ইঁট অপসারণকালে ভাগ্যদেবী তাঁকে কয়েক ভাঁড় মুদ্রা ও স্বর্ণালঙ্কার উপহার দেন শোনা যায়।

রাখাল মুখোপাধ্যায়এর পুত্রেরা নদীর সোঁতায় একটি পুকুর কাটান। সেই সময় নৌকার কাঠ একটি বল্লমের ফলা ও কয়েকটি মড়ার মাথার খুলি কোদালে ওঠে। ভাণ্ডারকোলায় পঞ্চাশটিরও অধিক পুকুর আছে। উখড়া পথের পাশে মানিকতলার পুকুর নামে যে পুকুর পরিচিত সেটি বাল্‌কা ডোম খনন করান। ভাণ্ডারকোলায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ঘর ডোমের বাস ছিল। তাঁরা সকলেই কৃষিজীবী। বাল্‌কা ডোম বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন।

ভাণ্ডারকোলায় নবশাখ হিন্দু ছাড়াও কয়েকঘর মুসলমান বাস করতেন। পরবর্তীকালে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশঃ কমতে কমতে নগণ্য সীমায় এসে পেঁছায় বঙ্গভঙ্গের পূর্বে। কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ, পরিবহন ব্যবস্থার ও যাতায়াতের অত্যন্ত অসুবিধা দেখা দিল। নদীর মৃত্যুতে গ্রামটি শ্রীহীন ও উজাড় হয়ে পড়ে। অনন্যোপায় যে কয়েক ঘর টিকে ছিলেন তাঁদেরই আজ প্রাচীন অধিবাসী বলে চিহ্নিত করা যায়। বঙ্গভঙ্গের পর একদিকে হিন্দু জনবসতি যেমন বেড়েছে অপরদিকে তেমন মুসলমান জনবসতি কমেছে। বিনিময়, বিক্রয় ইত্যাদির দ্বারা তারা স্বস্থান ত্যাগ করে পূর্বপাকিস্থান অধুনা বাংলাদেশে পাড়ি জমাতে থাকেন।

ভাণ্ডারকোলায় এখন নূতন ভাবে গড়ে উঠেছে নূতন সমাজ ব্যবস্থা। গ্রামে যাঁরা বসবাস করছেন তাঁদের প্রায় সকলেরই কিছু কিছু চাষবাস আছে। পূর্বের সেই বড় বড় আম কাঁঠালের বাগান আর দেখা যাবে না। সেখানেই এখন দেখা যাবে গৃহস্থের গৃহ, কোথাও বা গমের ক্ষেত আবার কোথাও বা বেগুন পটল ইত্যাদি সবজি ক্ষেত।

এখন গ্রামে বর্ণ বৈষম্য গৌণ হয়ে পড়েছে। তার স্থলে দেখা দিয়েছে

উগ্র রাজনীতির কড়াপাকে বাঁধা নীতি আদর্শের গগনচুম্বী প্রচার। দরিদ্র ক্ষেতমজুর ও ভূমিহীন যাঁরা গ্রামে আছেন তাঁদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। তাঁদের দুঃখ দুর্দশা এখন তুঙ্গে। তাঁদের মর্মভেদী করুণ আবেদন শোনার এখন কেউ নেই। যে ভাণ্ডারকোলায় অফুরন্ত ধান ওঠে গৃহস্থের গৃহে ; সেই ভাণ্ডারকোলার অনেক গৃহস্থকেই যব, ভুট্টা ইত্যাদি সংগ্রহ করে অর্দ্ধাহারে দিনাতিপাত করতে হয়। নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে থাকেন এই হতভাগ্যেরা তখন তাঁরা যে বাবুকে রাজা করার সুযোগ পাবেন সেই বাবুদের কাছে তখন নিজেদের দুঃখের কথা জানিয়ে বেদনা লাঘব করেন। বিনিময়ে মেলে কিছু মূল্যবান বাণী যা তাঁদের পরিপাক করতেও কষ্ট হয়।

মাঠে একদিকে যেমন বৈদ্যুতিক সেচ ব্যবস্থা হয়েছে অপরদিকে তেমন অভাব, বীজের সারের ও অর্থের। সময়মত কিছু মেলে না। বেশী দাম দিলে সবই মেলে যথেষ্ট ; সে সঙ্গতি আর কজনের আছে? সুতরাং গ্রামবাসীদের সমস্যা নিত্য নৈমিত্তিক সমস্যা। সামগ্রিক ভাবে গ্রাম্য জীবনে সুখ শান্তির হদিশ মেলা ভার। বাঁচার জন্য লড়াই করে চলেছেন বৃহত্তম অংশ আর মুষ্টিমেয় দু'একজন সম্পন্ন হলেও দস্যু তস্করের ভয়ে সদাই শঙ্কিত। রাত্রে পথ চলা বা অসতর্ক হয়ে নিদ্রা যাওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না। এ যেন সময় মত বসন্তের টিকা না নেওয়ার চাপে পানিবসন্তে মৃত্যুর মত। সময়মত চাষ আর বীজ ছড়িয়ে মাঠে কৃষক ঘোরে শহরে সার আর তেলের সন্ধানে। তাই মনে হয় বলি : হায়রে লাঞ্ছিত দেশ-প্রেমিকের দল, তোমাদের লাঞ্ছনার ভাতা সরকার দেয় অথচ এই অসহায়দের লাঞ্ছনার ভাতাটা কি এই?

৭

রসুলপুর

ভাণ্ডারকোলা থেকে উখড়া সড়ক ধরে এক মাইল গেলেই ডান দিকে রসুলপুর গ্রাম পড়বে। কোন্ রসুল কবে এবং এই গ্রামের কোন্ স্থানে অবস্থান করতেন তা আজ হারিয়ে গেছে। কিন্তু আছে মসজিদ, আছে দরগা, আছে মজারখোলা আর ঘর তিনেক ক্ষেত-মজুর মুসলমান তারাও নবাগত এই গ্রামে। গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাচীন মুসলমান অধিবাসী বংগ ভংগের সাথে সাথে সম্পত্তি বিনিময় অথবা বিক্রী করে দেশ ত্যাগ করেছেন। ফেলে রেখে গেছেন তাঁদের বসবাসের স্মৃতিচিহ্ন। যা বেদনা দেয় কিন্তু মৌনতা ভঙ্গ করে না। তাই তার ইতিহাসেরও খোঁজ মেলে না। যে মুসলমান জনসমষ্টি এই গ্রামে বাস করতেন তাঁরা সকলেই পাঠান, তাদের উপাধি ছিল খাঁন চৌধুরী। তাঁরা অনেকেই সঙ্গতি সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন।

বর্তমানে প্রাচীন অধিবাসী যাঁরা গ্রামে আছেন তাঁদের মধ্যে পঞ্চানন বক্সী অন্যতম। এই বক্সীরাই গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা বলে দাবি করেন বৃদ্ধ পঞ্চানন বক্সী মহাশয়। রামপুর থেকে রসুলপুরে কবে রূপান্তরিত হয়েছিল তা তিনি বলতে পারেন না। মুসলমান জনসমষ্টির প্রভাব পরবর্তী কালে প্রবল হওয়ায় গ্রামের নামের পরিবর্তন হয়ে যায়।

বক্সী পরিবারের পূর্ব উপাধি ছিল "দে"। কৃষ্ণনগরের রাজার প্রদত্ত উপাধি বক্সী। রাজার অনুগ্রহে বক্সীরা বিরাট ভূ-ভাগের মালিক হয়ে এই গ্রামে আসেন। তাঁদের প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ তাঁদের অতীতের সমৃদ্ধির ও প্রতিষ্ঠার নিদর্শন বহন করছে। বিশাল পূজামণ্ডপ

ধ্বংস হয়ে গেলেও তার স্থাপত্যশিল্পসমৃদ্ধ থামগুলি আজও অটুটভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ভগ্ন অট্টালিকার কিছু অংশের ইঁট কাঠ দিয়ে পঞ্চানন বক্সী মহাশয় সেই গৃহের পাশেই ইং ১৯২৩-২৪ সালে বসবাসের জন্য অট্টালিকা নির্মাণ করেছেন।

পঞ্চানন বক্সীর বাড়ির বহিঃতোরণের পাশে শিব মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ। অক্ষয়কুমার বক্সীর আমলে ঐ শিব মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। নিত্য পূজা হ'ত। বাংলা ১৩৪৯ সালে দক্ষিণদ্বারী মন্দিরের দরজা খোলা ছিল। সেই সময় একটি ষাঁড় মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করে এবং শিং দিয়ে গুতিয়ে শিবলিঙ্গের ক্ষতিসাধন করে। সে কারণে লিঙ্গ মূর্তিটি চাকদহের গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। যিনি দিয়ে আসেন তিনি বাড়ি পৌঁছবার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করেন।

এই বক্সী পরিবারের অনেকেই এখন প্রবাসে। বর্তমানে অমৃত বাজার পত্রিকার অন্যতম "সাব-এডিটর" সুললিতকান্ত বক্সী এই বংশের তড়িৎকান্ত বক্সীর পুত্র। তাঁদের গৃহ আজ ভগ্নস্তূপ। গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে গেছে।

রসুলপুর কৃষিপ্রধান। এখন বহু হিন্দু বংগ ভংগের পর এই গ্রামে এসে বসবাস করছেন। পূর্বে নবশাকের গ্রাম ছিল। ব্রাহ্মণ দু'চার ঘর ছিলেন। জাতীয় বৃত্তিই তাঁদের সম্বল ছিল। বর্তমানে দু'চার জন তাঁদের বংশধর আছেন তাঁরা কায়ক্লেশে দিন কাটাচ্ছেন।

যাঁরা বিত্তবান তাঁরা দস্যু ও ডাকাতের ভয়ে সদাই শঙ্কিত আর যাঁরা দরিদ্র তাঁদের দারিদ্র্য এত নিম্ন পর্যায়ে যার বর্ণনা করা সম্ভব নয়। পূর্বে গ্রামের সমাজ ব্যবস্থা এমন ছিল যে, যারা দরিদ্র তাদের কখনও উপবাস করতে হ'ত না। কিন্তু এখন কেউ কাউকে দেখার প্রবৃত্তি হারিয়েছেন। সমাজ বন্ধন নেই। সেই কারণে দরিদ্রের কোন ভরসা নেই, অসহায়তায় ও জীবন যন্ত্রণায় সদাই আকুল।

গরীবপুর

বনগ্রাম জংশন থেকে রাণাঘাট জংশন দু'টো জেলার দুই মহকুমার দুই ষ্টেশনকে যে রেলপথ যোগ করেছে, সেই রেল পথের মাঝামাঝিই মাঝের-গ্রাম ষ্টেশন। বনগ্রাম থেকে দশ মাইল। ষ্টেশনের এক তৃতীয়াংশ ২৪ পরগণা জেলায় বাকী অংশ নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত।

ষ্টেশন থেকে বের হয়ে সামনেই দুটো পথ। একটা সোজা চলে গেছে মাঝের-গ্রাম আর একটি ডান দিকে রেল লাইনকে সমান্তরালে রেখে পূর্ব দিকে কিছুদূর গিয়েই বাঁদিকে মোড় নিয়ে চলে গেছে গরীবপুর গ্রামে। বর্তমানে বনগ্রাম মহকুমার পশ্চিম সীমান্তে নদীয়া জেলার সীমানা ছুঁয়ে আছে এ গ্রাম। এককালে বনগ্রাম মহকুমার সাথে নদীয়া জেলারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ গ্রাম কেবলমাত্র বর্ধিষ্ণু গণ্ডগ্রাম ছিল এককালে একথা বললেই যথেষ্ট বলা হবে না। এটি যে একজন মহাযোগী তান্ত্রিক সাধকের সাধনক্ষেত্র ছিল এবং বর্তমানে একটি পীঠস্থানরূপে আপন মহিমায় মহিমান্বিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই গ্রামের নাম বর্তমানে গরীবপুর হলেও পূর্বে এর নাম ছিল গৌরীপুর। গঙ্গানদীর একটি শাখা ইছামতী নদীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করত। এই নদীর পশ্চিম তীরে কয়েকটি গ্রাম ছিল পাশাপাশি গৌরীশায়ী; গৌরীপুর, ব্যাসপুর এবং কামদেবপুর। গৌরীশায়ী এখন ষ্টেশনের সন্নিকট, গৌরীপুর। এখন গরীবপুর, ব্যাসপুর এখন নাম নিয়েছে বেসপুর আর কামদেবপুর পূর্ব নামেই বহাল আছে রেল লাইনের দক্ষিণ পাশে। সে নদী এখন মরে গেছে ফেলে রেখে গেছে তার চিহ্ন সোঁতা আর চামটার বিল বা বাঁওড়।

আর একটি নদী গরালী, গরীবপুরের উত্তর দিক দিয়ে বয়ে যেত। এটি চূর্ণী আর ইছামতীর সংযোগ রক্ষা করত। এর তীরে চাতরাবাগী, গোয়ালবাগী প্রভৃতি গ্রাম। এখন গরালীও বাঁওড়ের রূপ নিয়েছে।

মর্যাদা হারিয়েছে। এই নদী দুইটি এক সময় কাটানোর চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ইছামতী ও চুর্ণী বর্তমানে একই সমতলে অবস্থিত বলে কাটালেও তার প্রবাহ থাকবেনা আবার শুকিয়ে যাবে একারণেই নাকি সে চেষ্ট পরিত্যক্ত হয়েছে।

এক সময় এই নদী দুইটি নাব্য ছিল। তখন দিশি দিশি হতে কত যাত্রী কত পণ্যসম্ভারপূর্ণ তরণী তাদের প্রবাহধারায় বয়ে যেত তার প্রমাণ এখনও মেলে। পুকুর ও ইঁদারা কাটাতে গিয়ে একাধিক জায়গায় পুরাতন নৌকার মাথা ও বিভিন্ন অংশের কাঠ পাওয়া গেছে। নদী দুইটির সোঁতা এখনও বর্তমান। পূর্ব পাশের সোঁতাটি যার কিছু অংশকে চামটার বিল বলে তার তীরেই একটি অতি প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ ছিল, যে স্থানকে বলা হত মোকামতলা ঘাট। এই অশ্বত্থ গাছটি মানুষের প্রয়োজন মেটাতে তিল তিল করে ছায়া হারিয়েছে। কায়াটিও হারিয়েছে আজ তিন বছর গত হল। এখন তার পদচিহ্ন বর্তমান। চামটার তীরে আরও একটি বট-অশ্বত্থের যুগল ছায়াতরু ছিল। যার নাম ছিল ববকনে তলা। এর সম্বন্ধে অনেক কাহিনী শোনা যায়, কেউ বলেন, এর নিচেয় ঘাট ছিল। সেই ঘাটে নতুন বরকনে এসে নামার পূর্বে নৌকাডুবি হযে মারা যায়। সেই থেকেই ঐ যুগল তরুর নাম বরকনেতলা। আবার কেউ বলেন অশ্বত্থ বট দুই বৃক্ষ রোপন করে তাদের বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পাদন করা হয় বলেই ঐ বৃক্ষের নাম হয় বরকনেতলা। সহস্র বৎসর অহিংসার বাণী শোনার পরেও মানুষ তার সহজাত হিংসা প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটাতে ছাডেনি। চাবশ' বছরের এই প্রাচীন স্থবির বৃক্ষ যুগলকে অস্ত্রাঘাত করে সংহার করেছে। এই বৃক্ষমূলেই একদিন কুমার মুখোপাধ্যায় সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন তাঁর তন্ত্র সাধনায়। এই বৃক্ষমূলেই একদিন কত যাত্রী বোঝাই নৌকা এসে ভিড়ত, কত পণ্যবাহী নৌকা আসত তার ভার লাঘব করতে, আবার কত নৌকা যাত্রা করত পণ্যভারে গর্বিত হয়ে মন্থর গতিতে এরই পাদদেশ থেকে। আজ তার স্মৃতি লুপ্ত হয়ে গেছে। ধ্যানমগ্ন যোগী স্বামী ব্রহ্মানন্দ সিদ্ধিলাভ করেন যার নির্জন স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে, আজ সেই বৃক্ষের স্মৃতিচারণ কারও কারও মুখে শোনা গেলেও হয়ত একদিন তাও আর শোনা যাবে না।

চামটা নদীর সোঁতায় আর একটি বিল আছে তার নাম গণ্ডভ্রার বিল। এই সোঁতায় একটি স্থান আছে যাকে বলে হারাণের জোল। এখন সেখানে চাষ হয়। অরুণ মুখোপাধ্যায় বলেন তিন বছর আগে ১৯৭০ সালে সেখানে জোলের ধারে কোপাতে গিয়ে ইটের বাঁধান ঘাটের

মত ধাপে ধাপে নেমে গেছে এ রকম দেখা যায়। প্রচুর পাতলা ছোট ইট পাওয়া যায় সেখানে।

গয়ালী নদীর পোঁতার তীরে এখনও একটি বিরাট স্তূপ আছে। সেখানে এখনও প্রচুর পরিমাণে খাবরা আছে। অনেকে সেই পোঁতায় চাষ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। সে পোঁতার অনতিদূরে বেষ্টন করে এখন কয়েক ঘর দুস্থ কৃষক দুলে জাতীয় লোকের বাস। তাঁরা বলেন ওখানে দুলে রাজার রাজ বাড়ি ছিল। খাবরা আর কাদা দিয়ে শক্ত করে গাঁথা দুলে রাজার প্রাসাদ ছিল গড় পরিবেষ্টিত। এই ঢিবির চার পাশে গড়ের চিহ্ন বর্তমান। এই ঢিবির পাশে একটি মন্দিরও ছিল যার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় সম্ভবত সেটি মাটির নিচেয় বসে গিয়েছে। এই স্তূপটিকে এতদ্‌ অঞ্চলের লোক সান্‌পোতা বলে থাকেন। আরও একটি খাবরা স্তূপ আছে তাকে বলে নন্দীপোতা। শোনা যায় দুলে রাজার আমলে কোন ধনাঢ্য তিলি বণিকের আবাস ছিল ঐ স্থানে।

গৌরীপুরের অতীত ঐতিহ্য হারিয়ে গেল মহাকালের রথ-চক্রতলে। যাঁরা টিকে থাকলেন তাঁরা দুস্থ দরিদ্র দুলে সম্প্রদায়, সেই দুলে রাজার প্রজারা। কালক্রমে পড়ে থাকল অনাবাদী জমি। প্রকৃতি সাজলো নানা-ভাবে, জঙ্গলে ঢেকে থাকল বিস্তৃত অঞ্চল। দেশের প্রাণধারা যে দুটি নদী বহন করত তাদের অপমৃত্যুই গৌরীপুরের অপমৃত্যু ঘটাল। দীর্ঘদিন পড়ে থাকায় রাজ্যের রাজস্ব বিভাগে গরীব অঞ্চল বলে চিহ্নিত হল। সম্ভবতঃ গৌরীপুর এই ভাবেই গরীবপুরে রূপান্তরিত হয়ে থাকবে।

কত আবর্তন বিবর্তন ঘটল। চামটা ও গয়ালী নদীর বিল' বাঁওড়ে রূপান্তর ঘটল। অতঃপর এই অঞ্চল কৃষ্ণনগরের রাজার রাজত্ব সীমার মধ্যে পড়ল। বঙ্গাব্দ ১১৭৬ সাল, তখন বাংলায় চলেছে দ্বৈত শাসন আর মন্বন্তর। সেই সময় কৃষ্ণনগরের মহারাজা তাঁর দুই কর্মচারীকে এই অঞ্চলে পাঠান এই অঞ্চলকে পুনরায় আয় উপযোগী করার জন্য। তাঁদের একজন তাঁর সভাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ দর্পনারায়ণ হালদার, অপরজন দর্পনারায়ণ দাশ যাঁর রাজদত্ত উপাধি বিশ্বাস। দর্পনারায়ণ বিশ্বাস পূর্ব হাওড়া জেলার শাকরাইলের অধিবাসী ছিলেন। তিনি কায়স্থ কুলোদ্ভব। রাজার দেওয়ান ছিলেন।

দর্পনারায়ণদ্বয় রাজার কাছ থেকে প্রচুর জমি জমা পান দান হিসাবে। দর্পনারায়ণ বিশ্বাসের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ঊনত্রিশ তৌজি যার পরিমাণ দু'হাজার বিঘা। দর্পনারায়ণ বিশ্বাসের বংশধর বর্তমান আছে এখন নন্দলাল

বিশ্বাস—এখন ১৯৭৪ সাল, বয়স ছিয়াশিবই। রাণাঘাটে তাঁর নিজ বাড়িতে বাস করেন। এক সময় তিনি বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পরে গৌহাটি ও কলিকাতা পুলিশ কোর্টে ওকালতি করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। এই বিশ্বাস পরিবার গ্রামের কল্যাণে ও গ্রামবাসীর প্রয়োজনে অনেক অনেক জমি দান করেন। গ্রামে এখনও তাঁদের মাটির বাড়ি আছে। তার পুত্র গোপাল বিশ্বাস প্রায়ই গ্রামের বাড়িতে আসেন। গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এখনও অব্যাহত আছে। নিমাই বিশ্বাস ঐ বাড়িতে বাস করেন।

গরীবপুর গ্রামের কীর্তিচিহ্ন আজ যা দেখো যায় তার প্রায় সবটুকুই গ্রামের মুখোপাধ্যায় পরিবারের। সেই নিদর্শনগুলির পরিচয় দেওয়ার পূর্বে তাঁদের কিছু পরিচয় না দিলে গ্রামের কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

দর্পনারায়ণ হালদার কৃষ্ণনগরের রাজার দানে জমিজমার মালিক হয়ে এই গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁরা দুই ভাই দর্পনারায়ণ আর রামকিশোর। তাঁদের এক অনূঢ়া ভগ্নি ছিলেন। দর্পনারায়ণ নিঃসন্তান এবং রামকিশোরের একটি মাত্র কন্যা ছিল। দর্পনারায়ণ হালদার ছুরিস্তির ব্রাহ্মণ সুতরাং নৈকস্য কুলিন পাত্রে তাঁর ভগ্নি ও ভ্রাতুস্পুত্রীকে সম্প্রদান করেন। সে জন্য রাজ্য খণ্ড ও দ্বিখণ্ডিত করে উভয় কুলিন সন্তানকে দান করেন অথবা তাঁরা পত্নির ওয়ারিশ সূত্রে সম্পত্তির মালিক হয়ে এই গ্রামে বসবাস করতে আসেন।

ভগ্নির বিবাহ হয় ফুলিয়া নিবাসী কবি কীর্তিবাসের বংশধরের সঙ্গে। আর ভ্রাতুস্পুত্রীর বিবাহ হয় উলা বর্তমান বীরনগর নিবাসী কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায় এর সহিত। উভয়েই ফুলিয়ামেল বন্ধনিভুক্ত কুলিন ব্রাহ্মণ।

গরীবপুর গ্রামের প্রাণপুরুষ ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায় যে তদানিন্তন গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান করেছিলেন সে বিষয়ে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর অবদানের চিহ্ন গ্রামে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। যদুনাথ ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ ছিলেন। তদানিন্তন বৃটিশ সরকারের গভরনরের গৃহ-চিকিৎসকও ছিলেন যদুনাথ। তাঁর আবিষ্কৃত "জ্বরাঙ্কুশ" ঔষধ তখনকার ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত বনগ্রাম তথা বাংলায় একমাত্র ঔষধ ছিল একথা বললেও অত্যুক্তি হয় না। যদুনাথই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান লেখেন। তাছাড়া জ্বরচিকিৎসা, ধাত্রী শিক্ষা গ্রন্থও বাংলায় লেখা। গরীবপুরে একটি হাসপাতালও নির্মাণ করেন তিনি। সেই গৃহে বর্তমানে তাঁর প্রপৌত্র অমরনাথ বাস করছেন। গরীবপুরের রাস্তা, জলাশয় নির্মাণ

এবং খৃঃ ১৮৯৩ অব্দে ডাকঘর ও প্রাথমিক বিদ্যালয় তার দ্বারাই স্থাপিত হয়। ১৩০০ বঙ্গাব্দে তিনি অমরধাম গমন করেন।

ডাঃ যদুনাথের চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ কুমারনাথ কৈশোরেই গৃহ থেকে সহসা উধাও হন। তিনি তিব্বত চলে যান। সেখান থেকে তিব্বতী তন্ত্র সাধনায় দীক্ষা নিয়ে বাড়ী ফেরেন কয়েক বছর পরে। যদুনাথ জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিয়ে সংসারী করাতে চেষ্টা করেন। একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান হয়। অতঃপর পুনরায় তিনি যোগ সাধনায় রত হন। বরকনে তলায় নির্জন প্রান্তরে দীর্ঘকাল ধ্যানমগ্ন থেকে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। পরবর্তী কালে তাঁর নাম হয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তাঁরই অলৌকিক ক্ষমতার কথা এখনও লোকের মুখে মুখে। তিনি রেল ইঞ্জিন টেনে ধরে ছিলেন। বৃটিশ ইঞ্জিন চালক বহু চেষ্টা করেও ইঞ্জিনে গতি সঞ্চার করতে পারেনি। এ রকম তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা ছিল তার পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর জীবন কথাও প্রকাশিত হয়েছিল।

মহাযোগী তান্ত্রিক সাধক প্রতিষ্ঠিত মন্দির আজও ব্রহ্মানন্দ আনন্দমঠ নামে বর্তমান। তার পাশেই তাঁর সমাধি মন্দির। সমাধির উপর তাঁর আবক্ষ মূর্তি আছে। তাঁর সমাধির পাশে তার স্ত্রী পুত্রের সমাধি বিদ্যমান। সমাধি মন্দিরের পাশেই তিনি যেখানে বসে সাধনা করতেন সেই সাধন মন্দির। সাধন মন্দিরের কারুকার্যে চৈনিক প্রভাব দৃষ্ট হয়। একাধিক ড্রাগনের মূর্তি খোদিত আছে। আবার মন্দিরের সম্মুখ দ্বারে সিংহমূর্তি। থামের কারুকার্য সুন্দর। তবে দীর্ঘকাল সংস্কার না করায় চুণ বালির প্লাষ্টার খসে পড়ছে। জানালায় পাকাটির ঝাঁপ উঠেছে। বট-অশ্বত্থের চারাও কয়েকটি সমাধি মন্দির গাত্রে আছে।

সমাধি মন্দিরের পাশেই মাতৃমন্দির। মাতৃমন্দিরের ছাদে অপর দুইটির মত চূড়া নেই, সমতল। তিন দিকে কোলাপ্‌সিবিল গেট লাগান। দর্শনার্থীরা সকলে সকল সময়ই মাতৃদর্শন করতে পারেন। শ্যামা পূজায় ধুমধাম হয়। ছাগবলি দেওয়া হয়। মূর্তির বিশেষত্ব আছে। জননী সহসা ছুটে এসে শিব বক্ষে যেন বসে পড়েছেন হাঁটুগেড়ে। মূর্তির রঙ্‌ শ্যামা। মায়ের চৌকি আসনের নিচেয় মরার মাথা পঞ্চাধিক। মায়ের মূর্তির পশ্চাতে বায়ু কোণে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ মূর্তি। প্রতি অমাবস্যায় পূজা হয়। শিমুলিয়া নিবাসী কালীপদ চক্রবর্তী পূজা করতে আসেন। ব্রহ্মানন্দের কল্পনা অনুসারে নির্মাণ করান হয় এই দারুময় মূর্তি। মন্দিরের পশ্চাদভাগে একটি সুবিশাল বিল্ববৃক্ষ। তার পাদদেশে দুটি শিবের লিঙ্গ মূর্তি কতকগুলি প্রস্তর

খণ্ড। প্রায় দেড় ফুট ব্যাসের একটি লতা উঠেছে বিল্ববৃক্ষে তার গায়ে অনেক ইটের ভারা বাঁধা। মায়ের সন্তানরা তাদের কামনা জানিয়ে মাকে লোষ্ট্রভারে ভারাক্রান্ত করে রেখেছেন। কামনা পূরণ হলে মাকে ভারমুক্ত করে দেন। আনন্দমঠের পরিবেশ শুধু নির্জনই নয়, মনে হয়, কোন এক অলৌকিক সত্বা সে পরিবেশকে গম্ভীর আর নিস্তব্ধ করে রেখেছে।

মঠে নানা দুর্লভ পুষ্পের গাছ আছে। এ ছাড়া একাধিক পান্থপাদপ গাছ আছে। মঠের পশ্চিম ভাগ ও উত্তর দিকে সুবৃহৎ আম্রকানন। তার কেন্দ্রস্থলে সুগভীর পুষ্করিণী, এখন কচুরিপানায় ঢাকা। পাট পচানও হয় সেখানে। উত্তর ধারে একটি সুবৃহৎ ইঁদারা অব্যবহার্য অবস্থায় কাঁটাতার দিয়ে বেষ্টন করা আছে। প্রায় কানায় কানায় নোংরা জল। অজস্র কামিনী ফুলের গাছ দিয়ে মঠ-প্রাঙ্গণের বেড়া দেওয়া হয়েছে।

মঠ আর আমবাগান ছেড়ে গ্রামের অভ্যন্তরে কিছু দূর গেলেই পথের বাম পাশে এক বিশাল বটগাছ দেখা যাবে। প্রায় দুই শতাধিক বোয়া ছেড়ে চারিদিকে বিস্তৃত স্থান জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে কালের সাক্ষী দিতে। এর তলায় বাঁধান সিঁড়ির উপর একটি শিবের লিঙ্গ মূর্তি। এই মূর্তিটির বয়স অধিক হলেও গরীবপুরে অধিক দিনের নয়। এটি ১৯২২/২৩ সালে পারমাদন কুমারবাবুর মাতুলালয় থেকে এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বটবৃক্ষটি বহু প্রাচীন। বয়স অনুমান করা সম্ভব নয়।

ডাঃ যদুনাথ কলিকাতা থেকে একযোগে দু'খানি সংবাদপত্র পরিচালনা করতেন। একখানি ইংরাজী "ইণ্ডিয়া মিরর" অপরখানি বাংলা "সমাজ ও সাহিত্য" নামে। সে যুগে "সমাজ ও সাহিত্য" একখানি বিখ্যাত সংবাদ পত্র ছিল। যদুনাথ প্রথম কয়েকটি সংখ্যা নিজেই সম্পাদনা করেছিলেন। তারপর তাঁর মধ্যম পুত্র গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় মাত্র উনিশ বছর বয়স থেকেই ঐ পত্রিকা সম্পাদনা করতে আরম্ভ করেন যোগ্যতার সঙ্গে। গিরিজানাথ ঐ পত্রিকা দু'টি নিজগ্রাম গরীবপুর থেকে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। গরীবপুরেই ছাপাখানা স্থাপন করান। ঐ ছাপাখানা পরিচালনা করার জন্য একজন ইংরাজ কর্মচারী নিযুক্ত করেন। সে সময় "সমাজ ও সাহিত্যের" গ্রাহক সংখ্যা চার হাজারেরও অধিক ছিল। সে সময় "সমাজ ও সাহিত্য" ছিল মাসিক পত্রিকা।

গিরিজানাথ একজন খ্যাতিমান কবি ছিলেন। তখনকারকালে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'বেলা,' 'পরিমল,' 'পত্রপুষ্প' ও 'অর্চন' সমধিক খ্যাতিলাভ করেছিল। গিরিজানাথের হাতেই "সমাজ ও সাহিত্য" পত্রিকার রূপান্তর ঘটে সাপ্তাহিক

"বার্তাবহ" পত্রিকায়। গিরিজানাথের মৃত্যুর পর বাংলা ১৩৫৮ সালে অনাদিনাথ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় "বার্তাবহ" পুনরায় রাণাঘাট থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। গীতি-কাব্যে গিরিজানাথের দান বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। গিরিজানাথকে আজ কেউ স্মরণ না করলেও তাঁর ভাষাতেই বলি—

'ক্ষুদ্র তারা দিয়ে যায় স্তিমিত কিরণ
সে-ও নাহি করে আঁধার হরণ।
আমার মর্মের গীত নীরবে গুমরি লভিবে মরণ॥'

ডাঃ যদুনাথের তৃতীয় পুত্র গিরিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত অনুরাগী ছিলেন। তাঁর প্রপৌত্র বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় কৃষি বিশারদ্। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইউ-রোপের বিভিন্ন দেশের কৃষি পদ্ধতি দর্শনের জন্য ভ্রমণ করেন। গরীবপুর গ্রামে আধুনিক পদ্ধতিতে যান্ত্রিক চাষবাস নিজ হাতেই কয়েক বছর করেছেন এবং এর প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন। তিনি একজন সাহিত্য অনুরাগী এবং শক্তিমান লেখক। তাঁর বহু লেখা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকে।

ডাঃ যদুনাথের কনিষ্ঠ পুত্র যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একজন নাট্যামোদী ; তাঁর প্রযোজনায় গরীবপুরে বহু নাট্যাভিনয় হ'ত। ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রথম নাট্যাভিনয় হয়। বর্তমানে বৈদ্যনাথ যে গৃহে বাস করেন সেই গৃহে নাট্যমঞ্চ ছিল ও দর্শকগণের বসবারও স্থান ছিল। এখন সব ধ্বংসের পথে। 'দেবলা-দেবী' নাটকখানি প্রথম মঞ্চস্থ হয় রাণাঘাটের তদানীন্তন খ্যাতিমান নাট্য পরিচালকের পরিচালনায়। মণিগোপাল মুখোপাধ্যায় অভিনয় খ্যাতি অর্জন করেন।

বৃটিশ আমলে নীলকর সাহেবরা বনগ্রাম মহকুমায় সর্বত্রই তাদের দানবীয় থাবা গড়েছিল। গরীবপুরও নীল দানবের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। এখনও নীলের ক্ষত গরীবপুরে বর্তমান আছে গরালী নদীর তীরে। সে সময় নদী নাব্য ছিল। এই নদীর তীরে একটা ঢিবি আছে। লোকে তাকে বলে বাঁড়ুয্যে পোঁতা। বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণ নীলকর সাহেবদের কর্মচারীরূপে এই গ্রামে আসেন। গরালী নদীর ধারে গড় বেষ্টিত অট্টালিকা নির্মাণ করে বসবাস করতেন। এখন তাঁদের বংশধর কেউ গ্রামে নেই। নীলকর সাহেবরা ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে সস্তা শ্রমিক বাঁকুড়ার সরদার আদিবাসী আমদানি করেছিলেন। আজ তাঁরা এই গ্রামের অধিবাসী। তাদের সংখ্যা চারশ' এর অধিক। সকলেই কৃষিজীবী বা কৃষি শ্রমিক। তাঁদের কারও অবস্থা স্বচ্ছল এ কথা বলা যায় না। অনেকেরই

অন্ন জোটে না। গ্রামের বিভিন্ন অংশে এঁদের বসতি।

গরীবপুর গ্রামের প্রবেশ পথের প্রথমেই পড়ে গরীবপুরের হাট রাস্তার ডানধারে প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবারে হাট বসে। হাটের আয়তন নিতান্ত ছোট নয়। বেশ বড় হাটই জমে। একটি দোকান আছে। সকল রকম জিনিসই পাওয়া যায় প্রতিদিন। হাটের মধ্যে কয়েকটি হাটচালি আছে। হাটের মধ্যে চারটি বট ও অশ্বত্থের গাছ আছে। হাটের পাশেই বাংলাদেশের বরিশাল থেকে আগত সোমেশ চক্রবর্তী মহাশয় বাস করছেন। দোকানটি তাঁরই। কিছু জমি ভাড়া নিয়ে চাষবাসও করছেন। তাঁর গৃহের পাশেই গরীবপুর ডাকঘর। সামনেই রেল-পথ। ডাকঘরের ছাদে নানা আগাছা জন্মেছে। দেওয়ালেও বট-অশ্বত্থের চারা শিকড় গেড়েছে। ডাঃ যদুনাথ দাশগুপ্ত সহ তিন কামরা গৃহ নির্মাণ করেছেন। ডাকঘরের পাশেই গরীবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের অবস্থা শোচনীয়। গত ১৩৭২ সালের বৈশাখের ঝড়ে টিনের চাল উড়ে গেছে। ইটের দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। কিছু টিন ও জানলা-দরজা চুরি হয়ে গেছে। এখন ডাকঘরের বারান্দায় পঠন-পাঠনের কাজ চলে। স্বাধীনতা আন্দোলনে গরীবপুর গ্রামের অবদান ছিল। তারাপ্রসন্নের বংশধর সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় (গেদু) এবং তাঁর জননী স্বর্গীয়া বাসন্তীদেবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আগ্নেয় অস্ত্রসহ আগরতলায় তাঁরা ধরা পড়েন। অতঃপর কারাবাসের পর অব্যাহতি পান। নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায় অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। বর্তমান সুধীরকুমার সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক-এর পদস্থ কর্মী। কুচবিহার থাকেন। আর নির্মলকুমার মোহিনী মিলের উপর পদে নিযুক্ত আছেন। বর্তমানে গরীবপুর আবার গরীব হওয়ার পথে চলেছে। ঘর বাড়ির সে জৌলুষ নেই। পথ-ঘাট দুর্দশাগ্রস্ত। গ্রামের সাংস্কৃতিক দিক একেবারেই রুদ্ধ। প্রাথমিক বিদ্যালয় তারও শোচনীয় অবস্থা। পুকুর যে কয়টি আছে তার মধ্যে অনেকগুলি মজে যাওয়ায় পানা ঢাকা। মধ্যবিত্ত অনেকেই রুজিরোজগারহীন। বেকার শিক্ষিত ছেলে ঘুরে বেড়ায় গ্রামের পথে। যাঁরা কৃষক সম্প্রদায় তাদের দুঃখ কবে ছিল না যে আজ তাঁরা সুখের আশা করবেন! আজও আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে হয় বারিবিন্দুর আশায়। অনেকে আবার ভূমিহীন।

বঙ্গভঙ্গের পর অনেকে এই গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। মধ্যবিত্ত আবার অনেকেই অন্যত্র গেছেন। যাঁরা আছেন তাঁদের অবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে শোচনীয়। গ্রামের পশ্চিমে বিলের ধারে কয়েকঘর

নমঃশূদ্র কৃষিজীবী বসতি স্থাপন করেছেন। এই বীর ক্ষত্রিয় সন্তানেরা তাঁদের স্বাভাবিক কর্মকুশলতায় অন্যান্যদের মত হতাশাগ্রস্ত নন। সুযোগ পেলে সম্ভবত অনেকই স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারতেন।

গরীবপুরের বর্তমান গরীবের সঙ্গে দেখা দিয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক দলাদলি। গ্রাম্য হিংসাদ্বেষ এখন তুঙ্গে বলেই মনে হয়। সে কারণেই সাধারণের প্রতিষ্ঠান আজ ধুঁকছে। একে অপরের দুর্বলতার সুযোগ খুঁজছেন। আবার কারও বা নির্লিপ্ত ভাব। গরীবপুরকে আপন গ্রাম বলে ভাববার লোকের আজ খুবই অভাব। সকলে নিষ্ফল আত্মমর্যাদা লাভের জন্য লালায়িত। গরীবপুরকে আবার গৌরবপুর করতে পারতেন মুখোপাধ্যায় পরিবারের যাঁরা গ্রামে আছেন তাঁরাই। তাঁরা শিক্ষিত ও বিচক্ষণ। নবাগতেরা ছিন্নমূল। তাঁরা তাঁদের প্রচেষ্টায় নিজেদের মত সংগঠন করতে সচেষ্ট হলেও অভাবের ছাপ সর্বত্র। মনে হয় যাঁদের পূর্বপুরুষেরা গ্রাম গড়ে ছিলেন, তাঁদের বর্তমান জটিল সমাজ ব্যবস্থার হালধরার অনিচ্ছা। এই ঐতিহ্যমণ্ডিত গ্রামখানা মনে হয় এ কারণেই ধীরে ধীরে মহাকালের আবর্তে পতনোন্মুখ। আবার যদুনাথ, তারাপ্রসন্নের মত মানবদরদী মহাপ্রাণের, কুমারবাবুর ন্যায় সাধকের, কবি ও সাংবাদিক গিরিজানাথের মত মনীষীদের আবির্ভাবের অপেক্ষায় হয়ত এই গ্রামখানি পথ চেয়ে বসে আছে। হয়ত সেই অতীত গৌরবময় স্মৃতি রোমন্থন করছে, আর কাঁদছে নিভৃতে নীরবে এই গরীবপুর। সেই কান্নার সুর কারও শ্রবণে প্রবেশ করে না। সে দুঃখ-বেদনা কারও মর্ম স্পর্শ করে না। তাই আজ সেখানে সব আছে অথচ কি যেন নেই, সকলেই আছে অথচ কাকে যেন পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রাম্য দলাদলি, মিথ্যা অহমিকা ও পরশ্রীকাতরতা গ্রামটিকে আদর্শ গ্রামে রূপান্তর হওয়ার পথে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করছে। অকর্মা, নিকমা ও আত্মসর্বস্ব অহম্‌বোধ নিয়ে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা ঠাণ্ডা লড়াই করে চলেছেন। বর্তমানে এটাই এখন দেশ সেবার পবিত্র বহন করে, দেশ আর গ্রামের দিকে তাকানোর অবসর কোথায়? অপর দিকে আছে নিদারুণ অভাবের ছাপ, তাতে জীবন যুদ্ধ নিয়ে টিকে থাকতেই সকলের প্রাণান্ত, সেখানে স্বদেশ চিন্তার অবসর কোথায়? তাই সকল গ্রামেরই একই শ্রী। মুষ্টিমেয় কয়েকজন গরিবী অনেক দূরে হটিয়েছেন সত্য কিন্তু অধিকাংশই গরিবীর পাষাণভারে তলিয়ে যাচ্ছেন অতল গহ্বরে। এ সমস্যার সমাধান বাণীতে বা মসীযুদ্ধে হওয়া কি সম্ভব! বাংলার নেতারা এখন ভোটের কাঙাল। সমস্যা সমাধান অপেক্ষা সমস্যা বৃদ্ধিই এখন মসনদ লাভের সহায়ক। তাই গরীব আরও গরীব হবে।

বারাকপুর

বনগ্রাম চাকদহ সড়কে বনগ্রাম থেকে চার মাইলের মাথায় শ্রীপল্লীর মোড়। সেখান থেকে ডানে দিকে পিচ ঢালা রাস্তা বাজিতপুর পর্যন্ত গিয়েছে। অবশ্য এ রাস্তার মাত্র এক মাইল পিচের, অবশিষ্ট অংশ কাঁচা এবং দুর্গম। বর্তমানে এই রাস্তায় সবটুকুই পাকা করার চেষ্টা চলছে। রাস্তায় মাটি ফেলার কাজ চলছে।

শ্রীপল্লীর মোড় এখন যার নাম হয়েছে, আগে ঐ স্থানকে বলা হ'ত জোড়া বটতলা। জনমানবশূন্য জঙ্গল আর মাঠ—একটা ঝিঁঝুম নিস্তব্ধতা; দিনের বেলাতেও অপরিচিতের আতঙ্ক সৃষ্টি করত। সেই জোড়া বটতলার একটা এখন নেই, ঝড়ে পড়ে গেছে ১৩৪৫ সালে। সেই রাস্তার এক মাইল এখন পিচের। মোড়ের মাথায় এখন দোকান। অনেক গৃহস্থ বাড়ি তুলেছেন। ইটখোলা, আধুনিক ফ্যাশানের বাড়িও দেখা যাবে। রাতের অন্ধকার দূর হয় এখন বিজলীবাতির ঝলকানিতে। বঙ্গভঙ্গের পর এই স্থানের গুরুত্ব বেড়েছে।

এই সড়ক ধরে কিছুদূর এগোলেই ইছামতী নদী দেখা যাবে। নদীকে ডাইনে রেখে সমান্তরালে কিছুদূর গেলেই গ্রামের শ্মশান। তারপরই পথ আবার ডাইনে মোড় নিয়ে শ্রীপল্লীর দিকে এগিয়ে গিয়েছে নদীকে সমান্তরাল রেখে। এই মোড় থেকেই একটা খোয়ার পাকা রাস্তা বারাকপুর গ্রামের ভেতর ঢুকেছে যে অঞ্চলে প্রাচীন বাসিন্দাদের বসবাস। এই রাস্তাটা পাকা করেছেন বনগ্রামের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ

অমর কুমার চট্টোপাধ্যায় (নক্ষ ডাক্তার) তার পৈতৃক বাড়ি পর্যন্ত। অবশ্য সে বাড়ি এখন হস্তান্তরিত। এই পথ থেকেই একটা সঙ্কীর্ণ ভাগাড় গ্রামের উত্তর ধার দিয়ে গিয়েছে, যার ডান হাতেই পড়বে বিশ্রুত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীর্ণ আবাস, যার ছাদের কিছু অংশ গত ১৯৭৫ সালে তাঁর পুত্র তারাদাস ঢালাই করিয়েছেন। দরজা জানালা নেই ভিতরের অংশ জঙ্গল আর ইঁটের স্তূপ। এমন কি ঘরের মধ্যেই আর একটি ঘর যেমন তেমনিই আছে। এক বিধবা বৃদ্ধা এ যাবৎ কাল সেই ঘর টাতেই বাস করছেন। তাই এখনও বাড়ির উঠানে যাওয়া যাচ্ছে। বিভূতি-ভূষণের নিজ হাতে পোতা স্বর্ণচাঁপা আর কাঁঠালীচাপা গাছ দুটো এখনও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। গ্রীষ্মকাল এলে তাতে ফুল ধরে, সৌরভ ছড়ায়, বিভূতির সৌরভের অংশীদার হয়।

এই গ্রামখানার উৎপত্তি যে দিন হয়েছিল আজ তার ইতিহাস হারিয়ে গেছে অথবা বিভূতি প্রতিভার চাপে তলিয়ে গেছে। যে গ্রামের সুখ-দুঃখ ব্যথা বেদনার কাহিনী বিভূতিভূষণ লিখে অগণিত পাঠকের মর্ম স্পর্শ করে-ছেন সেই গ্রামের ইতিহাস কোথায়? তাঁর উপন্যাস আর গল্পের উপজীব্য বিষয় হলেও তাতে তার ঐতিহাসিক সঙ্কেত মেলে, ইতিহাস মেলে না।

বারাকপুর গ্রাম অতি প্রাচীন। শোনা যায়, এখানে কোন রাজার আবাস ছিল। বিভূতিভূষণের কেদার রাজার নাম কল্পনার ফসল নয়। কোন বাস্তব সূত্র ধরে এই নাম তাঁর গল্পের শিরোনাম হয়েছিল। ১৯২৮ সালে ঐ গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় পৈতৃক ভিটা ছেড়ে নূতন অট্টালিকা নির্মাণ কালে ভিত খুঁড়তে গিয়ে প্রচুর নক্সাদার ইট পান। আর মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত অট্টালিকার উপরেই নিজ গৃহ নির্মাণ করেন। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও অবস্থান আর ঐ বিরাট সীমানা জুড়ে প্রোথিত অট্টালিকার অস্তিত্ব স্বভাবতই এই ধারণার উদ্রেক করেছিল।

বারাকপুর গ্রামের আদি বাসিন্দা বলতে গেলে রায় পরিবার, তাঁরাই এই গ্রামের পত্তন করেন। এখন তাঁদের অনেকে মুখোপাধ্যায় উপাধিও গ্রহণ করেছেন। মূল বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা ত্যাগ করে অনেকেই আশে পাশে গৃহ নির্মাণ করে বাস করছেন। রায় বাড়ির পশ্চিম অংশের দুখানি ঘর মেরামত করে মন্টু রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীপল্লী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিমল রায় (কালো) বসবাস করছেন। তাঁর ভাইদের প্রায় সকলেই এখন বার্ণপুরে। সেখানে তাঁরা শুধু কর্মরত তা নয় নিজ নিজ আবাসও

নির্মাণ করে প্রবাস জীবন যাপন করছেন। এই গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় প্রায় সকলেই এই রায়েদেরই দৌহিত্র বংশের সন্তান। বারাক-পুরের জমি জমাব মালিক এই রায়েরাই ছিলেন। পাঁচশত বৎসরের পূর্বে তাঁরা এই গ্রামে আসেন ঐ রাজার কোন পদস্থ কর্মচারী হয়ে। রাজ বংশ হারিয়ে গেল কোন বিপর্যয়ে তার ইতিহাস অজ্ঞাত, তার কর্মচারী বংশই এখন শাখা প্রশাখায় গ্রামে ও প্রবাসে ছড়িয়ে আছেন।

, বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের আদি পুরুষ ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গার পরপার এর কোন গ্রাম থেকে ভাগ্যান্বেষণে বের হন। প্রথমে কাঁচরাপাড়া পরে এই বারাকপুরে আসেন। কৌলীন্য ও পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হয়ে রাজ বংশের কন্যা তাঁকে সম্প্রদান করা হয়। যৌতুকে কিছু ভূখণ্ডও দেওয়া হয়। সেই থেকেই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার বারাকপুরের অধিবাসী। তাদের বংশাবলী এখন গ্রামে বাস করছেন। এই বংশের তৃতীয় পুরুষ কার্তিক প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পুত্র ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায় নীলকুঠির ঠিকাদারি করেন। কুঠিয়াল সাহেবের অনুগ্রহে ফোর্ট উইলিয়ামে কিছু কাল চাকুরি করেন। সেখান থেকে ইংরাজ অনুগ্রহে সুন্দরবনের লাট খরিদ করেন। সেই অংশই এক সময় কচু রায়-এর রাজধানী ছিল। ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু পুরুষ ছিলেন না ছিলেন অমিত বল ও সাহসের অধিকারী। ঐ বন অঞ্চলে বন জঙ্গল পরিষ্কার আর বাঘ নিধন করে তিনি আবাদের পত্তন করেন। যে আবাদকে বলা হ'ত বেদকাশীর আবাদ। পরবর্তী কালে বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের প্রায় সকলেরই এই আবাদে জমিজমা ছিল আর তার থেকেই তাঁরা সঙ্গতিশালী স্বচ্ছল পরিবার রূপে গ্রামে বাস করতেন। পৌষ মাস গত হলেই সকল বন্দ্যোপাধ্যায়রাই আবাদে যেতেন আর আসতেন ফাল্গুনের শেষে চাঁদ সওদাগরের মত মধুকর নৌকা বোঝাই করে, ধান, মাছ, মধু, ডিম, হাঁস, ছাগল, হরিণ ইত্যাদি নিয়ে। বঙ্গভঙ্গের পরই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার সম্পদ ও সম্পত্তি হারা হয়ে পড়লেন। ভিন্ন রাষ্ট্রে তাঁদের আবাদ চলে গেল। আবাদের সম্পত্তির জন্য বারাকপুরে তাঁরা কোন ভূসম্পত্তির বৃদ্ধি করেন নি। তাই আজ তাদের বোল বোলাও গেছে। বংশধরেরা সরকারী বেসরকারী চাকুরি ইত্যাদি করে কোন প্রকারে ভিটে আঁকড়ে আছেন। এতে কারও কারও অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ভগ্ন বাড়ির স্তূপের আড়ালে কোন প্রকারে আস্তানা নির্মাণ করে দিন কাটাচ্ছেন।

এরপর গ্রামের পশ্চিম সীমানায় দেখা যাবে বিশাল দ্বিতল অট্টালিকা স্তূপের পাশে গোস্বামী পরিবারের বংশধরদের বাস। তাঁরা এই গ্রামে আসেন সাড়ে

তিন শত বৎসর পূর্বে। বৈবাহিক সম্পর্কই এর কারণ। তাঁরাও ধীরে ধীরে সঙ্গতিশালী হয়ে ওঠেন। রাধাবল্লভ মণ্ডলের অধীন রাণাঘাটের পত্তনিদার জমিদার খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর নিকট থেকে যে কোন সূত্রেই হোক, এই বংশের প্রথম পুরুষ জগদীশ গোস্বামী (চট্টোপাধ্যায়) ভূসম্পত্তি লাভ করেন। বর্তমান থেকে ১৭তম ঊর্দ্ধ পুরুষ ফকিরচাঁদ গোস্বামী শ্যামসুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সাবেক মন্দির ভেঙ্গে যায়। আজ কয়েক বৎসর হল মন্দির সম্মুখের নাট মন্দিরের কিয়দংশে ঘর করে তাতেই শ্যামসুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শ্যাম কষ্টিপাথরের পার্শ্বে রাধা অষ্ট ধাতুর এবং তাদের পশ্চাতে দণ্ডায়মান গৌর-নিতাই-এর দারুময় মূর্তি। নাট মন্দিরের অনতিদূরে দক্ষিণ দিকে দোলমঞ্চ এখন ভগ্নপ্রায়। প্রতি বৎসর রামনবমী তিথিতে দোল উৎসব হয়। শ্যামসুন্দরের বার্ষিক উৎসব। এ সময় অষ্ট-প্রহর নামকীর্তন যজ্ঞ হয়ে আসছে। দোল মঞ্চের পশ্চাতে পূর্ব দিকে এক বৃহৎ পুষ্করিণী এখন মরে গেছে, কচুরি পানায় ভরা। এছাড়া দোলমঞ্চের পার্শ্বে বৃহৎ মনসা বৃক্ষের তলায় হয় ভাদ্র মাসে মনসা পূজা। গোস্বামীদের ছয় ভাই এখন ভগ্ন অট্টালিকার ইট কাঠ দিয়ে যে যার মত টালির চাল দিয়ে আবাস নির্মাণ করে বসবাস করছেন তিন, বিঘা বসত ভিটার বিভিন্ন অংশে। ছয় ভাই-এর মধ্যে দুই ভাই কলিকাতায় চাকুরী করেন। চার ভাই বাড়ি থাকেন সকলের পেশাই চাষবাস আর ঠাকুর সেবা। বড় ভাই গোপালচন্দ্র গোস্বামী নিজেই ঠাকুরের পূজা করে থাকেন। এই গোস্বামী পরিবার নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বংশধর। ফুলেমেল. সাগরদাঁড়ি. যশোহর জেলায় তাঁদের বাস ছিল পূর্বে।

গোস্বামী বাড়ির পাশেই হাজারী ঘোষের বাড়ি সংগতিশালী গোপ বংশ। তাঁর গোপালনগরে কাপড়ের দোকান ছিল এছাড়া ছিল চাষবাস। বর্তমানে তাঁর দৌহিত্রেরা ছয় ভাই ঐ বাড়িতে বাস করেন একতলা অট্টালিকায়। তাঁরা চাষবাস, ব্যবসা করেন। এক ভাই মদন ঘোষ প্রাথমিক শিক্ষক।

বঙ্গভঙ্গের পূর্বে বারাকপুরের জন বসতির হিসাবে দেখা যায় ব্রাহ্মণ ৩০ ঘর, জেলে ৩০ ঘর, কুমোর ৩০ ঘর, কামার ৫ ঘর, গোয়ালা ৩ ঘর, নাপিত ২ ঘর, বৈষ্ণব ১০ ঘর এবং মুসলমান ৩০ ঘর। বঙ্গভঙ্গের পর এক ঘর মুসলমান দেশ ত্যাগ করেন কিন্তু পরে আবার ফিরে এসেছেন। বঙ্গভঙ্গের পর যারা এ গ্রামে এসে বাস করছে তারা সকলেই প্রায় পাকা সড়কের ধারে। গ্রামের ভিতরে নূতন বাসিন্দা নেই বললেই চলে। তাঁদের মধ্যে

আছেন ব্রাহ্মণ ৩ ঘর, কায়স্থ ১২ ঘর, নমঃশূদ্র ২০ ঘর।

গ্রামের জেলেদের একমাত্র উপজীবিকা ইছামতীতে মৎস্য শিকার এবং নৌকায় মালপত্র ও সোয়ারী পরিবাহন। কুম্ভকারদের অবস্থাই শোচনীয়। ১৫ ঘরের ২ ঘর মাত্র আছে তাও তারা দীন ভিখারী। তাদের জাত ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়াতেই এই অবস্থা। মুসলমানদের অনেকেরই জোত জমি আছে তাতেই চলে দু-এক ঘর ক্ষেত মজুর। বারাকপুরের গ্রাম্য সমাজ এক প্রকার স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ নিজ নিজ বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিলেন ফলে সমাজজীবনে নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজন পরস্পর মেটাতে পারতেন।

গ্রামের পূর্ব প্রান্তে চক্রবর্তীদের বাড়ি। এঁরা রায় পরিবারদের পুরোহিত নিযুক্ত হয়ে এ গ্রামে আসেন, পণ্ডিত বংশ টোল চতুষ্পাটি খোলেন। ন্যায়রত্ন, তর্করত্ন, স্মৃতিরত্ন ইত্যাদিতে ভূষিত একাধিক পুরুষ এই বংশের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। বর্তমানে যাঁরা আছেন শিবরাত্রির সলতের মত বংশের বিলুপ্তি রোধ করে রেখেছেন এই পর্যন্ত। এখন টোল চতুষ্পাটির কোন চিহ্ন নেই। তবে গ্রামে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়েছে। তাতেই গ্রামের বালক বালিকার প্রথম পাঠ শেষ হয়। পরে গোপালনগর বা বনগ্রামের উচ্চবিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে হয়।

এ গ্রামের উজ্জ্বলতম রত্ন বিভূতিভূষণ ছাড়াও আরও অনেক কৃতী সন্তানের পরিচয় না দিয়ে পারছিনা। ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর পৈতৃক বাসভূমি ছিল বারানসী। পিসীমার কেউ ছিল না তাই তাঁকে দেখতে এসেই এই গ্রাম্য পরিবেশে মুগ্ধ হয়ে আটকা পড়ে যান। গিরীন্দ্র-নাথ নেপাল রাজ সরকারের চিকিৎসক ছিলেন। এরই পুত্র স্বনামধন্য ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'ক্যাপটেন চ্যাটার্জ্জী' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বের কথা আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে। সুরেন্দ্রনাথেরই মধ্যম পুত্র ডাঃ অমরকুমার চট্টোপাধ্যায় (নন্তু ডাক্তার) বর্তমানে বনগ্রামের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। এই চট্টোপাধ্যায় পরিবার এখন গ্রাম ত্যাগ করেছেন আজ বছর কতক হল তাঁদের বসতবাটী হস্তান্তরিত।

যুগোলকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন দীর্ঘকাল। এছাড়া অনেক সন্তান আছেন যাঁরা গ্রামের বাহিরে থাকেন। গ্রামের সঙ্গে কারও যোগ আছে আবার কারও নেই।

বিভূতিভূষণের যে বাড়ী সকলে দেখে আর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সে বাড়িখানি রামপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকে বিভূতিভূষণ খরিদ

করেন। রামপদ মুখোপাধ্যায়-এর পুত্র শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (জগ) এখন মাঝেরগ্রামের অধিবাসী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক।

বারাকপুর গ্রামের কয়েকটি মাঠ ও পুকুরের নাম তাৎপর্যপূর্ণ। সে সব নাম বিভূতিভূষণ তাঁর লেখার মধ্যে একাধিক জায়গায় ব্যবহার করেছেন। যেমন ঠাকুরঝি পুকুর, শ্রীপল্লীর মোড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ইট খোলা যেখানে ঐখানেই ছিল। উত্তর মাঠে শাঁখারী পুকুর, ইন্দু রায়-এর বাড়ির পূর্বে ভাতবাড়ির মাঠ, দোল পিঁড়ির মাঠ, ধোপাকুড়োর মাঠ ইত্যাদি।

বিভূতিভূষণ বারাকপুরের নাম নিশ্চিন্দিপুর দিয়ে যে পরিবেশ, সমাজ, ও জীবনযাত্রার আলেখ্য তুলে ধরেছেন তার সত্যতা সতত প্রতীয়মান হয়। সে সমাজ-চিত্র গাছপালা লতা গুল্মই ত' আজ বিশ্বে আলোড়ন তুলেছে। সেই নিশ্চিন্দিপুরের আবরণে মুড়ি দিয়ে বারাকপুর আজও সেই বাস্তব সত্তা নিয়ে কাল আবর্তে পাক খাচ্ছে।

এখন সেই গ্রামেই এসেছে বিজলী বাতি। অনেকের বাড়িতেই দেওয়ালে টিপ দিলেই রাত্রে অন্ধকার দূর করছে আলোর ঝলকানিতে। এখন বারাকপুরের মাঠে বার মাস আবাদ, ধান ফলছে বছরের বার মাসই। এছাড়া পাট, গম, নানা ডাল ও সবজি জল সেচের ব্যবস্থা হয়েছে অগভীর নলকূপের জলে।

গ্রামের দক্ষিণ দিয়ে গিয়েছে বনগ্রাম চাকদা সড়ক। সেই সড়ক দিয়ে যেত একদিন গরু বা মহিষের গাড়ি আর পালকি। আর এখন সে পথে ছুটছে বিভিন্ন আকৃতির যন্ত্রদানব বাস, লরি, টেম্পো, অটো ইত্যাদি। গ্রামের লোকের যাতায়াতের আজ অনেক সুবিধা। তবুও যেন কি জিনিস সেখান থেকে হারিয়ে গেছে। বন্ধন একদিন সকল অধিবাসীকে করে রাখত আত্মার আত্মীয়, সে বন্ধন আজ শিথিল। সকলেই আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা ব্যথা বেদনা নিয়ে ব্যস্ত। কেউই কারও জন্য আজ মাথা ঘামাতে পারছে না। জটিল জীবনযন্ত্রণার কোন ঔষধ আজ যেন আর মিলছে না। জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। আর সেই মান রক্ষা করতে দেখা দিচ্ছে হাজারো সমস্যা তাই গ্রাম্য জীবনও আজ অশান্ত নগর-কেন্দ্রিক আদর্শে অস্থির। সার্বজনীন পূজা হয় পথে পথে ছেলে মেয়েরা পথচারীর কাছে চাঁদা আদায় করে। ঘরে ঘরে বেতার বাজে, মাইকেও আওয়াজ তোলে গ্রামের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ তখন বহু দুঃখে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে গুমরাতে থাকে। 'পথের পাঁচালী' পড়া নাগরিক বিভূতি তীর্থ দেখতে

এসে থমকে দাঁড়ান। এ কোন নিশ্চিন্দিপুর এখানে এখন কেউই নিশ্চিন্ত নয়, সকলেই আধুনিক জীবন যন্ত্রণায় ছটফট করছে। শ্যামলিমা লুপ্ত হচ্ছে, ইছামতী শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হচ্ছে, নবাবগঞ্জের নিস্তব্ধ পথে গড়ে গরুরগাড়ীর কাঠের ঘুরোর আওয়াজ তুলছে না, বনগ্রাম চাবদা সড়ক থেকে ভেসে আসছে নৈশ নিস্তব্ধতা ভেঙে যন্ত্র দানবের গর্জন আর হর্ণের আওয়াজ।

মোল্লাহাটি

বারাকপুরের উত্তর ধার দিয়ে ইছামতীকে ডান হাতে সমান্তরালে রেখে চলে গেছে বাজিতপুর পর্যন্ত যে রাস্তা সেই রাস্তা অধুনা গড়ে ওঠা শ্রীপল্লীর শেষ সীমা পর্যন্তই পাঁচের। এখন যেখানে শ্রীপল্লী, একদিন সেখানেই ছিল নীল-কুঠিয়ালদের কুঠি, নীল চাষের মাঠ। শত শত কৃষকের রাঙা রক্ত মোক্ষণ করে নীলকর ইংরাজরা বার করত নীল। কুঠিয়াল সাহেবদের দিন ফুরাল। পড়ে থাকল মাঠ। খড়ের মাঠ নাম নিয়ে দু'শ বছর কাটল। এখন সেখানে জন বসতি। নতুন ভাবে গড়ে উঠেছে গ্রাম্য সমাজ। বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন লোক এসে একত্র মিলে নতুন গ্রাম্য সমাজ গড়ে তুলেছেন নিজেদের প্রয়োজন মত। শ্রীপল্লীর পশ্চিম সীমায় শ্রীপল্লী বাজার। সেখানে কয়েকখানি দোকান। হাটও বসে শ্রীপল্লীতে এখন। এর পরই খাল, গোপালনগর বাঁওড় থেকে এসে ইছামতীতে মিশেছে। খালের উপর কাঠের পুল। সেই ইছামতী দূরে সরে গেছে, রেখে গেছে তার দুটি ধারা যাদের এখন বটতলার দোয়া আর কলাতলার দোয়া বলা হয়। ১৩০৭ সালে বন্যার পর ইছামতী এই চিহ্ন রেখে খাত পরিবর্তন করে উত্তরে সরে যায় আর সঙ্কীর্ণও হয়ে পড়ে। তার ধার দিয়েই রাস্তা। দু'মাইলের মাথায় সুন্দরপুর। সেখান থেকে বাজিতপুরের পথ ছেড়ে ডান ধারে আর একটা কাঁচা রাস্তা গেছে। সে-রাস্তার দুপাশে একদিন বট অশ্বত্থ গাছ পোঁতা হয়েছিল। আজও তার অস্তিত্ব বর্তমান। অনেকগুলিই এখন টিকে আছে। দিগন্ত বিস্তৃত আবাদী মাঠ অতিক্রম করে আর দু'মাইল গেলে তবে মোল্লাহাটি গ্রাম। প্রথমেই পথের বাঁ ধারে ননীগোপাল সর্দারের গম কল। তার পাশেই শিবতলা। একটা বৃহৎ অশ্বত্থ গাছ। তার তলায় ইট গাঁথা ত্রিশূল পোঁতা। সেখানে

হয় গাজন উৎসব ও মেলা চৈত্র সংক্রান্তিতে। তার মাসে হয় মনসা পুজা আর সেই উপলক্ষে মেলা। এরপর সংকীর্ণ গ্রাম্য ভাগাড পথ বলা চলে না। পথের বাঁ ধারে ছাড়া ছাড়া কয়েকটি কুটির—সকলই আদিবাসীর। দু'একখানা পাকা বাড়ি টালির চাল। ভাগাড়ের দু'পাশে দেখা যায়। একটু এগোলেই ডান হাতে সবকারী পাকা ডাক বাংলো। সামনে পিছনে বারান্দা। একটি বৃহৎ কক্ষ। পিছনের বারান্দায় একটি কামরা। খড়খড়ি লাগান দরজা জানালার অবস্থা এখনও ভাল আছে। সাত বিঘা জমির উপর এই বাড়ি। একটি স্যানিটারী পায়খানা আছে। বঙ্গভঙ্গের দুবছর পূর্বে বৃটিশ আমলে এটি নির্মাণ করা হয়। এর পূর্বে ছিল খড়ের আটচালা বাংলা ঘর। আগে এর তত্ত্বাবধানকারী ছিল। তার মৃত্যুর পর আর কেহ দেখে না। সম্ভবত পূর্বে এই ডাক বাংলোব গুরুত্ব ছিল। এখন কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু এই সরকারী বাড়ি অন্যভাবে কাজে লাগানর সুযোগ আছে। এক ঘর বাস্তুহারা এখানে বাস করছে। পথের বাঁ ধারে একখানা দোকান। দোকানদারের নাম নন্দু বাবু আদিবাসী এক যুবক।

এবপব আরও সংকীর্ণ উঁচু নীচু পথ। কোথাও ইটের স্তূপ। ভাঙ্গা ইটের টুকবো জঙ্গল অতিক্রম করে বিরাট স্তূপের কাছে গেলেই বোঝা যাবে একদিন এখানে ছিল বিশাল অট্টালিকা। তার ধারে দু'খানি খড়ের দোচালা দু-একটা আম-কাঁঠালের গাছ দু' চার বছর পূর্বে পোঁতা হযেছে। স্তূপেব উপর উঠলেই দেখা যাবে দুই হাত উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত চাতাল। সেখানে নীল পচান হ'ত। এটাকে নীল চৌবাচ্চা বলা হয়। এর এক ধারের প্রাচীর ভেঙ্গে গেছে। চালা ঘর দুইটি গোবিন্দ সাধুর আস্তানা। বছর পনের তিনি এখানে আস্তানা গেড়েছেন। এই ঢিবির দক্ষিণ দিকের ঢালু অংশে আছেন আর এক বৈরাগী ও বৈরাগিণী আস্তানা গেড়ে। একখানি তিন চালা খড়ের ঘর। বৈরাগীর নাম গুরুপদ। তাঁর বাড়ি ছিল পাঁচপোতায়। এঁর জমি জমা আছে। এই কুঠি সংলগ্ন বিঘা চারেক জমিতে আবাদ করেন পাট ডাল ইত্যাদি। এই নীল কুঠিই একদিন ছিল ১৫২ কুঠব প্রধান কার্যালয়। এই কুঠির এলাকা ছিল উত্তর পূর্বে ইছামতী নদী, পশ্চিমে বামনডাঙ্গা এবং দক্ষিণে খাবরাপোতা। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়েই ছিল নীলের আবাদ ও তার কারখানা, কার্যালয়, আর নীলকর সাহেবদের কুঠি। এখন সবই ধ্বংস স্তূপ, ইট কাঠ যে যা পেরেছে নিয়ে গেছে। এখনও নিচ্ছে। একদিন হয়ত এর কোন অস্তিত্বও থাকবে না। নীলকর সাহেবদের অফিস ঘর, ফাটক ঘর এখানে ছিল। বিচারে

যে হতভাগ্য কৃষকরা শাস্তি ভোগ করতেন তাদের আটকে রাখা হ'ত কাটক ঘরে। আর যাঁদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হত তাদের ফাঁসি দেওয়া হত আরাম ডাঙার বটগাছে ফাঁসি লটকে। এই স্তূপের পশ্চিমে বিরাট পুকুর ছিল। তার ছিল বাঁধান ঘাট এখন সেটা একটা ডোবা। তার চার ধার ঘিরে ছিল বিরাট কলমের আম বাগান এখন তার একটা গাছও নেই। এখন সেখানে কৃষিক্ষেত্র। সেই আম বাগানের মধ্যেই ছিল কুঠির বড় কর্মকর্তা আর টি সাবমোর (১৮৫০ খ্রীঃ) সাহেবের আদিবাসী স্ত্রী গায়া মেমের সমাধি। আজ কয়েক বছর হল সেই সমাধির বাঁধান চত্বর খোঁড়া হয়েছে। গর্ত আছে আর আছে ইট জমান একটা চাংড়া পড়ে। বাউল সর্দার এখন এই জমির মালিক। সমাধি খুঁড়ে শোনা যায় একতাল সীসা পাওয়া গিয়েছিল। এই সমাধির উত্তরে পুকুরের উত্তর দিকে সারমোর সাহেবের সমাধি ছিল। তার ইটও অপহৃত। দুলাল সর্দার এখন এই জমির মালিক। এখন সবই আবাদী জমি। পাট, মুসুরী ফলছে। যেখানে একদিন ইছামতী ছিল এখন সেখান থেকে সরে গিয়েছে। তার নাম হয়েছে পাঁচপোতার বাঁওড়। তার উত্তর দিয়ে বয়ে গিয়েছে ক্ষীণ কায়া ইছামতী। নীলকুঠিতে জল সরবরাহ করবার জন্য ইছামতী থেকে জল তোলা হত গরু চালিত "পার্শিয়ান হুইল" কলের সাহায্যে। তার চিহ্নও বর্তমান। যাকে ওখানকার লোক বলে 'চিনে কল'।

মোল্লাহাটি কুঠির কোন আকৃতি এখন নেই। আছে ভগ্ন স্তূপ আর সর্বত্র ছাড়ান ইটের টুকরো। আর যে সকল মজুর এনেছিল নীলকর সাহেবগণ সাঁওতাল পরগণা থেকে সেই মজুরদের বংশধর সর্দাররা, তাদের সকলেই জমি জমার মালিক হয়ে যায় নীলকর সাহেবরা চলে যাবার পর। কিন্তু তারা চাষ আবাদ বুঝত না সে কারণে নানা ভাবে তারা সেই সব সম্পত্তি নষ্ট করে। এখনও প্রায় ৭৫ ঘর সর্দার মোল্লাহাটিতে বাস করে। তাদের মধ্যে জমিজমা আছে মাত্র কয়েক জনের। নিপেন সর্দার, কেষ্ট সর্দার, কেতু সর্দার, বাউল সর্দার আর ননী সর্দার। ননী সর্দারের প্রায় ৩০ বিঘা জমি আছে। এদের অবস্থা কিছুটা স্বচ্ছল। ইটের দেওয়াল টালির চাল দেওয়া একাধিক ঘরও আছে। বাকী সকলেই ক্ষেত মজুর। এখন সর্দারদের দুটি পাড়া, পূর্বপাড়া ও পশ্চিমপাড়া। একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ও হয়েছে। তাতে সর্দারদের ছেলেমেয়ে পড়ে নগন্য সংখ্যক। নূতন যাঁরা বসতি গাড়ছেন বঙ্গভঙ্গের পর, তাঁদের ছেলেমেয়েরাই ঐ বিদ্যালয়ে পড়ে। সর্দারদের মধ্যে এখনও শিক্ষা লাভের আগ্রহ দেখা যায় না।

এই গ্রামে আর একটি দোকান আছে। হরেন সর্দারের দোকান। হাট

বাজার করতে হলে তাদের যেতে হয় ইছামতী পেরিয়ে দেড় মাইল দূরে মড়িঘাটা অথবা শ্রীপল্লী, গোপালনগর। সর্দারদের মেয়ে পুরুষ সকলেই কাজ করে। এখন হাজিতপুর রাস্তায় মাটি কাটার কাজ এই সর্দারদের অনেকেই করছেন। এতে মেয়ে মজুরের সংখ্যা বেশী।

এই অঞ্চলে চিকিৎসা লাভের কোন সুযোগ এখনও হয়ে ওঠেনি রোগ হলে গ্রামান্তরে যেতে হয় ঔষধের জন্য। বর্তমানে দেখা গেল নন্তুবাবুর দোকানের একপাশে একটা টেবিলের উপর কিছু শিশি বোতল। একজন ভাগ্যান্বেষী হাতুড়ে ডাক্তার বনগ্রামের শিমুলতলা থেকে যান তাঁর অদৃষ্ট ফেরাতে, না ঐ গ্রামবাসীদের অদৃষ্ট ফেরাতে কে জানে। হয়ত ঐ সরকারী ডাকবাংলোটাই একদিন একটা ছোটখাট স্বাস্থ্য কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। এ অঞ্চলের লোকেদের তাহলে অসহায় অবস্থায় পড়তে হবেনা।

একদিন এই মোল্লাহাটিই হয়ে উঠেছিল এ অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র। তখন বনগ্রাম ছিল না। মহকুমাও ছিল না। সকল সময় লোক জনের আনাগোনা। ইছামতীর বুকে আলোড়ন তুলে চলত নীলকর সাহেবদের বজরা, ছিপ, পানসি। কত কৃষকের অশ্রু ঝরে সরস করে তুলত এই মোল্লাহাটির মাটি। অনাচার, অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা চলত একদিকে আর অপর দিকে ছুটত আনন্দের ফোয়ারা নীলকর সাহেবদের নাচ, গান, ভোগ, বিলাস। আজ সেই নিঝুম নিস্তব্ধ প্রান্তরে সেই অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করছে এই স্তূপ আর তিল তিল করে বিলুপ্তির সীমানায় অগ্রসর হচ্ছে। হয়ত ভবিষ্যতে তার কোন অস্তিত্বই থাকবে না। মানুষ তার প্রয়োজনে হরণ করে চলেছে এই ধ্বংসস্তূপ, আর প্রকৃতি সঙ্গে সঙ্গে সাজিয়ে চলেছে তাকে নব নব ভাব ভঙ্গিতে। লুপ্ত হয়ে যাবে একদিন নীলকর সাহেবদের সকল স্মৃতিচিহ্ন। যেমন করে মুছে গেছে নীলকর সাহেবদের পূর্বে সেই মুসলমান যুগের মোল্লা-হাটির সকল কাহিনীর সকল স্মৃতি। শুধু নামটাই এখনও উচ্চারিত হচ্ছে। ইতিহাসের পাতায় তার সাক্ষ্য রাখতে। স্থান কাল পরিবেশ জনসমাজ সবই এখন নূতন ভাবে নূতন ভঙ্গিমায় পট পরিবর্তন করেছে। কোথায় সেই বৃহৎ অট্টালিকা, কোথায় সেই ঝাউ গাছের সারি, সুসজ্জিত পুষ্পোদ্যান, আম্রকুঞ্জ, শানবাঁধান পুকুর আর উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল প্রশস্ত ইছামতী নদী। তার বার্তা দেওয়ার জন্যও কাউকে পাওয়া যাবে না। নিস্তব্ধ দুপুরে শোনা যায় ঘুঘুর ঐকতান আর রাত্রে শৃগালের প্রহর ঘোষণা। দূরে আদিবাসীদের পল্লীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে চিৎকার করতে থাকবে একাধিক সারমেয়। ইতিহাস হারিয়ে যাবে মহাকালের আবর্তে।

১৩

পাল্লা

বনগ্রাম থেকে বনগ্রাম-চাকদহ সড়ক ধরে পাঁচ মাইল গেলে গোপালনগর। গোপালনগর থেকে একটা পীচের রাস্তা প্রথমে এঁকে-বেঁকে পরে বনগ্রাম রাণাঘাট রেললাইন পার হয়ে সোজা দক্ষিণে চলে গেছে। চৌবেড়িয়ায় এই পথ যমুনা নদী পার হয়ে নিমতলার উপর দিয়ে নদীয়া জেলার নগর উখড়া পর্যন্ত। বনগ্রাম থেকে নিমতলা পর্যন্ত যাত্রী বোঝাই ত্রিচক্রযুক্ত হাওয়াই যান "অটো" যাতায়াত করছে বর্তমানে এই পথে। গোপালনগর থেকে দু'মাইলের মাথায় পড়বে পাল্লা গ্রাম। দূর থেকে বাঁকের মাথায় ফাঁকা মাঠের পর পাল্লার রাস্তার ধারে কয়েকখানি দোকান আর বাড়ি দেখা যায় ছবির মত।

কোন এক হারান দিনে কয়েক ঘর কৃষক ও কৃষিশিল্পী নদীর তীরে এই গ্রামখানার পত্তন করেছিলেন—এ কথা দিয়ে আরম্ভ করলে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করবেন। নদীর যে অস্তিত্ব আজ দেখা যায় তা অতীতে প্রবহমান নদী ছিল বলে প্রত্যয় না জন্মালেও এটা বাস্তব এবং সত্য। একদিন ঐ নদীই মানুষ বসতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল, কালক্রমে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মানুষের স্বাভাবিক অবহেলায় আজ তার অস্তিত্বও লুপ্ত হবার পথে। এই নদীটির নাম ট্যাংরা, ইছামতীর একটি শাখা নদী। দীঘাড়ীর কাছ থেকে ট্যাংরা নদী ইছামতী নদীর থেকে বার হয়ে দক্ষিণে সাতাশীর কাছে যমুনা নদীতে মিশেছে। আর একটি নদী ট্যাংরা নদীর থেকে বার হয়ে শিমুলপুরে যমুনায় গিয়ে মিশেছে। এই নদী দুইটির রেখা-

মাত্র আজি বর্তমান। এখন চাষ হচ্ছে তাদের বুকে। বর্ষার জলধারা যখন এই পথে বয়ে যায় তখন তাদের হারিয়ে যাওয়া দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই নদী দুইটির মধ্য ভূভাগ পাল্লা গ্রাম। কয়েক ঘর কৃষক ও কৃষিশিল্পী যাঁদের নবশাক জাতির পর্যায়ে ফেলা যায় তাঁদের বাস ছিল। নীলকর সাহেবরা পাল্লার মাঠেও নীল ফলাতে ছাড়েনি। তাঁদের সঙ্গে এলেন নদীয়া জেলার বোলপুকুর গ্রাম নিবাসী এক ব্রাহ্মণ নীলকর সাহেবদের দেওয়ান হয়ে। তাঁর উপাধি চক্রবর্তী। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর প্রথম পদার্পণ ঘটল। এই গ্রামে। নীলকরদেব যে অত্যাচার ও শোষণ কৃষককুলের দুঃখ যন্ত্রণা যে কত গভীর ও মর্মান্তিক তার পরিচয় আজ কারও অজানা নয়। অত্যাচারে, শোষণে, ম্যালেরিয়ায় ও কলেরার করাল আঘাত সহ্য করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত (বঙ্গ বিভাগের সময়) মাত্র ত্রিশ ঘর অধিবাসী কোন রকমে তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষা করে গ্রামের বুক আঁকড়ে ছিলেন। দুর্গম জঙ্গল, আমকাঁঠালের বাগান আর বংশ কুঞ্জের সুস্বাস্থ্য মানবকুলের নির্জীবতা আর শ্বাপদচারীর বিজয় অভিযানের সংবাদ দিত।

অতীতের মধ্যবিত্ত সন্তানদের মধ্যে যে কয়জন এখনও এই গ্রামে আছেন তাঁদের মধ্যে কালীপদ চক্রবর্তী মহাশয় শুধু অন্যতম নন প্রধানতম।

কোম্পানীর যুগ কেটে গেল। তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের আমলে জমিদার বি, সরকারের অধীনে চাকুরিরত অবস্থায় কালীপদ চক্রবর্তী মহাশয়ের পিতৃদেব শিবপদ চক্রবর্তী ১৯২৮ সালে স্বগৃহে নিহত হন। তখন যশোহর জেলার জেলা শাসক মিঃ এ, এস্, লার্টকিন সাহেব। শিববাবু তখন পাল্লা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও ছিলেন। শিববাবু নিহত হওয়ার পর তরুণ কালীপদ কলেজ ছেড়ে পৈতৃক কার্যে বহাল হন। সেই সঙ্গে জেলা শাসক কর্তৃক মনোনীত হয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট পদও লাভ করেন। গোপালনগর থেকে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত যান-বাহন চলাচলের মত কাঁচা রাস্তা তাঁর প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য এই পথের উভয় পাশের অধিবাসীরা তাঁদের কায়িক শ্রম ও অর্থ অকপটে দান করেছিলেন রাস্তা তৈরী করতে। ১৮৭০ সালে জেলা বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার ক্ষিতিনাথ ঘোষ মহাশয় এই রাস্তা পাল্লা অতিক্রম করে নদীয়া জেলার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। কালীবাবু ক্রমশ জেলা বোর্ডের সদস্য হন ১৯৩৭ সালে। নিরক্ষর গ্রামবাসীদের শিক্ষার জন্য আটশত টাকা জেলা বোর্ডের সাহায্যে আদায় করে নিজের মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে 'রাজুবালা প্রাথমিক বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। এভাবে অনেক জনহিতকর কাজের মাধ্যমে কালীবাবু

এ অংশের নিরক্ষর জরাজীর্ণ গ্রামবাসীদের হৃদয় জয় করেন।

গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই নবশাক কৃষিজীবী। তার মধ্যে স্বর্ণকাররাই সমধিক সংগতিসম্পন্ন ছিলেন। তার পরেই কুম্ভকারদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হ'ত। তখন কোন উৎসব সার্বজনীন বলে চিহ্নিত হয়নি। বাংলার বারমাসে তেরো পার্বণ এ গ্রামেও অনুষ্ঠিত হ'ত। তবে তা বাড়ি বাড়ি। দুর্গোৎসব ও কালীপূজাও হ'ত। কর্মকারপাড়ায় হ'ত বারোয়ারী দুর্গাপূজা; আর কুম্ভকারপাড়ায় হ'ত বারোয়ারী কালীপূজা। কালক্রমে একেএকে প্রদীপ নিভতে নিভতে মাত্র ত্রিশ ঘর অধিবাসীতে এসে দাঁড়ায় ১৯৪৭ সালে। তখন গ্রামবাসী সংশেনিরা, জীবন যন্ত্রণায় পালাপার্বণ অস্তাচলে। চার-পাঁচ ঘর ব্রাহ্মণ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুড়ি ঘর, গোপ তিন ঘর, কুম্ভকার দুই ঘর আর নমঃশূদ্র দুই ঘর। এ ছাড়া চৌদ্দ-পনের ঘর মুসলমানও ছিলেন।

১৯৪৭ সালের বঙ্গভঙ্গের পর এ গ্রাম অতীত গৌরব গাথা, সুখ-দুখের কথা পিছনে ফেলে নূতনভাবে নূতন প্রেরণার আর প্রয়োজনের তাগিদে আধুনিক সাজে সাজতে আরম্ভ করল। পূর্ববঙ্গের থেকে বাস্তুহারা, সর্বহারার দল আসতে লাগলেন পশ্চিম বঙ্গের মাটিতে। তাঁদের কিছু অংশ পান্না। জঙ্গল রাজ্যেও এলেন নূতনভাবে বাঁচতে। নূতনভাবে জীবন আদর্শ গড়ে নিতে।

জঙ্গল পরিষ্কার হতে লাগল, ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মানুষের প্রয়োজন মেটাতে অনেক আম্রকুঞ্জ আত্মদান করেছিল। সেই সকল জংগলাকীর্ণ স্থানে কোথাও হল কৃষিক্ষেত্র কোথাও হল জনবসতি। এই নবাগতদের মধ্যে এমন কয়েকজন এসেছিলেন যাঁরা শুধু বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নন, তারা জনসেবায় আর স্বাধীনতা আন্দোলনে অনেক পোড় খাওয়া মানুষ। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নামও উল্লেখ করা যায়। তাঁরা হলেন ডাঃ রশিক পাল, ডাঃ তারাপদ শাস্ত্রী, রাসবিহারী বিশ্বাস এবং দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার।

পান্নার অতীতের সমাজসেবী কালীবাবু নূতনভাবে গ্রাম গড়ার কাজে নবাগতদের সাথে সামিল হলেন। দেশ বিভাগের পূর্বে গ্রামে প্রবেশ পথের বাম পার্শ্বে কালীবাবু যে হাট বসিয়েছিলেন সেই হাটের পাশেই রাজুবালা প্রাথমিক বিদ্যালয় পান্না উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হল। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পিছনে আজ কত দ্বন্দ্ব আছে কত ঘাত-প্রতিঘাতের কাহিনী। কালীবাবু বিদ্যালয়ের জন্য নয়বিঘা জমি দান করেন আর জমিদার রতনলাল সরকার তিন হাজার টাকা দেন। বর্তমানে ঐ বিদ্যালয়ে

ছাত্র-ছাত্রী এক সঙ্গেই শিক্ষা পায়। স্কুলের পরই ডাকঘর ও স্বাস্থ্য-কেন্দ্র। ১৯৫৪ সালে ইউনিয়ন বোর্ড ও সরকারী সাহায্যে একটি 'রেষ্টহাউস' বা ডাকবাংলা স্থাপিত হয়। সেই গৃহেই তরুণদের নিয়ে গঠিত ভ্রাতৃ সংঘ স্থাপন করেছেন পাল্লা সাধারণ পাঠাগার।

নদীর ধারা দুইটি শুকিয়ে যাওয়ার পর জলাভাব মিটাতে কয়েকটি পুকুর কাটান হয়। আজ সেগুলি প্রায় অব্যবহার্য হয়ে পড়ছে। গোবরডাঙার আঁশেরা জলদানরূপ পুণ্য কর্মের প্রেরণায় একটি পুকুর প্রতিষ্ঠা করেন। শান বাঁধান ঘাটের জন্য তার নাম শানপুকুর। ঐ পুকুরের কেন্দ্রস্থলে একটি দ্বীপ সদৃশ স্থান ছিল। কালক্রমে দাম ও পানায় অব্যবহার্য হয়ে পড়েছিল শুধু নয়, কয়েকটি ময়াল সাপ ঐ দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিল। অতঃপর নবাগতদের প্রচেষ্টায় সংস্কার করার কালে ময়াল সাপগুলি আত্মপ্রকাশ করে। জমিদার রতনলাল সরকার তখন ঐ গ্রামে অবস্থান করছিলেন তিনি গুলি করে সাপগুলি নিহত করেন। রতনলাল গ্রাম সংস্কার করতেই গ্রামে আসেন কিন্তু তাঁরই জনৈক কর্মচারীর বিরোধিতায় তিনি নাকি গ্রাম ত্যাগ করেন গভীর দুঃখ নিয়ে।

শানপুকুরের অনতিদূরে মুক্তাদীঘি। ১৬ বিঘা জমির উপর এই পুকুরের মালিক কালীবাবু। একদিন এই পুকুরে স্বাভাবিকভাবেই ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা উৎপাদন হত তাই এর নাম মুক্তাদীঘি। আজ এই দীঘি মজে গেছে। একপাড়ে ৩০/৩৫টি বেল গাছ ফলভারে নত। দীঘির চারিপাশে এখন চাষ-আবাদ হচ্ছে। এক ঘর গৃহস্থও দীঘির পাড়ে বাসা বেঁধেছেন। শ্রীমন্তপুর পথের পাশেই হাঁড়াকাটা পুকুর একদিন উৎকৃষ্ট জল সরবরাহ করত এখন মজা ডোবায় রূপান্তরিত। এর পাড়ে পথের পাশেই একটি অশ্বত্থ গাছ। তার তলায় প্রতি বছর ১লা বৈশাখ নব-বর্ষ উপলক্ষে মেলা বসে। এ ছাড়া ছাতিমতলা পুকুর, কামারপুকুর, নালমাধববাবুর পুকুর এবং মুসলমান-পাড়ায় মসজিদ পুকুর ও মোড়ল পুকুর সবই এখন মজে গেছে। কালীবাবু জেলা বোর্ডের সদস্য থাকাকালীন তাঁর প্রচেষ্টায় সরকারী ব্যয়ে একটি পুকুর কাটান হয়। মৎস্য চাষের জন্য সে পুকুর নিলাম ডাক হয়। এখন এই পুকুর কালীবাবুর অধীন। পুকুরগুলির সংস্কার হলে গ্রামের সম্পদ প্রভূত বৃদ্ধি পেত।

বর্তমানে সভ্য সমাজের প্রয়োজনে গ্রাম্য জীবনে যা দরকার সেগুলি স্থাপনের একদিকে যেমন প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে অপর দিকে তেমনি আছে ধ্বংসলীলার সুস্পষ্ট ছাপ। আধুনিক কৃষিব্যবস্থা চালু হয়েছে। মাঠে

বৈদ্যুতিক পাম্প বসান হয়েছে। গ্রামে অনেক বাড়িতে ও দোকানে বিজলী বাতি জলছে কিন্তু গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে শিউরে উঠতে হয়। অসংখ্য বাঁশঝাড়ের সমাবেশে অন্ধকার করে রেখেছে। অবশ্য সেগুলি গ্রামবাসীদের আর্থিক সম্পদ। তবু মনে হয় এই সম্পদ যদি গ্রামের বাইরে থাকত!

বঙ্গদেশ রঙ্গেভরা। সেই রঙ্গের অংশীদার হয়েছে এ গ্রামের তরুণ সমাজও। পূজাপার্বণ ও উৎসব আরম্ভ হয়েছে নূতনভাবে। সবই সার্বজনীন কিন্তু সাধারণ মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা সর্বকালীন বোধ হয়, নিবারণ হবার নয়। যার আনন্দ আছে তার আছে, যার নেই তার কিছুই নেই। সুতরাং অদৃষ্ট আর দেবতার অভিপ্রায় বলে বিংশ শতকেও মানুষ হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। অফুরন্ত কৃষি সম্ভাবনাময় গ্রাম অজন্মায় ধুঁকছে। নদীগুলি সংস্কার করে তার থেকে সেচ ব্যবস্থা করলে জমি সরস ও উর্বর হত মানুষও বাঁচত। পুকুরগুলি সংস্কার হলে মৎস্য সংকটও দূর হত। কিন্তু আজ যেন জেগে ঘুমোনোর দিন এসেছে। জানে সবাই বোঝে সবাই কিন্তু ঘণ্টা বাঁধে কে? কোটি কোটি বৈদেশিক অর্থের বিনিময়ে নলকূপ বসিয়ে বসুমতার বক্ষ শোষণ করতে সবাই চায়, কিন্তু দেশের বিষাক্ত ক্ষত মজা নদী, পুকুর সংস্কার অল্প খরচে যা সম্ভব তা হয় না। সে কাজে কিছু লোকের কর্মসংস্থানও হত। এসব অরণ্যে রোদন। বক্তৃতা থেকে যে নীতির উৎপত্তি সে নীতি আজ মানুষের মনোরঞ্জন করে না। রাজনীতিতে রূপায়িত করে ব্যক্তিগত গৌরব ও প্রতিপত্তি বাড়ায়। সেই গৌরব ও প্রতিপত্তি নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক কাজেও প্রসারিত করতে উল্লসিত।

পাল্লার সমাজ জীবনে এখন বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। পূর্বে ছিল এক নায়ক—এক পথ— এক মত। এখন লোকের ভালমন্দ বিচার ক্ষমতা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই সমাজ ব্যবস্থায় প্রবেশ করেছে বিভিন্ন মতাদর্শ। সেখানে আছে পরস্পর নেতৃত্বের সংঘাত। কে ভাল কে মন্দ বিচার করার মত সমালোচকও আছে, দর্শকও আছে, কিন্তু বাস্তবে রূপায়িত করার লোকের অভাব সর্বত্র। কেউ অগ্রসর হতে চায় আবার কেউ মনে করে, "আমার প্রাধান্য বোধ হয় আর থাকে না।" এই সন্দেহের মাঝে দ্বৈত মনোভাবে সাধারণ মানুষ হয়ে পড়েছে হতাশাগ্রস্ত। তবে পাল্লার তরুণ সমাজের ভবিষ্যৎ যথেষ্ট সম্ভাবনাময় বলে মনে হয়। তাঁরাই সকল বাধা সকল প্রকার সংরক্ষণশীলতা দূর করতে পারবেন। কিন্তু সে আশা হয়ত সেখানেও দুরাশা—মতাদর্শের ও রাজনীতির বিভেদে যুব সমাজ জারিত হয়েছে। আশা, নিরাশা আর হতাশায় মানুষ বিভ্রান্ত।

শিমুলিয়া শ্রীনগর

বনগ্রামের দক্ষিণ পশ্চিম সীমারেখা এখন যা নদীয়া আর চব্বিশ পরগণার সীমা নির্দেশ করছে, পূর্বে যখন সীমারেখা টেনে বনগ্রামকে নদীয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়নি তখনকার দিনের একটি গ্রামের কথা এখানে বলছি। সে গ্রামের নাম শ্রীনগর। অবশ্য এখন গ্রাম হলেও তখন সেটা নগরই ছিল। কালচক্রের আবর্তে সেই নগরের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গভীর জঙ্গলাকীর্ণ হিংস্র শ্বাপদের আবাসস্থল হয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল দীর্ঘকাল। এখন জঙ্গল পরিষ্কার হয়েছে। সে স্থানে এখন প্রকৃতির স্বাধীনতায় মানুষ হস্তক্ষেপ করেছে। চাষ আবাদ হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বসতিও বিস্তার লাভ করছে ধীরে ধীরে।

শ্রীনগর বনগ্রাম থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে। বনগ্রাম-চাকদহ রাস্তার পাশে মেদে (মেদিয়া), মেদের গোহাটার পূর্বধার দিয়ে প্রায় চার মাইল কাঁচা রাস্তা শিমুলিয়া। শিমুলিয়ার মধ্য দিয়ে শ্রীনগর যাওয়া যায়। শ্রীনগর যাওয়ার আরও একটি রাস্তা আছে। সেটি আরও পশ্চিম দিয়ে পাকা রাস্তা থেকে নেমেছে। সেটিও কাঁচা রাস্তা। মেদে থেকে শিমুলিয়া এই রাস্তা ১৩৪১ সালে শিমুলিয়ার অধিবাসী বনগ্রামের উকিল ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও মেদিয়ার বদান্য জননেতা স্বর্গত জনাব আবদার রহমানের চেষ্টায় নির্মাণ হয়। স্থানীয় আদিবাসীরা অক্লান্ত ও অকৃপণ পরিশ্রমে নির্মাণ করেন। অপর রাস্তাটা বেলে থেকে শ্রীনগরের ভিতর দিয়ে চলে গেছে নিমতলা হয়ে চাঁদপাড়া।

শ্রীনগরের পরিচয় দিতে গেলে বর্তমান পথের পরিচয় দিলে ঠিক পরিচয় দেওয়া হবেনা, কারণ তখন লোকের যাতায়াতের পথ ছিল নদী।

তখন নদীপথেই এদেশের প্রধান পরিবহনের ব্যবস্থা ছিল। সেকারণে নদীর পরিচয়টাই পূর্বে জানা দরকার।

গঙ্গা থেকে মরালী নদী বার হয়েছে। যশড়ার ইমামবাড়া সেই সংযোগ স্থলে অবস্থিত। এই মরালী নদীর মরালগতি ক্রমশ অগ্রসর হয়েছে দক্ষিণ দিকে। নহাটার নীচে যমুনা নদীর সঙ্গে মিশে গেছে মরালী। আজ এই নদী মজা খাল, বিশেষ করে বর্তমানে চণ্ডীগড় ট্যাংরার নিকট শুকিয়ে গেছে তার জলধারা। একদিন এই মরালী প্রশস্ত এবং স্রোতবতী ছিল, তার তীরে তীরে গড়ে উঠেছিল লক্ষ্মীপুর, হিংনাড়া, বেলে, চাঁপাতলা প্রভৃতি কত গ্রাম। আজ গ্রাম আছে কিন্তু গ্রামের উৎস যে মরালী সে রুদ্ধগতি হয়ে ক্রমশ বিলীন হতে চলেছে। মানুষ বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থা ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করে নিয়েছে নিজের চেষ্টায় স্থলপথ নির্মাণ করে।

সে প্রায় দশম শতাব্দীর কথা, বাংলার বার ভুঁইয়ার গৌরব রবির নিধন যজ্ঞের হোতা ভবানন্দ মজুমদারের বংশধর এই মরালী নদীর নিকট আবাসস্থল বেছে নিলেন। চারিদিকে পরিখা কেটে তার মাঝে নির্মাণ করলেন রাজপ্রাসাদ। গড় থেকে খাল কেটে মরালী নদীর সঙ্গে যোগ করে দিলেন যাতায়াতের সুবিধার জন্য। রাজবাড়ির ছিল একটি সুরক্ষিত দুর্গ। গড় দিয়ে ঘেরা ভু-ভাগের চারি কোণে চারিটি গম্বুজ, তার ভিতরে বসে সান্ত্রীদের পাহারার ব্যবস্থা ছিল। গড়বেষ্টিত বিরাট ভু-ভাগের মধ্যেই পুকুর, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, নানাবিধ ফলের বাগান। কর্মচারীদের আবাসস্থল সকলই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ক্রমে রাজধানীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল তার চারিপাশে জনবসতি। এই জনবসতির মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির বাস ছিল পাশাপাশি। কর্মকার, কাঁসারী, তাঁতি, ময়রা, বাদ্যকর ইত্যাদি শিল্পীর সংখ্যাই ছিল অধিক। এছাড়া নানাবিধ পণ্য ব্যবসায়ীরও বাস ছিল। এই জন্য পরিবহন ব্যবস্থা ছিল আর এক পথে মরালী নদীর সঙ্গে। বিরাট বিলের সঙ্গে খাল কেটে মরালী নদীর যোগ করে দেওয়া হয়েছিল। আর রাজবাড়ির জন্য স্বতন্ত্র খাল, সেটা কেবল মাত্র বাজার জন্যই উন্মুক্ত থাকত।

শ্রীনগর একটি নগরই ছিল মোটামুটি ভাবে বলা যায়। শিল্পীদের ব্যবসায়ের সুবিধাও ছিল, বহির্বাণিজ্যের দ্বারা তারা প্রচুর লাভবান হত। বর্গীর অত্যাচারে বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি ধন-প্রাণ রক্ষার জন্যও এই সুরক্ষিত নগরে এসে বসবাস করতে থাকেন। কালচক্রের আবর্তে আবার শ্রীনগরের

শ্রী ম্লান হতে থাকে। ময়ালী নদীর গতিপথ রুদ্ধ হয়ে গেল। যমুনা আর ময়ালীর সংযোগস্থলের উপর প্রায় এক মাইল ব্যাপী চড়া পড়ে গেল। শ্রীনগর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল বহির্জগতের থেকে। তখন শ্রীনগরের রাজা কৃষ্ণ-চন্দ্র স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন বর্তমান কৃষ্ণনগরে। সেখানে আবার ঠিক শ্রীনগরের ন্যায় রাজপ্রাসাদ গড়লেন। পড়ে থাকল শ্রীনগরের রাজপ্রাসাদ, পড়ে থাকল গড়, পড়ে থাকল দেবদেবীর মন্দির আর শ্রীনগরের তদানীন্তন অধিবাসীরা। বাংলা ১২০০ সালে দেখা দিল প্রবল মহামারী। জীবন-রক্ষার আশায় শ্রীনগরের অধিবাসীরা গ্রাম ছেড়ে ছুটল দিকে দিকে। অগণিত লোক কালগ্রাসে পড়ল।

শ্রীনগর সকল শ্রী হারিয়ে মহাশ্মশানে পরিণত হল। জনহীন পরিত্যক্ত শ্রীনগরকে প্রকৃতি নূতন শ্রী দিয়ে গহন জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে পরিণত করল। ক্রমশ মানুষের পরিবর্তে এল হিংস্র শ্বাপদ। কালের ব্যবধানে মানুষ ভুলে গেল শ্রীনগরের শ্রী। বিগত ১৩২৭ সালের এক নিগৃহীত দেশকর্মী এলেন এই অঞ্চলে, নাম তাঁর * কানাইলাল দাস রায়, কায়স্থ কুলোদ্ভব। ফরিদপুর জেলায় মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত ভদ্রা গ্রামের অধিবাসী। তিনি যৎসামান্য মূল্যে ব্যবস্থা করে নিলেন কৃষ্ণনগরের তদানীন্তন রাজ সরকারের নিকট থেকে এই বিরাট পরিত্যক্ত অঞ্চল। ক্রমশ বন পরিষ্কার হতে লাগল ধীরে ধীরে।

বর্তমানে শ্রীনগরের পূর্বশ্রী ফেরেনি তবে কৃষিপ্রধান গ্রামে পরিণত হয়েছে। কানাইবাবুই প্রায় সম্পূর্ণ গ্রামের জমির মালিক। চাষ আবাদও তাঁর বিরাট আকারের। গড় পরিবেষ্টিত ভূভাগে কলা বাগান, পেয়ারা ও আমের বাগিচা। গড়ের জলে মাছের চাষ হচ্ছে।

শিমুলিয়া থেকে শ্রীনগরে প্রবেশ করলে প্রথমে দেখা যাবে সিদ্ধেশ্বরী-তলা। বিরাট পৃথ্বীরাজ গাছের নীচেয় ঘট স্থাপনা করা আছে, ঠাকুরের থানে ত্রিশূল পোঁতা। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন এই সিদ্ধেশ্বরী মন্দির। এখন মন্দির বা দেবী বিগ্রহ নেই। সেই স্থানেই সিদ্ধেশ্বরী পূজার ব্যবস্থা হয়েছে ঘট স্থাপনের। তার বিপরীত দিকেই নীলকণ্ঠদেবের মন্দির। প্রতিষ্ঠাতা উষারাণী দেবী। প্রতিষ্ঠা দিবস ২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩৭১ সাল। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে একটা কাহিনীও আছে। এই মন্দির ভগ্ন অবস্থায় বের হয় জঙ্গল পরিষ্কারের পর। ভিতরে কোন বিগ্রহ পাওয়া যায়নি। কানাই বাবুর ভগ্নীর কোন পুত্রসন্তান না থাকায় ব্যথিত অন্তরে

* ১৯৭৩ খৃঃ কানাইবাবু আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

ঠাকুরকে ডাকেন। ঠাকুর স্বপ্নে তাঁকে আশ্বাস দেন সন্তানপ্রাপ্তির। যথাকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হল।

নাম তার বাসব। আশুতোষের কৃপায় সন্তানপ্রাপ্ত এবং স্বপ্নাদেশে ঐ মন্দিরে তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ হয়। উষাদেবী ঐ মন্দিরে দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প করেন। মন্দির পুনরায় সংস্কার করালেন। শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হল, কিন্তু ঠাকুরের নামকরণ নিয়ে দেখা দিল বিভ্রান্তি। সহসা বাসব—আট বৎসরের বালক বলল, 'আমার ঠাকুরের নাম হবে নীলকণ্ঠ।' সুতরাং ঐ মন্দিরের নাম নীলকণ্ঠের মন্দির হল। ধুমধামের সঙ্গে দেবতার প্রতিষ্ঠা হল। এই নীলকণ্ঠের মন্দিরের প্রাচীন কাহিনীও শোনা যায়। কাহিনীটি এইরূপ—প্রাচীন মন্দিরে এক সাধক থাকতেন, তাঁর নাম মৃত্যুঞ্জয় ব্রহ্মচারী। বাংলা ১২০০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁকে সমাধি দিতে বলেছিলেন তিনি। কিন্তু গ্রামবাসীরা তাঁর শব দাহ করে মরালী নদীর তীরে। সঙ্গে সঙ্গে মহামারীতে গ্রামের মানুষ মারা গেল অগণিত। অপর যারা ছিল তারা অভিশপ্ত গ্রাম ছেড়ে পালাল অন্যত্র। জনশূন্য গ্রাম ও মন্দির ধীরে ধীরে প্রকৃতির সাজে সজ্জিত হয়ে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে থাকল দীর্ঘকাল। সেই মন্দিরই আজ নীলকণ্ঠের মন্দির রূপ নিয়েছে। ভক্তই দেব মহিমা প্রচার করে। ভক্ত ছিল না—দেবতাও ছিলেন না। এখন ভক্তাধীন ভক্তের কাছে যেচে ধরা দিয়ে আবদ্ধ হয়েছেন মন্দির মাঝে, ভক্তরাও ধন্য হয়েছেন।

শ্রীনগরের জোড়া মন্দিরের একটির অস্তিত্ব এখনও বর্তমান। দক্ষিণদ্বারী মন্দির, পশ্চিমের দেওয়াল পড়ে গিয়েছে। বাহিরের ইঁট নানা কারুকার্যশোভিত দেব দেবীর মূর্তিও খোদিত আছে। ভিতরে কোন বিগ্রহ নেই। বাংলা সন ১৩৩০-৩১ সালে সর্দার হরি গোঁসাই শিব লিঙ্গটি অপহরণ করে। নানা সন্ধানে জানা যায়—সে স্বীকার করলেও শিব লিঙ্গটি পাওয়া যায়নি। সেটি সে অন্যভাবে নষ্ট করেছে বা বিসর্জন দিয়েছে ভয়ে।

বাঘেশ্বরের মন্দিরের পাশেই রাজমাতার মন্দির। শোনা যায় এই মন্দির কৃষ্ণচন্দ্র নির্মাণ করার পর তাঁর বন্ধু শিমুলিয়ার রাজু রায়কে উপহার দেন। এই মন্দিরদ্বয়ের শেষ পুরোহিত ছিলেন হাজারী রায় ও ফটিক রায় দুই ভাই। আজ কুড়ি বাইশ বছর পূজা বন্ধ হয়েছে। হাজারী রায় ও ফটিক রায়ের ভিটেয় এখন চাষ হচ্ছে। এগারোটি নারিকেল গাছ এখনও সেখানে বর্তমান আছে। কালিমাতার মন্দির এখন ধ্বংসস্তূপ।

জোড়া মন্দিরের অনতিদূরে রাজার গড়। গড় পার হলে এখন ভিতরে

যাওয়া যায়। ভিতরে রাণীপুকুর। এই পুকুর ধারেই ছিল বিরাট বটগাছ। গাছটি কাটা পড়েছে ১৩৪২-৪৩ সালে। ঐ গাছের বিরাট কোটরে এক বৃহদাকার বাঘ বাস করত। অদ্ভুত হলেও ঐ অঞ্চলের অনেকে বলেন তার মাথায় নাকি জটা ছিল। তার মধ্যে অনেকে নাকি প্রত্যক্ষদর্শীও। গোবরডাঙ্গার সেজবাবু দু'বার ঐ বাঘ মারতে আসেন, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি-গোচর হলেও ঐ বাঘ মারা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে অন্য বাঘ সাতটা তিনি মেরেছিলেন। কানাইবাবুও বহু বাঘ মেরেছেন জঙ্গল পরিষ্কার করার কালে। রাজবাড়ীর পূর্বে এখানকার আম বাগানের পাশেই ছিল ঘোড়দৌড়ের মাঠ। এখন সেই মাঠে কলার চাষ। রাজবাড়ীর গড়ের পূর্বদিক দিয়ে গেছে বেলে-চাঁদপাড়া রাস্তা। তার পাশেই বর্তমান স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের সুরম্য অট্টালিকা গড়ে উঠেছে।

গড়ের পশ্চিমদিকে গাজীতলা। ইটের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ইট দিয়ে বাঁধান সমাধি। দক্ষিণ দিকে প্রবেশ দ্বার। তার একপাশে অশোক আর মুচকুন্দ ফুলের গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। অপর পাশে বিরাট তেঁতুল গাছ। এই সমাধি গাজী সাহেবের। দরগার ফকির সাহেবের কাছ থেকে শোনা যায়—গাজী সাহেব ছিলেন পশ্চিম দেশের বিরাট নগরের লোক। শাহ সেকেন্দার বাদশাহের ছেলে। তার মায়ের নাম 'উজবাসুন্দরী'। পাতালপুর নামে এক গ্রামে গাজী সাহেবের ভাই ছিল। তাঁর পালিত পুত্র কালুগাজী বড়খান গাজীর প্রিয়পাত্র। বড়খান গাজীর পরিচয় পাওয়া যায় যশোহর-খুলনার ইতিহাসে। গাজী সাহেবের সমাধির উপর একখানা কালো মুড়ের পাথর আছে। তার পিঠে দুর্বোধ্য অক্ষরে কি লেখা আছে! অপর পৃষ্ঠে আছে খোদিত মূর্তি, যদিও তার কিয়দংশ এখন আর নেই। সুকুর নামে এক পাগল কিছু অংশ ভেঙে নিয়ে গেছে। যে অংশটুকু আছে, তাতে কালুগাজী আর চম্পাই বিবির পায়ের অংশ বিদ্যমান আছে। ইং ১৯৫৩ সালেও সম্পূর্ণ পাথরখানি অক্ষত ছিল। তাতে গাজী সাহেব ও চম্পাই বিবি দক্ষিণ রায় ও কালু গাজীর মূর্তি খোদাই করা ছিল। * চম্পাই বিবি ব্রাহ্মণডাঙ্গা বর্তমানে লাউজানি পূর্ব পাকিস্তানের ঝিকরগাছার নিকট রাজা মুকুট রায়ের কন্যা। বড়খান গাজী বলপূর্বক তাকে বিবাহ করেন। সে কাহিনী পূর্বে বিপ্লবী কালিচরণের কাহিনীতে বর্ণনা করেছি।

এখন এই সমাধি গাজী সাহেবের দরগা নামে পরিচিত। প্রতি বৎসর শ্রীপঞ্চমীর পর দিন এখানে বিরাট মেলা বসে। হিন্দু মুসলমান উভয়

---

* যশোহর খুলনার ইতিহাস ১ম খণ্ড ৩৮৩-৮৮ পৃঃ

সম্প্রদায় আজও দরগায় পূজা দেয়। মুরগী ছাগল বলি দেওয়া হয়। বহু-লোকের বাস ছিল এই গ্রামে। এখনও তাঁদের কারও কারও বংশাবলী কোন প্রকারে পূর্বপুরুষের ভিটে আঁকড়ে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করছেন। অতীতের কত কাহিনী তাঁদের মনের কোণে বাসা বাঁধে। কত সুখ সমৃদ্ধির কথা তাঁরা শোনেন বর্তমানের সঙ্গে তুলনা করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। যা হারিয়ে গেছে কালের মসীচিহ্নের তলে তা আর ফিরে আসবে না। এখন গড়ে উঠেছে নূতন সমাজ, নূতন বসতি, নূতন জীবনাদর্শ। মন্দির চত্বরে নামকীর্তন, রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করার পরিবর্তে এখন বেতার যন্ত্রে তাঁরা শোনেন কত গান কত বাজনা কত দেশ বিদেশের খবর নিজ নিজ ঘরে বসে। পূর্বের অনাবিল প্রাণস্পন্দনের ঐকতানের বদলে নিজের প্রাধান্য ও জীবনযুদ্ধে জয়লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। গোলাভরা ধান, পুকুর-ভরা মাছ আর গোয়ালভরা গরু এখন গ্রামবাসীদের নিকট স্বপ্নরাজ্যের সংবাদ। দেশ মাতৃকার স্বাভাবিক নদী নালা খাল বিল আজ আর দেশবাসীর তৃষ্ণা নিবারণ করেনা। পুকুর বা ইঁদারা আজ জলাভাব দূর করতে পারেনা। বসুমতীর অন্তস্থল ভেদ করে, মন্থন করে জল তোলা হচ্ছে যান্ত্রিক কৌশলে শুষ্ক মাঠের মাটি সরস করতে। উপরে সঞ্চিত জলের উৎস সংস্কার না করে বসুমতীর গভীরতম প্রদেশের জল টেনে তোলা হচ্ছে। হয়ত একদিন সে জলের স্তরও সরে যাবে দূরে বহু গভীরে মানুষের নাগালের বাইরে। তাই অতীত সুন্দর, বর্তমান বেদনাদায়ক, আর ভবিষ্যৎ চির-ঘোর অন্ধকারাবৃত প্রহেলিকা। শ্রীনগরের শ্রী আর ফুটবে না, মানুষ অন্য ভাবে গড়ে তুলবে নূতন নগর। সে মন্দির, সে দেবতা, সে আনন্দ আর মন-প্রাণ পুনরায় ফিরে আসবেনা। গ্রাম্য জীবনধারায় পূর্বের সমবায় ছিল প্রাণের ও মনের যোগাযোগে। এখন সমবায় আইনে। সে করণে অমান্য করার অধিকারও আজ আইনসঙ্গত। তাই সমবায় সমিতির অস্তিত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়না। গাজী সাহেব এখানে রাজবাড়ী প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসেন। শ্রীনগরে এরূপ দরগার অস্তিত্ব একাধিক দেখা যায়।

গোপাল ভাঁড়ের ভিটে পড়ে আছে রাজবাড়ির অনতিদূরে। রাজা স্থান ত্যাগ করার সময় তাঁর প্রিয় ভাঁড়কেও সঙ্গে নিয়ে যান। কবিগান গায়ক ও ঢুলিদেরও এখানে বসবাস ছিল। অনেকে এণ্টনি কবিয়ালের সঙ্গেও জুড়ি ধরত এবং সঙ্গত করত এরূপ অনেক কথাও শোনা যায়। ভোলা ময়রার ভিটে বলে একটা ভিটের অস্তিত্ব এখনও আছে, লোকে এণ্টনি ফিরিঙ্গীর জুড়িদার ভোলা ময়রা বলে দাবি করে। অবশ্য এর সত্যতা উদ্ধার

এখানে নিষ্প্রয়োজন।

রাজার হাতী ছিল একশত। যে বিলের ধারে হাতী বাঁধা থাকত তার নাম আজও হাতী বাঁধার বিল। এছাড়া শ্রীনগরে বহু পুকুর আছে তন্মধ্যে ময়রাপুকুর বেশ বড আর জলও আছে প্রচুর। সেই পুকুর পাড়েই কানাইবাবুর ভাই বাড়ি করে বাস করছেন। শ্রীনগর থেকে শিমুলিয়াকে বিচ্ছিন্ন করা যায়না। যদিও কাগজে তার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। দুটি গ্রামের মাঝে কোন প্রাকৃতিক সীমারেখা বা মাঠ কিছুই নেই। লোক বসতি পাশা-পাশি। শ্রীনগরের হাটখোলা পড়ে আছে, কিন্তু হাট আজ নেই। সেই হাট উঠে এসেছে শিমুলিয়ায় গত বাংলা ১৩৩০/৩১ সালে। কত অজানা কাহিনী লুপ্ত হয়ে গেছে শ্রীনগরেব শ্রীব সাথে। জঙ্গলে ঢাকা পড়েছিল কত স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি ঘর মন্দির। জঙ্গল পরিষ্কার হলেও সে কাহিনী উদ্ধার করা আর সম্ভব নয়। কালের গুরুভাব পাষানের তলায় যা চাপা পড়ে গেছে তা উদ্ধাব কবা সম্ভব নয়। শিমুলিয়ায় দুটি মন্দির আজও আছে ভগ্নদশায়। কত দিনের এ মন্দির তার কোন প্রমান মেলে না। শিমুলিয়া শ্রীনগর থেকেও বহু প্রাচীন গ্রাম। বহু মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সমবায় গড়ে উঠছে প্রয়োজনের তাগিদে, আইনের মাধ্যমে। সত্য, সারল্য ও সৌন্দর্য অতলে তলিয়ে গেছে। বোধ হয় নিবিড় মন্থনেও তা আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না। পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের ক্ষত বেড়েই চলেছে। অভাবরূপ কীটেব দংশনে মানুষ হাহাকার করছে হতাশায়।

১৫

ডুমা সরুইপুর

বনগ্রাম থেকে প্রায় আট মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ডুমা গ্রাম। এই গ্রামে যাওয়ার বর্তমানে দু'টি পথ। একটি বনগ্রাম থেকে রামনগর রোড নামে যে পথ বেড়িগোপালপুর গেছে সেই পথের পাশে পাঁচ মাইলের মাথায় আংরাইল গ্রাম। ঐ গ্রামের ভিতর দিয়ে দক্ষিণে গেলে গদাধরপুর পাশের গ্রাম। এই গদাধরপুর তিন দিকে বাঁওড বেষ্টিত। এই বাঁওডের নাম ডুমা বাঁওড। বাঁওড পার হতে নৌকা পাওয়া যায়। বাঁওড় পার হলেই পরপারে ডুমা।

আর একটি পথ চাঁদপাড়া থেকে যে পথ ঝাউডাঙ্গা পর্যন্ত গিয়ে রামনগর রোডের সঙ্গে মিশেছে সেই পথের ধারে দেড মাইলের মাথায় পথের বাঁপাশে একটা বিরাট বটগাছ আছে, প্রায় দেডশ' বছর আগে তুলসীর মা নামে এক মহিলা এই বটগাছটা প্রতিষ্ঠা করেন ও গোড়া বাঁধিয়ে দেন। এই গাছটাকে বলা হয় বাঁধা বটতলা। বাঁধা বটতলা থেকে একটা কাঁচা রাস্তা বাঁ দিকে চলে গেছে ডুমা পর্যন্ত—দু'মাইল। ঝাউডাঙ্গা পথের অনতিদূরে দেখা যাবে * চালুন্দিয়া নদী। এখন নদী বলে মনে হবে না -- একটা মজা খাল বিশেষ। এর মাঝে মাঝে পুকুর কাটাও হয়েছে। এ নদী একদিন এত প্রশস্ত ছিল যে পার হতে গেলে প্রায় একদিন সময় লাগত। তাই যাঁরা পারের যাত্রী হতেন তাঁদের চাউল আর হাঁড়ি (হাণ্ডি) নিয়ে নৌকায় উঠতে হ'ত। সে জন্যই এই নদীর নামকরণ করা হয়েছিল চাউল

* যশোহর খুলনার ইতিহাস পৃঃ ৩১৩

হাণ্ডিয়া। তার থেকেই অপভ্রংশে নাম হয়েছে চালুন্দিয়া। এই নদী গঙ্গার একটি শাখানদী ছিল। যমুনার সঙ্গে মিশেছে এ নদী। খাত পরিবর্তনের ফলে যে বাঁওড়ের সৃষ্টি হয়েছিল বর্তমানে সে বাঁওড় চালুন্দিয়া নামে পরিচিত।

ঐ পথ দু'টি ছাড়া আর একটা পথও আছে। সে পথটার সম্পূর্ণই কাঁচা। ঢাকাপাড়া উমুই এর মধ্য দিয়ে ডুমায় গিয়ে মিশেছে।

বর্তমানে ডুমার গুরুত্ব বিশেষ কিছু নেই বলেই মনে হয়। একটা কৃষি প্রধান গ্রাম। এই গ্রামের বর্তমান সকল অধিবাসীই হিন্দু। বাঁওড়ের তীরে কয়েকঘর ধীবর শ্রেণীর গৃহস্থ ও এক ঘর ব্রাহ্মণ পরিবার ছাড়া আর সকল অধিবাসীই বঙ্গভঙ্গের পর মুসলমানদের সঙ্গে বিনিময়সূত্রে ঐ গ্রামের অধিবাসী হয়েছেন।

ডুমা গ্রামের আয়তন আধ বর্গমাইল। ক্ষুদ্র গ্রাম, এর অতীত ইতিহাস রহস্যাবৃত হলেও গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্রাহ্মণ পরিবার এখনও বাস করছেন তাঁরাই বর্তমান গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা হলেও তাঁদের পূর্বেও এখানে জনবসতি ছিল। সে কাহিনী রহস্যাবৃত। যা জানা যায় তাতে দেখা যায় এ গ্রাম বহু প্রাচীন। বঙ্গদেশ মুসলমান কবলিত হওয়ার বহু পূর্বেও এই গ্রামে জনবসতি ছিল। বাঁওড়ের অস্তিত্ব দেখে বোঝা যায় এ গ্রাম তখন ইছামতী নদীর তীরে ছিল। খাত পরিবর্তনের ফলে বাঁওড় রেখে নদী সরে গেছে। গদাধরপুর গ্রাম এই নদীর খাত পরিবর্তনের ফলে উদ্ভুত।

বর্তমানে ডুমা গ্রামে যে ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করছেন তারা মুঘল আমলে এই গ্রামে আসেন। তারা রায়চৌধুরী উপাধিধারী। বেনাপোল অঞ্চলের কোন এক গ্রামের সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থের সন্তান জ্ঞাতি কলহে ভাগ্যান্বেষণে বাস্তত্যাগ করেন। ঘুরতে ঘুরতে এই জনমানবশূন্য জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামের সন্ধান পান। এখানে চারিদিকে সুগভীর গড়বেষ্টিত ভগ্ন প্রাসাদ-সদৃশ অট্টালিকার অস্তিত্ব দেখতে পান। বসবাসের উপযুক্ত স্থান মনে ক'রে সেই ভগ্ন অট্টালিকার পাশেই আবাস নির্মাণ করে বসতি স্থাপন করেন। কয়েকঘর ধীবর শ্রেণীর গৃহস্থ আর কয়েকঘর ঋষি সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিবেশী রূপে লাভ করেন। এই দখলি সত্ব থেকেই পরে ইছাপুরের রায়চৌধুরীদের কাছ থেকে তিনটি তৌজী বন্দোবস্ত করে নেন। কালক্রমে কয়েকঘর মুসলমান আশেপাশে এসে বসতি স্থাপন করে। অতীত ইতিহাস তাঁদের কাছে রহস্যাবৃতই থেকে যায়।

অতঃপর ১৮০৭ খ্রীঃ প্রমীলাভূষণ রায়চৌধুরীর পিতৃদেব পরিত্যক্ত ভগ্ন-গৃহের ইট কাঠ দিয়ে সেই ভিতের উপর একটা একতলা ইমারত নির্মাণ করান। রায়চৌধুরী পরিবার বর্তমানে সেই গৃহেই বাস করছেন। বৃটিশ আমলে প্রমীলাভূষণের পিতৃদেবের প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল।

প্রমীলাভূষণ গদাধরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ছিলেন দীর্ঘ-কাল। বর্তমানে তাঁর ভ্রাতা ও পুত্রগণ ঐ ভিটে আঁকড়ে আছেন।

এই গড়বেষ্টিত ভগ্ন অট্টালিকার পূর্বকাহিনী যা জানা যায় রায়চৌধুরী ও অন্যান্য গ্রামবাসীদের কাছ থেকে তাতে তাঁদের আসার পূর্বে ঐ ভগ্ন গৃহ পাঠান দস্যুদের আবাসস্থল ছিল। ঐ সুরক্ষিত দুর্গবিশেষ অট্টালিকায় থেকে তারা দস্যুবৃত্তি করত। শুধু তাই নয়, তাদের প্রভাবে আশপাশের বহু হিন্দু মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছিল। রায়চৌধুরী বাড়ির আশপাশে ও প্রাঙ্গণতলে যে পোড়ামাটির কারুকার্য পাওয়া যায় তাতে এ দুর্গ পালযুগের বলে অনুমান করার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

ডুমার পাশের গ্রামের নাম সরুইপুর। ডুমার বাঁওড়ের তীরেই এই গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের সকল অধিবাসীই মুসলমান ছিল বঙ্গভঙ্গের পূর্বে। বর্তমানে বিনিময়সূত্রে সকল অধিবাসীই হিন্দু কৃষক।

সরুইপুরের খন্দকার বংশ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। তাঁরা প্রতিবছর এক বিরাট মেলার অনুষ্ঠান করতেন। খন্দকার বংশের শেষ কর্তৃত্ব পড়ে মহম্মদ সরাফৎ খন্দকারের উপর। তিনি বিনিময় ক'রে গ্রাম ত্যাগ করেন সেই সঙ্গে গোটা গ্রামখানাই বিনিময় হয়।

ডুমা বাঁওড়ের দৈর্ঘ্য প্রায় নয় মাইল। এই বাঁওড়ের উভয় তীরেই জন-বসতি ও কৃষিক্ষেত্র। সরুইপুরে বাঁওড়ের ধারে একটা বিরাট বটগাছ আছে। সেই বটগাছটিই অতীত ইতিহাস সব গ্রাস করে ফেলেছে। কোন এক অজ্ঞাত দেবালয়কে ক্রোড়ে ধারণ ক'রে আজ এই বটগাছ তার সকল ঐতিহ্য লুপ্ত ক'রে মৌন সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই বটগাছকে কেন্দ্র ক'রে বসত চারিদিকে মেলা। বটগাছের পাশেই একটা মসজিদ সেটিও একটা অশ্বত্থ গাছে গ্রাস করেছে। তার পাশেই একটা দরগার ভগ্নাবশেষ। আজও হিন্দু মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের দু'একজন পুণ্যার্থী সেই অজ্ঞাত দেবতা বা রসুলের স্মরণে সেখানে যায়, মৌনতা ভঙ্গ ক'রে ধূপ দীপ জ্বেলে দেন তাঁদের আত্ম আবেদন নিবেদন করতে। সেই ভগ্ন স্তূপের উপর এখন দেবদারু গাছের বন। ছোটবড় অনেকগুলো দেবদারু গাছ জড়াজড়ি ক'রে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মানবের প্রয়োজন

মেটাতে দু'একটির জীবন বলিও হয়েছে দেখা যায়।

মসজিদ পাঠান যুগে নির্মাণ করা হয়েছিল। তার পূর্বে ওখানে ছিল মন্দির। এখন সেই মন্দির অজ্ঞাত দেবতাকে বুকে নিয়ে কিম্বা চ্যুত হয়ে বট বৃক্ষের অভ্যন্তরে সমাহিত হয়ে আছে। মসজিদও বর্তমানে অশ্বত্থ-বৃক্ষকে আশ্রয় ক'রে মন্দিরের পথ অনুসরণ করেছে।

এই দরগাকে কেন্দ্র ক'রে বসত বিরাট মেলা। প্রায় দশ বার হাজার লোকের সমাগম হত এই মেলায়। ছাগ, মুরগী বলি ও কোরবানী হত। বহু দূর দূরান্তর থেকে লোক ছুটে আসত, কেউ মেলার আকর্ষণে আবার কেউ বা ভক্তির টানে। বৈশাখ মাসের ১২ তারিখ থেকে এই মেলা বসত এবং চলত মাসাধিককাল। গাঁড়াপোতা গোবরাপুবের মেলা শেষ হলেই সেই মেলার সকল ব্যবসায়ীরা তাঁদের দোকানপাট নিয়ে আসতেন এই মেলায়। এক এক-প্রকার বিপণির এক একটা স্বতন্ত্র পট্টি। এ ছাড়া ছিল যাত্রা, ঢপ, কবিগান, তর্জার অনুষ্ঠানের স্থান। শেষের দিকে সার্কাসের দলও আসত। জুয়ার আড্ডা, আবগারী দোকান এমন কি বারবনিতার স্থানও ছিল এই মেলায়।

১৯৪৭ সালের পর হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হওয়ার পর খোন্দ-কার পরিবারের সঙ্গে যিনি বিনিময় করেন তিনি এই মেলার সম্পত্তির মালিক হন। তাঁর নাম অনুকুলচন্দ্র দাস। তিনি দরগায় মুসলমানের ইসলাম অনুষ্ঠানের পরিবর্তে রথ, ঝুলন, রাস, দুর্গোৎসব প্রভৃতি উৎসব অনুষ্ঠান করেন তিন চার বছর। তার পর বন্ধ হয়ে যায় অন্যান্য মেলার মত স্বাভাবিক কারণে। মেলার গুরুত্ব গ্রামবাসীদের কাছে কমে যায়। যে স্থানে মেলা বসত সে স্থান জুড়েই এখন কৃষিক্ষেত্র। বটগাছের স্তূপ আর তার উপর জঙ্গল। একদিন যে স্থান ছিল জনকোলাহলে মুখর, যেখানে অতীতে একদিন বাজত শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁজর পরবর্তীকালে সেখানে উঠত আজানের ধ্বনি। সে স্থান আজ নীরব নিস্তব্ধ। দেবতা নির্বাসনে কিম্বা সমাধিস্থ তার সকল স্মৃতি লুপ্ত। রসুলও হয়ত তাঁর ভক্তজনের সঙ্গে দেশান্তরিত। তবুও দু'এক জন পুণ্যার্থী যাঁরা আসেন তাঁর অতীতের স্মৃতি স্মরণ ক'রেই। সেই জাগ্রত সত্তার পরিচয়ও হয়ত তাঁদের বিশ্বাসের জোরে পেয়ে থাকেন। সরুইপুরে মেলার অনুষ্ঠান হলেও বোধ হয় ডুমার প্রভাব বেশী ছিল সেকারণে মেলার নামকরণ হয়ে থাকেবে ডুমার মেলা। ডুমার পাঠানদের চাপে পড়েই গ্রামের সকল লোকেই ধর্মান্তরিত হয়ে থাকবে। আর মন্দিরের অবলুপ্তি ঘটে থাকবে ঐ কারনেই। বর্তমানে গ্রাম-বাসীদের অনুমানকে ইতিহাস বলা যায় না, তবুও সঙ্গত কারণ ও নিদর্শন

দেখে এ অনুমানকে ভ্রান্ত বা অমূলক বলে অস্বীকার করার অবকাশ কম।

ডুমার রায়চৌধুরী বাড়ির চারিপাশে ছড়িয়ে আছে স্তূপীকৃত ইট। যে সকল স্থানে এখন চাষবাস হচ্ছে সে সকল স্থান থেকে ইট সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। কিন্তু তার নিচেয় আছে বৃহৎ প্রশস্ত ইটের ভিত্তি। বঙ্গভঙ্গের পর আগত ডুমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একটা পুকুর সংস্কার করান। সংস্কার করাত গিয়ে একটা জগন্নাথ মূর্তির ভগ্নাবশেষ পান। খনন কার্যের সময় ভেঙে ভেঙে ওঠার ফলে তিনি মূর্তির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করলেও গুরুত্ব দেননি বলে তার কোন চিহ্ন রাখেন নি। ঢেলা মাটির মতই ফেলে দেন। ঐ পুকুর পূর্বে যক্ষপুকুর নামে অভিহিত হত। কেউ ঐ পুকুর ব্যবহার করাত না। প্রাচীন সংস্কার আর কিংবদন্তীব জন্য এই মজাপুকুর—গ্রামবাসীদের ভয়ের কারণ ছিল।

রায়চৌধুরী বাড়ির চারিদিকে যে গড় ছিল তার পূর্ব অংশে এখনও গড়ের চিহ্ন বর্তমান। সেই গড়ের পূর্ব দিকে ডুমার হাট খোলা। হাট খোলায় দু'খানি দোকান ও একটা চাউল কল আছে। গডের দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে দু'টি পুকুর কাটা হয়েছে। চৌধুরী বাড়ির আশেপাশে যে ইট পাওয়া যায় তার মধ্যে অনেক নক্সা ও কারুকার্য খোদিত ইটও পাওয়া যায়। তাতে লতা ফুল প্রভৃতি বিভিন্ন চিত্র খোদিত। গ্রামবাসীদের ধারণা পাঠান-দের পূর্বে এখানে কোন হিন্দু রাজার প্রাসাদ ছিল। তাঁদের এ ধারণা অমূলক নয়। কয়েকখানি ইট যা সংগ্রহ করা গেছে তার কারুকার্য হিন্দু সংস্কৃতিরই স্বাক্ষর বহন করছে। এবং সে কারুকার্য পাল রাজাদের আমলের কারুকার্যের—সঙ্গে মিল বর্তমান। ইতিহাস হারিয়ে গেলেও দীর্ঘ প্রচেষ্টায় সম্ভবত অতীতের সে ইতিহাস কিছু উদ্ধার করা সম্ভব বলে আমার ধারণা।

বনগ্রামের আশেপাশের বহু অঞ্চল মহামারীতে একাধিক বার জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত মহামারীতেই ঐ গ্রামও জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। তারপর পাঠানরা ঐ সুরক্ষিত জনশূন্য দুর্গ সদৃশস্থানে আস্তানা গাড়ে। পাঠানদের পর মোগল আমলের শেষের দিকে রায়চৌধুরীরা আসেন। এই স্থানের প্রকৃত ইতিহাস বৃহত্তর প্রচেষ্টা ব্যতীত উদ্ধার করা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র কাহিনী আর কিংবদন্তীর উপর ভিত্তি করেই ইতিবৃত্ত করা সম্ভব নয়। কারণ নিদর্শন যেখানে বর্তমান আছে। তবুও একথা বলা যায় এখন কাহিনী আর কিংবদন্তী সম্বল করে আত্মতুষ্টি ছাড়া উপায় নেই। যদিও এক্ষেত্রে কাহিনী আর কিংবদন্তীর সঙ্গে বাস্তব নিদর্শনের বহুলাংশে সাদৃশ্য

বর্তমান।

ডুমা আর সরুইপুরের অতীত সমাজ ব্যবস্থা আর নেই। বর্তমানে নূতন ভাবে নূতন জীবনধারা গড়ে উঠেছে। বঙ্গভঙ্গের পর বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন লোক এসে এই গ্রামে বসবাস করছেন। তাঁরা আবার নূতন ভাবে নূতন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। রায়চৌধুরীদের বাড়ির পশ্চিম অংশের মুক্ত প্রাঙ্গণে জিবলি গাছ পোঁতা হয়েছে পনের বছর পূর্বে। এই গাছের তলায় এখন রক্ষাকালী পূজা হয়ে থাকে। এখানে গ্রামবাসীরা পালুনি অনুষ্ঠান পালন ক'রে থাকেন। অতীতের পঞ্চানন্দ পূজা এখন বন্ধ হয়ে গেছে যা পূর্বে রায়চৌধুরীদের দ্বারা পরিচালিত হ'ত।

ডুমা গ্রামের ধীবর শ্রেণীর অবস্থা শোচনীয়। বাঁওড় মৎস্যহীন হয়ে পড়েছে। ডুমা বাঁওড়ের মাছ এক সময় বনগ্রাম ও গোবরডাঙ্গার বাজার রক্ষা করত, বিশেষ করে খয়রা মাছ বিখ্যাত ছিল। আজ বাঁওড় জমিদারের হস্তচ্যুত হয়েছে। এখন সরকার এর মালিক। মৎস্য চাষও হচ্ছে আবার অত্যধিক বিষযুক্ত পাট পচানোর কাজও চলছে। ফলে বাঁওড়ে মৎস্য জন্মানো বা বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ইছামতী নদী ঐ একই কারণে মৎস্যহীন। মৎস্য চাষ ক'রেও কোন ফল হচ্ছে না। সেই সঙ্গে মৎস্য-জীবীদের অদৃষ্টও বাঁধা পড়েছে।

সঙ্গতিশালী কৃষক এ অঞ্চলে মেলে না। সারা মাঠ ধূ ধূ করছে। সরকারের গভীর নলকূপ এ অঞ্চলে নেই। দু'একজন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অগভীর নলকূপ বসালেও সঙ্গতিহীন। প্রসারিত কৃষিকাজ তাঁদের দ্বারা সম্ভব নয়। সে কারণে এ অঞ্চলের সমগ্র কৃষককুলই দারিদ্র্যপীড়িত এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। শিক্ষাদীক্ষায় এ অঞ্চল অনগ্রসর। দু'একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের নগণ্য সংখ্যক ছেলেরা কিছু শিক্ষালাভ করলেও মেয়েদের শিক্ষা গ্রাম্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর যাওয়া সম্ভব নয়। চাঁদপাড়া ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষালাভের অন্য উপায় নেই। সাড়ে তিন মাইল রাস্তা যার দুই মাইল কাঁচা এবং বর্ষাকালে যা দুর্গম সে পথে মেয়েদের পায়ে হেঁটে নিত্য যাতায়াত করা অবাস্তব ও অসম্ভব।

গ্রামবাসীদের মর্মবেদনার কথা কে বুঝবে? ভোটের সময় ছাড়া জন-দরদী মহাজনদের সাক্ষাৎ মেলে না, তখন অনেক আশার আলো তাঁরা দেখে থাকেন, তার পর যে তিমিরে সেই তিমিরে। গতানুগতিক জীবনধারায় অবগাহন ক'রে জীবনটাকে টিকিয়ে রাখতে যুদ্ধ করে চলেছেন ডুমা অঞ্চলের জনসমাজ। সেখানে ইতিহাসের অনুসন্ধান দেবে কে? মহকুমা শহর

থেকে অনতিদূরে থেকেও এত পশ্চাৎপদ অঞ্চল বড় দেখা যায় না।

পাট ভারতের অর্থনৈতিক ফসল। আর মাছ বাঙালীর প্রিয় ও প্রয়োজনীয় খাদ্য। পাট চাষ করেও কৃষককুল সর্বস্বান্ত। অপর দিকে পাটের জন্য জলাশয় ধ্বংস। সচেতন মন হোক বা অবচেতন মনই হোক বাঙালীর এ আত্ম-পীড়নের মূল্য কে দেয়! পরস্পর বিরোধী কার্যকারণে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে কি না সে চিন্তা করার দিন কি আজও আসে নি? নদী, খাল, বাঁওড়, বিল প্রভৃতি স্বাভাবিক জলাশয় লুপ্ত হওয়ার সীমায় এসে পৌঁছেছে। এ অবস্থায় বসুমতীর সঞ্চিত জল সিঞ্চন দীর্ঘ দিন চললে দেশ যে মরু প্রান্তরের বার্তা শোনাবে অচিরে তাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

১৫

ঝাউডাঙ্গা

বনগ্রাম থেকে আট মাইল পূর্বদিকে গেলে ঝাউডাঙ্গা। এখন পিচঢালা সড়ক শহীদ সত্যেন রোড? যাকে রামনগর রোড বলা হচ্ছে। ৯৬ সি, বাস যায় বনগ্রাম থেকে বেড়িগোপালপুর ঘাট। সেই পথের পাশেই পড়বে এখনকার এই ঝাউডাঙ্গা। একদিন ছিল ধনে জনে পূর্ণ একটা বিরাট গঞ্জ। ঝাউডাঙ্গা তার সবকিছু হারিয়ে বনজঙ্গলে সমাকীর্ণ শ্বাপদ-সঙ্কুল হয়ে দীর্ঘকাল আবার সুদিনের অপেক্ষায় পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে ছিল তার সকল গৌরব হারিয়ে। সেই ঝাউডাঙ্গাকে এখন দেখা যাবে নবরূপে নবভাবে গড়ে উঠতে।

বনগ্রাম শহর এমনকি বনগ্রাম মহকুমা উৎপত্তির বহু পূর্বে ঝাউডাঙ্গা ছিল একটা বিরাট গঞ্জ। এই গঞ্জের পশ্চাদ্ভূমি ছিল বিরাট এলাকা জুড়ে। আশপাশে তখন এমন আর একটি গঞ্জ বা শহর ছিল না যা এতদ্ অঞ্চলের অধিবাসীর চাহিদা মেটাতে পারে। কলিকাতা নগরী প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঝাউডাঙ্গার বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন হয় কলিকাতার সঙ্গে। তখন পথ ঘাট উন্নত ছিল না আর যানবাহন বলতে গরুরগাড়ী আর পাল্কি। ফলে জলপথই তখন ছিল সুবিধাজনক। বড় বড় নৌকা করে কলিকাতা থেকে মাল আমদানি হত এবং ঝাউডাঙ্গা থেকে রপ্তানি হত। ইছামতী নদী ঝাউডাঙ্গার থেকে কিছুটা সরে গেছে। এখন এই ইছামতীর পরপারে ভিন্ন-রাষ্ট্র বাংলাদেশ। নদী পথে এখন আর মাল পরিবহন করা হয়না সুতরাং

অধুনা সীমান্ত সমস্যা সঙ্কুল নদীর প্রয়োজন কমেছে।

অতীতে যখন গঞ্জ ছিল তখন এখানকার অধিবাসীদের সংখ্যা কিছু পাওয়া যায়না তবে শতাধিক বৎসর পূর্বে অর্থাৎ উনবিংশ শতকের শেষের দিকে জনসংখ্যা ছিল সাহা ৬১০ ঘর, নাথ ৮ ঘর, কলু ২২ ঘর, মালো ১৩ ঘর, ঋষি ১৪ ঘর, বাগদীদের যাজকতা করেন এরূপ ব্রাহ্মণ ৩ ঘর, কাপালি ৬ ঘর পশ্চিমা ব্রাহ্মণ ১ ঘর, মুসলমান ৪০ ঘর, গোপ ১০ ঘর, ধোপা ২ ঘর, পরামাণিক ১ ঘর, মুসলমান তাঁতী বা জোলা ১৪ ঘর। আর ছিল মালের বাস ৩০০ ঘর এবং নটী ৩৫ ঘর। এ ছাড়া ছিল কাবুলী আস্তানা, মদ ও গাঁজা, আফিঙের দোকান। ১৯৪৭ খৃঃ ঝাউডাঙ্গার জনবসতি ছিল মাত্র ৪০ ঘর।

ঝাউডাঙ্গার পুর্ব পরিচয় যা পাওয়া যায় তাতে তখনকার দিনে একটা গঞ্জের পক্ষে যা যা প্রয়োজন প্রায় সব কিছুই ছিল। গোবরডাঙ্গার জমিদারের কাছারি ছিল এখানে, তাছাড়া চাতরার জ্ঞান মিত্রের কাছারিও ছিল। প্রজাপীড়ন খাজনা আদায় ছাড়া প্রজার স্বার্থে জমিদারের করণীয় তখন কিছুই ছিল না। ঝাউডাঙ্গায় কুঠির মাঠ আছে ফলে এখানকার চাষীদের নীল যন্ত্রণায় জ্বলতে হয়েছে। সে জ্বলা যন্ত্রণার পরিচয় দেওয়ার আর কেউ নেই। এই গঞ্জের পশ্চাদ্ভূমি ছিল সুদূর প্রসারী। কৃষিজাত পণ্য রপ্তানির জন্য যোগান আসত সেই পশ্চাৎভূমি থেকে আর আমদানি হত বিভিন্ন জিনিস ঐ বিরাট এলাকার চাহিদা অনুযায়ী। কলিকাতা থেকে নিত্য আসত পণ্যসম্ভারে পূর্ণ বৃহদাকারের তরণী। দু'বেলা নিত্য 'ট' বাজার বসত রাত দশটা পর্যন্ত, গঞ্জের বাজার সরগম থাকত। ঝাউডাঙ্গায় যাত্রার দল ছিল। বারোয়ারী দুর্গা কালী পূজা হত। সেই উপলক্ষে যাত্রা, কবিগান, চপ ইত্যাদি হত।

বাংলা সন ১১৭৬ সালে অজন্মা এবং ভয়াবহ মন্বন্তরে ঝাউডাঙ্গা ও তার পশ্চাৎভূমির বহু অধিবাসী মারা যায় এবং অনেকে দেশত্যাগ করেন। তারপর দেখা দিল মহামারী। এ রোগ এ অঞ্চলে পূর্বে ছিল না, ফলে কলেরার আক্রমণে প্রতিবছর অসংখ্য লোক মারা যেতে লাগল। চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, চিকিৎসক কোথায়। রামনগরে হাতুড়ে ডাক্তার ভূধর মুখোপাধ্যায়— তাঁর সাধ্য বা কতটুকু।

ক্রমশঃ জনহীন গ্রামগুলি জঙ্গলে পূর্ণ হতে থাকল, সেই সঙ্গে দেখা দিল ম্যালেরিয়া। ঝাউডাঙ্গার গঞ্জ জনহীন হয়ে গেল। গ্রামের জমি পড়ে থাকে অনাবাদী। যাঁরা প্রাণে বেঁচেছিলেন তাঁরা কোনপ্রকারে দিন গুজরান

করা ছাড়া আর কোন আশার আলো দেখেন নি। ঝাউডাঙ্গার আশ-পাশের অধিকাংশ গ্রামেই মুসলমানের বাস ছিল। অনেক গ্রামে হিন্দু ছিলই না। শিক্ষার ব্যবস্থা বলতে দু'একটা গ্রামে গ্রাম্য পাঠশালা। ক্রমে তা প্রাথমিক মক্তব এই নামে নামকরণ করা হল। বৃটিশ শাসনকালে অবহেলিত গ্রাম, জমি আছে ফসল ফলে না আর যা উৎপাদন হয় তার দাম কোথায়!

বনগ্রামের উৎপত্তি হল। মহকুমা শহররূপে তার গুরুত্ব বাড়ল। সুতরাং পূর্বের গঞ্জ ব্যবসায় কেন্দ্রেরও গুরুত্ব কমে গেল। ঝাউডাঙ্গার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। রাস্তাঘাট নেই বন জঙ্গলের আড়ালে যাঁরা বাস করতেন নিরুপায় হয়ে, তাঁদের কথা চিন্তা করার আর কেউ থাকল না। বড় বড় আম কাঁঠালের বাগান, গাছের ফল গাছে পাকে, ঝরে পড়ে। আম বাগান জঙ্গলে ঢাকা। বাঘ বুনোশুয়োরের আবাসস্থল। কে যায় আম বাগানে আম পাড়তে। দিনের আলোয় পথ চলতে হত ভয়ে ভয়ে। কখন বাঘ বা বুনো শুয়োর আক্রমণ করে! ১৯৪৯ সালেও বাঘ আর বুনো শুয়োরের লড়াই দেখেছেন, যাঁরা বঙ্গ বিভাগের পর এ অঞ্চলে বাস করার জন্য এসে নূতন বসতি গড়েছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর উদ্বাস্তু আগমনের ফলে আবার এই অঞ্চল জনবসতিতে ভরে উঠল। শশা-ডাঙ্গায় হিন্দুর বাস বেশী ছিল, তবে ঝাউডাঙ্গা, পিপলে, কাউন্তে, পাঁচপোতা, শুটে, বারাসাত প্রভৃতি গ্রামের মুসলমানরা সম্পত্তি বিনিময় করে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশে চলে গেলেন। আজ সে সকল গ্রামে বনজঙ্গল দেখা যায় না, প্রাচীন আম গাছের আর খোঁজ মেলে না। আম কাঁঠালের গাছ আবার জন্মাচ্ছে, নব গৃহস্থেরা রোপণ করছেন। তবে সে আম্রকানন আর দেখা যায় না। মাঠের কোন অংশই আর অনাবাদী নেই। সরকারী সেচ ব্যবস্থা আজও এ অঞ্চলে হয়নি। যাঁদের কৃষিই সম্বল তাঁদের কেউ কেউ অগভীর নলকূপ ও ডিজেল ইঞ্জিন চালিত পাম্প কিনে-ছেন। সেই ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থায় আধুনিক চাষ হচ্ছে। যাদের সে সঙ্গতি নেই তারা যাদের আছে তাদের কাছ থেকে সেচের সাহায্য নিচ্ছেন। এইভাবে চাষ হচ্ছে। এ অঞ্চলের মাটি বেলে দো-আঁশ সে কারণে আমন ধানের জমির পরিমান কম। পাট, আউস ধান এবং রবিফসল হয়ে থাকে। তবে বৃহদায়তন সরকারী সেচ ব্যবস্থা হলে উৎপাদনের দিক থেকে ভালই হত। অনেক কৃষক উপকৃত হতেন।

আজ ঝাউডাঙ্গার শ্রী ক্রমশঃ বৃদ্ধি হচ্ছে। পিচঢালা সড়কের দুধারে

ইমারত গড়ে উঠেছে এবং উঠছে। দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকাও দেখা যায়। আবার দোকান পসার গড়ে উঠেছে। মুদীর দোকান, মনোহারী দোকান কাপড়ের দোকান, ধান ভাঙ্গানো কল। আড়ৎ গুদাম ইত্যাদির প্রসারও ঘটছে। জন বসতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রয়োজনে গডে উঠেছে উচ্চ বিদ্যালয় সরকারী আনুকূল্যে। সকল সময় এখন ঝাউডাঙ্গা জনরবে মুখর হয়ে উঠছে। যন্ত্র দানব এখন গ্রামের বুক কাঁপিয়ে ছুটে চলে লোকজন মাল পত্র নিয়ে এদিক থেকে ওদিকে। সকলে কর্মব্যস্ত। এখন এ অঞ্চলে শিক্ষার প্রসার ঘটছে। রাজনীতির থেকে দূরে থাকার সাধ্য এখন গণতন্ত্রের যুগে কারও নেই। ভোটাভুটির উত্তাপ স্পর্শ করতে সকলেই চান। ফলে মত ও আদর্শের পার্থক্য নিয়েই গ্রাম্য সমাজ এখন গডে উঠছে। ঝাউডাঙ্গা তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। মত ও আদর্শের ভিত্তিতেই এখন গ্রাম্য সমাজ গড়ছে। পূর্বের সমাজব্যবস্থা এখন কেউ চায়না সুতবাং বর্ণাশ্রম ধর্মের বর্ণবৈষম্য এখন রাজনৈতিক বৈষম্যেই প্রকট। এখন গ্রাম সহব থেকে দূবে নয়। যাতায়াতেব ব্যবস্থা পরিবহন ব্যবস্থায় শহর গ্রামের নিকটে এসেছে এছাড়া গ্রামেব ঘরে ঘরে বাজে বেতার যন্ত্র। তাতেও মানুষ অনেক সচেতন হয়েছে। সুদূব গ্রাম অঞ্চলেও নিত্য সংবাদপত্র পৌছে যাচ্ছে।

ঝাউডাঙ্গার 'মাল' সম্প্রদায়ভুক্ত আব এক জনকেও দেখা যায় না। যাদের পেশা ছিল বাঁদর নাচানো। আর বাইসস্কোপ দেখান। এদের কর্মকেন্দ্র ছিল বহুদূর বিস্তৃত। যশোহব খুলনাব সকল অংশ আর বর্দ্ধমান বিভাগ জুডে। দক্ষিণে কলিকাতা ও ২৪ পরগণা। নদীযা মুর্শিদাবাদ সব-স্থানেই এদের ঘুরে বেডাতে দেখা যেত রুজির সন্ধানে। এখনও যারা বাঁদর নাচায় তাদের জিজ্ঞাসা করলে বলে আগে বাড় ছিল ঝাউডাঙ্গায়। এখন এরা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অনেকেই মারা গিয়েছিল মহামারী ও ম্যালেরিয়ায় ভুগে।

তাঁতীদের তাঁত ছিল। কাপড় গামছা, চাদর, ইত্যাদি বুনত তাঁতীরা। চাষীরা বাঁশের ও বেতের ঝুড়ি, কুলো, ধামা ইত্যাদি গড়ত। বিভিন্ন উৎসবে তারা ঢাক ঢোল কাঁশি বাজাত, সানাই বাজাত বিবাহ অন্নপ্রাশনে। অতীত বর্তমানের প্রবহমান ধারারই স্বাক্ষর এ গ্রাম। প্রাচীন কৃষি আর নবোত্তর উন্মেষে কিন্তু থেকে গেছে ধনবৈষম্যের ব্যবধান। মুষ্টি-মেয়কে সেবা করতেই সমবেত সমষ্টির প্রচেষ্টা। গরীব আতুরের পাশেই বিত্তবান অর্থসৌভাগ্যশালীদের শোষণ, বিলাস অবাধ গতিতে পূর্বাপর প্রবাহিত।

১৭

শ্রীমন্তপুর

পাল্লার ভিতর দিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা সোজা পূর্বদিকে গিয়েছে। পাল্লা গ্রাম পার হয়ে একটা মাঠ অতিক্রম করলে যে ছোট্ট সবুজ গ্রামখানা দেখা যাবে সে গ্রামের নাম শ্রীমন্তপুর। পাল্লা থেকে এর দূরত্ব এক মাইলের মধ্যে। পথটি শ্রীমন্তপুরের ভিতর দিয়ে সোজা কালুপুরে যশোহর-কলিকাতা রাস্তায় মিশেছে।

গ্রামের প্রবেশ পথেই নবাগত আদিবাসীদের বসতি। সকলেই কৃষিজীবী বা কৃষিশ্রমিক। গ্রামের শতকরা আশি ভাগই আদিবাসী, অবশিষ্টরা বিলের পূর্ব-দক্ষিণে বাস করেন। গ্রাম উৎপত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের আগমন ঘটেছিল। এছাড়া কুড়ি-পঁচিশ ঘর পৌণ্ডক্ষত্রিয়, আট দশ ঘর মুসলমান, কায়স্থ তিন ঘর এবং দশ ঘর ব্রাহ্মণ বাস করছেন এই গ্রামে। একশত একর জুড়ে এই গ্রামখানার কেন্দ্রস্থলেই প্রকাণ্ড বিল। বিলের পাড়েই জনবসতি। বাড়ি ঘর দালানকোঠা থেকে পর্ণকুটির পর্যন্ত দেখা যাবে। বিলে আবাদ ভালই হয়। সেকারণেই গ্রামের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।

নীলকর সাহেবদের সুবাদেই এই গ্রামের পত্তন। এই গ্রামের বর্তমান ভাদুড়ী বংশের প্রথম পূর্বপুরুষ নীলকর সাহেবদের কেরাণী হয়ে বরেন্দ্রভূমি থেকে এসেছিলেন এই অঞ্চলে। এই গ্রামেই তাঁরা বসতি স্থাপন করেন। গ্রামের চারপাশের মাঠের উর্বর ভূমিতে নীলচাষ হ'ত। গ্রামের পূর্বদিকে অধুনা মাতলা বিলের ধারে আজও নীলকর সাহেবদের বিরাট চৌবাচ্চা পড়ে আছে। একদিন মাতলা নদী ছিল। চূর্ণী নদীর শাখা চৈতের খালে যুক্ত

হয়ে যমুনা নদীর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করত। এই নদী একদিন গোপাল-নগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর একটি ছোট নদী মাতলা ও ইছামতীর সংযোগ রক্ষা করত। এই নদীটির নাম জোঁকা। অত্যধিক জোঁক এই নদীতে ছিল বলে এর নামকরণ করা হয়েছিল জোঁকা। মাতলা নদীর পাড়ে শুল্কা, দুর্গাপুর প্রভৃতি গ্রাম অপর পারে হানিডাঙ্গা। মাতলার জলই একদিন গ্রামবাসীর পানীয় জল যোগাত। এখন তা কল্পনা করা যায় না। ১৯৩৮ সালে ভাদুড়ী বাড়ি ইঁদারা কাটাতে গিয়ে ১৮ হাত নীচেয় নৌকার মাথা-ভাঙা কাঠ পাওয়া যায়।

কালক্রমে আত্মীয়তাসূত্রে এই গ্রামে এলেন চক্রবর্তী, সান্যাল এবং রায়েরা। নীলকর সাহেবদের কর্মচারীরা সর্বত্রই সম্পদশালী হয়েছিলেন সুতরাং ভাদুড়ীরাও সম্পদশালী জমিজমার মালিক হয়েছিলেন। পঁচাত্তর খানা ঘরযুক্ত চক মেলান বিরাট ত্রিতল অট্টালিকা ছিল ভাদুড়ীদের। দেওয়ালে পঙ্খের কাজ করা। ভাদুড়ীদের রবদবও ছিল খুব। সেই বাড়ি একদিন বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে বিষ্ণু ভাদুড়ীর পিতৃদেব অনাথবন্ধু ভাদুড়ী কিছু অংশ বাসের উপযোগী করেছেন। অনাথবাবু কলিকাতায় বার্মাসেলের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। 'সেই গৃহেই তাঁর পুত্রেরা বাস করছেন।

ভাদুড়ীদের প্রতিষ্ঠিত শিবকে কেন্দ্র করেই গ্রামের চড়ক উৎসব হয় প্রতি বৎসর নিষ্ঠার সঙ্গে। এই শিবের জাগ্রত সত্তার কথা শোনা যায়। অনাথ ভাদুড়ীর পিতৃদেব ছিলেন গেষ্টকিন কোম্পানির একজন পদস্থ কর্মচারী। গ্রামের বাড়ি ছেড়ে তিনি কলিকাতায় প্রবাসী হন।' শিবের দায়িত্ব থাকল তাঁর এক জ্ঞাতি খুড়া রমাপদ ভাদুড়ীর উপর। ক্রমে তাঁর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটল। শিব হয়ে উঠলেন তাঁর বোঝাস্বরূপ। সুতরাং তিনি শিবকে বিসর্জন দিয়ে এলেন শান্তিপুরে গঙ্গায়। ঘটনাচক্রে সেই শিব উঠলেন এক ধীবরের জালে। সেই ধীবরই হলেন শিবের সেবায়েত। এদিকে রামপদ ভাদুড়ী শিবকে এভাবে বিসর্জন দেওয়ার অপরাধে দুরারোগ্য কুষ্ঠ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন।

অনাথবাবুর পিতৃদেবের অবস্থা তখন ফিরেছে। তিনি তখন একজন পদস্থ কর্মচারী হয়েছেন। বার্ষিক চড়ক উৎসব গ্রামের বাড়িতে এসে করার কথা তাঁর মনে হল। ব্যবস্থা ঠিক হল। বাড়ি ঘর পরিষ্কার করা হল। সন্ন্যাসীরা সকলে নিষ্ঠার সঙ্গে কৃচ্ছসাধন করছেন নেল পূজার জন্য। নীল-পূজার পূর্বরাত্রে অনাথ বাবুর পিতা স্বপ্ন দেখলেন, 'আমার জন্য চড়ক করছিস,

আমি কোথায় ?' তার পর স্বপ্নেই তিনি ঐ শিবের অবস্থিতির কথা জানতে পারেন। পরদিন তাঁর তরুণ পুত্র অনাথবন্ধুকে পাঠালেন শিবকে আনার জন্য। সেই ধীবর কিছু অর্থের বিনিময়ে শিবকে প্রত্যর্পণ করল অনাথবন্ধুর হাতে। সেই শিব নিয়ে এসে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা হল ধুমধামের সঙ্গে। বিষ্ণু বাবু বলেন, 'ঐ শিবই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন।' এখন শিবের নিত্য পূজা হয়। প্রতি বৎসর চড়ক উৎসব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়ে থাকে। এই উৎসবে ছাগ বলি দেওয়া হত। কয়েক বৎসর হল বলি বন্ধ হয়ে গেছে। সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেউ অনাচার করলে শিব শয়ালের মাধ্যমে তা জানিয়ে দেন। এই ভাবেই বলির বাধার কথা জানান শিব। যার ফলে বার বার খড়্গাঘাত করেও পরপর দু'বছর ছাগ-শিশু বলিদান সম্ভব না হওয়ায় বলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চড়ক উপলক্ষে একটা ছোট মেলা বসে শ্রীমন্তপুরে। গ্রাম্য উৎসবের মধ্যে এই উৎসব বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করে গ্রামবাসীদের। পূর্ব বঙ্গ থেকে আগত নবনিযুক্ত পুরোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শিব পূজায় অনাচার ঘটানোর ফলে তাঁর বাসগৃহ পুড়ে যায়, নিজেও অগ্নিদগ্ধ হন। বর্তমানে তাঁর পুত্র নিষ্ঠার সঙ্গে শিবের পূজা করে থাকেন। এছাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব ও কালীপূজাও অনুপ্রবেশ করছে গ্রামবাসীদের মধ্যে।

শ্রীমন্তপুরের চক্রবর্তীরা এক সময় সম্পদশালী হয়েছিলেন। এখন তাদের দৈন্যদশা। বৃহৎ অট্টালিকার সবই ভগ্নস্তূপে পরিণত। বর্তমানে অনিল চক্রবর্তী মাত্র পূজার দালানটিকেই টিকিয়ে রেখেছেন। সেই বিরাট পূজার দালানটাই এখন কয়েকটি কক্ষে রূপান্তরিত করে বাস করছেন।

সান্যালদের কেউ আর এখন গ্রামে নেই। বৃহৎ অট্টালিকা ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়ে অতীত স্মৃতি রোমন্থন করছে। তার সকল ইতিহাস অনন্ত কালের গহ্বরে সমাহিত।

শ্রীমন্তপুরের পূর্বের শ্রী কিছুই আজ নজরে পড়বে না। পুকুরগুলি পাঁক আর দামে পূর্ণ। একটি সংস্কার করে মৎস্য চাষ করেছিলেন কেউ কেউ। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় গ্রাম্য দলাদলি ও হিংসা এমন চরমে পোঁচেছে যে বিষ প্রয়োগ করে একাধিকবার মৎস্য নিধন ঘটানো হয়। সে কারণে পুকুর সংস্কারে কারও উৎসাহ আর নেই। পুকুরের মত সম্পদ একাধিকও যাঁর আছে তিনিও দারিদ্র্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে কালসাগরের ঢেউ গুণছেন।

গ্রামের পুকুরগুলির মধ্যে গোঁসাই পুকুরটিকে দীর্ঘ বললেও অত্যুক্তি হয় না। শীতকালেও জলে টল টল করে। ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যানের ন্যায়

ঐ দীঘির কাহিনী। শান্তিপুরের গোসাই কন্যার বিবাহ হয় শুষ্ক গ্রামে। তিনি এটা তার নির্বাসন দণ্ডবলে দুঃখ প্রকাশ করায় তাঁর পিতা এই দীঘি কাটান, কন্যার জল-কষ্ট দূর করার জন্য। এখন ঐ দীঘি দাম [illegible] মজে যাচ্ছে। দীঘি মৎস্য হীন। ভাদুড়ীরাই এই দীঘির মালিক ছিলেন। একাধিক বার হস্তান্তরিত হতে হতে বর্তমানে মালিক হয়েছেন গ্রামেরই একজন নবাগত অধিবাসী। গ্রীষ্মে অনেক পুকুরই প্রায় শুকিয়ে যায়। বিলের ধারে বিষ্ণুবাবুর পুকুর। পুকুরের বাঁধা ঘাটের ইট মাত্র আধ ইঞ্চি পুরু। চুন সুরকি দিয়ে গাঁথনি আজ তিনশ' বছরেও দৃঢ় হয়ে আছে। ইট ক্ষয়ে গর্ত হয়ে গেছে।

গ্রামের পুরোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চালাঘরে কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ ছাড়া গ্রামের মন্দিরের কোন অস্তিত্ব নেই। কালুপুরের পথের ধারে মজারখোলা, তার পাশেই একটি পাকা দরগা ছিল অশ্বত্থ গাছের তলায়। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় ঐ দরগায় দুধ ও জল দিতেন। সন্ধ্যায় বাতি ও প্রদীপ জ্বেলে নিজেদের ও গ্রামের মঙ্গল কামনা করতেন। বঙ্গভঙ্গে আগত এক ব্যক্তি বিনিময়সূত্রে মালিকানা দাবী করে বৃক্ষছেদন ও দরগার বিলোপ সাধন করেছেন। এ নিয়ে মামলা মোকদ্দমাও হয়েছে। পরিণতি বেদনা দায়ক। মালিকানার দাবীদার এখন দৈন্য দশায় দিন কাটাচ্ছেন। অশ্বত্থ বৃক্ষের ছেদনকারী এখন পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী, দরগার এই পরিণতিতে গ্রামের আপামর জনসাধারণ অত্যন্ত ব্যথিত। মজারখোলার অনতিদূরেই গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়। দরগার অপর পাশেই মুসলমান পাড়া। এখন একে পাড়া বলা যায় না। আট দশ ঘর লোক কোন রকমে টিকে আছে। একদিন যারা সম্পন্ন চাষী ছিল, তারা ক্ষেতমজুরে পরিণত। জমিজমা সবই প্রায় হস্তান্তরিত। শোনা যায় এর জন্য কোন শোষণ বা চক্রান্ত অপেক্ষা তাদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ও আলস্যই এর জন্য দায়ী।

ছোট গ্রাম অধিবাসীর সংখ্যাও সীমিত। আদিবাসী সকলের অবস্থাই সঙ্গীন কোন প্রকারে টিকিয়ে রাখার মত। অনেক দিন অনেকেরই হাঁড়ি চড়ে না। মধ্যবিত্ত যাঁরা তাঁরা টিকে থাকার জন্য লড়াই করছেন। রাজনীতি সমাজনীতি সবই এখন সাময়িক উত্তেজনা। জীবনযন্ত্রণাবোধের তলায় সকল নীতিই আশ্রয় নিয়েছে। মধ্যবিত্তের প্রভাব সমগ্র জনজীবনকে প্রভাবিত করছে। সুতরাং মত পথ চিন্তা করার স্বাধীন সত্তার কোন মূল্য তাঁদের নেই। নির্বাচনকে সাময়িক একটা চাঞ্চল্য তাঁরা মনে করেন। সেই মতই তারা মতামত ব্যক্ত করতে এখনও অভ্যস্ত। এ জনগণের প্রবহমানতার কোন ইতিহাস নেই। জীবন আর মৃত্যুই এঁদের ইতিবৃত্ত রচনা করে চলেছে।

১৮

ঠাকুরনগর

বনগ্রাম থেকে শিয়ালদহ রেল লাইনের মাঝে দ্বিতীয় স্টেশন। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এখানে কোন স্টেশন ছিল না। বঙ্গ বিভাগের পর যাঁরা উদ্বাস্তু হলেন তাঁদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনেই ঠাকুরনগরের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রমথরঞ্জন ঠাকুর যিনি পি, আর, ঠাকুর নামেই সুপরিচিত তাঁরই প্রচেষ্টায় আজকের এই ঠাকুরনগর। উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য তখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লোক বিনিময় করার দাবি তোলেন পি, আর, ঠাকুরও তাঁর সহযোগী ছিলেন। কিন্তু ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, যিনি প্রথমে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদে মনোনীত হলেন তাঁর প্রবল বাধার ফলেই পাঞ্জাবের মত বাংলা দেশে লোক বিনিময় হল না। ফলে তার যে দুর্ভোগ তা আজও চলছে এ কথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবেন! বাঙ্গালী জাতির আজ এক বিরাট অংশ যাযাবর এবং বিপথ ও কুপথগামী। পথে প্রান্তরে, রেল প্লাটফর্মে, দীর্ঘ ত্রিশ বছর জীবন কাটাচ্ছে মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে।

বর্তমানের ঠাকুরনগরের পূর্ব নাম ছিল চিকনপাড়া। তখন ওখানে ছিল কিছু আবাদী জমি আর ঝোপ, ঝাড়, জলা জঙ্গল। পি, আর, ঠাকুর এই স্থানটি বসতি গড়ার জন্য নির্বাচন করলেন। কিন্তু একটা কলোনী গড়ার দায়িত্ব একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয় জেনেই একটা কোম্পানী গঠন করলেন তার নাম হল 'ঠাকুর ল্যাণ্ড এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড'। ঠাকুরের অনুগত লোকের অভাব কোনদিনই নেই। গড়ে

উঠল জন বসতি। কিন্তু তার পথ ঘাট, যাতায়াত এসব কিছুরই প্রয়োজন। সর্দার প্যাটেল ঠাকুরকে বলেছিলেন "spread any where you like" সুতরাং তখন তার জমি দখল ক্ষেত্রে বাধা বিপত্তি যা এসেছিল তদানীন্তন জমিদার কলিকাতা নিবাসী শরৎকুমারী দাসী ও তাঁর স্বামী গোপেশ্বর দত্তের দিক থেকে, তা প্রতিরোধ করতে ঠাকুরের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। কৈলাশনাথ কাটজু তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। পি. আর. ঠাকুর তখন বিধানসভা সদস্য। সুতরাং বনগ্রামের মহকুমা শাসক নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও রেলওয়ের চিফ্ সেক্রেটারী সুকুমার সেনের আনুকূল্য লাভ করা তাঁর পক্ষে কষ্ট সাধ্য ছিল না। ফলে ঠাকুরনগর স্টেশন স্থাপিত হল। এখন সেখানে স্কুল, হাসপাতাল, ক্লাব, পিচের সড়ক অন্যান্য স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা কিছুরই অভাব নেই। দোকান পসার, বাজার, ক্লাব নাগরিক জীবনের প্রয়োজনীয় প্রায় সব কিছুই এখন সুলভ হয়েছে। অধিবাসীরা এখন অনেকেই চাকুরিজীবী।

যে ঠাকুরের প্রচেষ্টায় ঠাকুরনগর, তাঁদের পরিচয় যা জানা যায় ঠাকুরের কাছ থেকে, তার উল্লেখ প্রয়োজন। তাঁদের পূর্বের বাড়ি ছিল ফরিদপুর জেলায় গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ওড়াইকান্দি গ্রামে। পি. আর. ঠাকুর-এর একাদশ পুরুষ পূর্বে শ্রীশ্রী রামদাস মিশ্র (মৈথিলী ব্রাহ্মণ) মিথিলা থেকে বাংলায় আসেন রুজির তাগিদে। তিনি নমঃশূদ্রদের মধ্যেই বসবাস করতেন। ফলে তদানীন্তন ব্রাহ্মণ সমাজ অবাঙ্গালী এই ব্রাহ্মণকে পরিহার করে চলত। ফলে বাধ্য হয়ে তিনি তাঁর পুত্র চন্দ্রমোহনের বিবাহ দেন রাজলক্ষ্মী নামে এক নমঃশূদ্র কন্যার সঙ্গে। ব্রাহ্মণকে সাধারণ গ্রাম বাংলার ব্রাহ্মণেতর জাতি ঠাকুর বলেই সম্বোধন করে থাকে। এখনও এ রেওয়াজ সম্পূর্ণ যায়নি। সেই থেকে ঠাকুর উপাধির অধিকারী হযে আসছেন ঠাকুর বংশ। এই বংশের অষ্টম পুরুষ কৃষ্ণদাস ঠাকুরের পুত্র শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর কেবল অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন পরম যোগী ভগবৎভক্ত ও ঐশী শক্তির অধিকারী। তাঁর পুত্র শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরও পিতার ন্যায় শক্তিধর পুরুষ ছিলেন। ফলে তাদের আকর্ষণে সহস্র সহস্র মানুষ বিশেষ করে নমঃশূদ্র সমাজ আকৃষ্ট হন। তাঁদের বাণী ও লীলা সমৃদ্ধ মহাভারতের ন্যায় বৃহৎ দু'খানি কাব্যগ্রন্থ এখনও তাঁদের মহিমার উজ্জ্বল নিদর্শন। পল্লী কবি তারকচন্দ্র সরকার এই গ্রন্থ দুইখানি রচনা করেন। হরিগুরুর সেই আকর্ষণ আজও সমভাবেই বর্তমান। প্রতি বছর বারুণীর দিন ঠাকুরনগরে শ্রীশ্রীহরিচাঁদের জন্মদিন পালন উপলক্ষে বিরাট

মেলা হয় এখন। সহস্র সহস্র নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারী আসেন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পদব্রজে মিছিল করে। নিশান হাতে বাদ্য সহকারে মুখে 'হরি বোল' 'হরি বোল' উচ্চারণ করতে করতে ছুটে চলেন ঠাকুরনগরের উদ্দেশ্যে। আহার, নিদ্রা, শারীরিক কোন অনুভূতিই থাকেনা তাঁদের যেন এক দুর্নিবার আকর্ষণে নৃত্য করতে করতে ছুটে চলেছেন সেই পরম পুরুষের শুভ জন্ম লগ্নকে মহিমান্বিত করতে। সেখানে সেই উপলক্ষে বসে বিরাট মেলা। থাকে না কোন অভাব, সঙ্কোচ। এই বিরাট জন সমষ্টির আহার কোথা থেকে আসে, কে দেয়, তার কোন হিসাব থাকে না। যিনি এ যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর তিনি অন্তরিক্ষ থেকে যে আশীর্বাণী দেন তাতেই সকলে মাতোয়ারা। ঠাকুর বাড়ির সংলগ্ন মন্দিরের আসনে এখন বসার উত্তরাধিকার স্বয়ং প্রমথ-রঞ্জনের। তিনি বলেন "আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমি ব্যারিষ্টার, রাজনীতি করি। আমার কোন ঐশী শক্তিও নেই, কিন্তু ঐ আসনে বসে যা বলি বা করি আমার অজ্ঞাতে, কি হয় না হয় সেই মহাপুরুষের ভক্তেরাই জানেন।" এ যেন বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন যে বসে সেই বিচারক।

ঠাকুরবাড়ি পূর্বে দুর্গাপূজা হত না। গুরুচাঁদ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই পূজার প্রবর্তন করেন। এখনও হচ্ছে। এই পুজায় যে চণ্ডীপাঠ হয় তা বাংলা ভাষায় লিখিত। যিনি লিখেছিলেন তিনি সাজাই গ্রাম নিবাসী এক ব্রাহ্মণ।

ঠাকুরনগর আদর্শ গ্রামের পরিপূরক না হলেও মোটের উপর নবগঠিত একটি উন্নতিশীল পল্লী। চিকনপাড়া আজ চিকন হয়ে এক প্রান্তে ধুঁকছে। সেখানকার অধিবাসী দশ বার ঘর ব্যক্ত ক্ষত্রিয় (বাগদী)। যাদের অনেকের আবাদী জমি জায়গায় আজকের এই ঠাকুরনগর। তাঁদের কথা আজ আর কেউ ভেবে দেখে না। তারা এখন ঠাকুরনগরের আড়ালে অস্তগামী সূর্যকেই দেখে। প্রভাতের সূর্য ঠাকুরনগরের দিক থেকেই ওঠে। ঋণ ভারে জর জর হয়ে একে একে অবশিষ্ট জমিজমা যা ছিল তাও তারা হারিয়েছে। মহারাজ দলপতি একদিন ছিলেন ৬০ বিঘার মালিক এখন তাঁর অবশিষ্ট আছে মাত্র চার বিঘা। আর প্রিয়নাথ সরকারের জমিজমার অবশিষ্ট আর কিছুই নেই। খড়ের ঘর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। তার ভেতরেই বাস, লজ্জা নিবারণের ন্যূনতম প্রয়োজন তাও তাদের নেই। শীত বস্ত্র সে ত' এখন স্বপ্ন! ক্ষেত মজুরের কাজ সবদিন জোটে না। মাছ ধরা জাতীয় পেশা, কিন্তু তাও তার উপকরণ চাই। জ্যায়না, বর্শিতে ধরে হাটে বাজারে নিয়ে গেলেও সেখানে বেচার অধিকার একমাত্র মালো-নিকারীদের। সুতরাং লাভের গুড়

পিঁপড়েয় খায়। এই সম্প্রদায়ের মত দুস্থ অবহেলিত সম্প্রদায় গ্রাম বাংলায় আর নেই। বনগ্রাম বাজারেও এদের মা বোনদের দেখা যায় শাক ওলের ডাঁটা বিক্রি করতে। তাদের দেখলেই অনুমান করা কঠিন নয় এদের মর্মান্তিক শোচনীয় অবস্থা। চিকনপাড়ায় দু একজন ছেলেমেয়ে ঠাকুরনগরের আনুকূল্যে শিক্ষার আলো দেখতে চেয়েছেন একজন বি, এ, পাশও করেছেন কিন্তু বেকার। যদি চিকনপাড়ায় কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ও হ'ত তা হলে বোধ হয় এই অবহেলিত সম্প্রদায় কিছুটা আলোকের পথ দেখত। তাদের ছেলে দিয়ে তাদের শিক্ষা দিলেই মনে হয় আশু সুফল পাওয়া যেত। শিক্ষক ছাত্রের অনাবিল ভাবের আদান প্রদানের সহায়ক হত। আমরা যত গাল ভরা উদার বক্তব্যই রাখিনা, কেন কর্মক্ষেত্রে ততটা প্রমাণিত হয় না। শিক্ষালাভের সুযোগ পেলে তাদের পথ তারাই দেখত। অনাদর অবহেলার উর্দ্ধে তারা নিজেরাই উঠতে পারত। প্রিয়নাথের বাড়ির অনতিদূরেই একটি পুকুর দখল করেন গজেন বিশ্বাস। মাছমারা জাতি শুকনা ডাঙায় টোঙে পড়ে ধোঁকে। কারণ জল তার নাগালের বাইরে।

ঠাকুরনগরের অধিবাসী প্রায় সকলেই নমঃশূদ্র। তারা ঠাকুরের সংগঠনে সমষ্টিবদ্ধ ও উন্নতিকামী। রাজনৈতিক মতাদর্শ তাঁদের বিভিন্ন হতে পারে এবং সেটাই স্বাভাবিক। উত্তাপ উত্তেজনা আছে। শিক্ষার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে বিচার বুদ্ধির জন্য কেউ কারও উপর নির্ভরশীল নয়। নিম্ন মধ্যবিত্তের যে সমস্যা সে সমস্যার উর্দ্ধে তাঁরা এখনও উঠতে পারেন নি। তবুও যাঁরা একদিন অনগ্রসর ছিলেন তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টাতেই যে এতটা সম্ভব হয়েছে এটা শুধু আনন্দের নয়, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গর্বেরও। ঠাকুরনগরের আশপাশে শিমুলপুর, বড়া, হুদাশিমুলপুর, পানশিলা সাবেক কালের গ্রাম। এসব গ্রামে প্রায় শতাধিক মুসলমানও বাস করেন। তাঁদেরও কেন্দ্রস্থল এখন এই ঠাকুরনগর।

শিমুলপুরে একটি পীরের দরগা আছে। সেই দরগায় হিন্দু মুসলমান সকলেই পূজা দিতেন। খাঁটুরার রামকৃষ্ণ রক্ষিত পীরের দরগার জীর্ণ অবস্থার সংস্কার করেন এবং সেখানে একটি মেলা বসানোর ব্যবস্থাও করেন। সেই থেকে এ মেলার নামকরণ হয় রামকৃষ্ণ মেলা।

১৭

জলেশ্বর

বনগ্রাম থেকে গাইঘাটা তের মাইল। গাইঘাটা থেকে কলিকাতার দিকে এক মাইল গেলেই জলেশ্বরের মোড়। ডান হাতে সোজা পিচের রাস্তা পশ্চিম দিকে গিয়েছে জাগুলিয়া হয়ে কাঁচরাপাড়া। মোড় থেকে এই রাস্তা ধরে এক মাইল গেলেই জলেশ্বর গ্রাম। গাইঘাটা থেকে কাঁচরাপাড়ার বাসে কিম্বা মোড় থেকে ভ্যানরিক্সায় যাওয়া যায়। এই গ্রাম আরম্ভ হয়েছে সুবিস্তীর্ণ মাঠের পর। রাস্তার উভয় পার্শ্বেই কৃষিক্ষেত্র। ছায়া বীথি ঘেরা এই গ্রামখানি দূর থেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রামে প্রবেশ করতেই বাঁ হাতে সড়কের ধারে প্রাথমিক বিদ্যালয়। সামনেই দেখা যাবে পাহাড়ের মত উঁচু ঢিবি। এই ঢিবির উপরেই জলেশ্বরের শিব মন্দির নবরূপে গঠিত।

ঢিবির মধ্যে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিলীন হয়ে আছে। তার স্বরূপ কেউ জানে না। কবে কখন কে নির্মাণ করেছিলেন আর তার ধ্বংসইবা কেমন করে হয়েছিল তার ইতিহাস আজ আর পাওয়া যাবে না। কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক (৬২৯—৬৪৫ খৃঃ) সমতটে নানাস্থানে শিব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। হাতিয়াগড়ে অম্বুলিঙ্গ শিব, কালিঘাটে নকুলেশ্বর, দ্বিগঙ্গায় গঙ্গেশ্বর, কুশদহে, লাউপালায় পোড়া মহেশ্বর এবং জলেশ্বরে জলেশ্বর শিব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। জনশ্রুতির মাধ্যমে যা উদ্ধার করা যায় বা বর্তমানে যেটুকু অতীতের নজির মেলে তার থেকেই ইতিহাস বৃত্তান্ত উল্লেখ করতে প্রয়াস পাচ্ছি। সেন যুগ ১১১৯ খৃঃ থেকে ১১৬৯ খৃঃ। এই সময় বিভিন্ন স্থানে মন্দির ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। জলেশ্বরেও সেই যুগে সেন

রাজারা মন্দিরের সংস্কার ও পুষ্করিণী খনন করেন। এই মন্দিরের বিগ্রহ এখন লুপ্ত। চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবলিঙ্গ বলে যে বিগ্রহ পূজা করা হয় সেটি একটি প্রস্তর খণ্ড বিশেষ। সম্ভবত মন্দিরের কোন ভগ্নাংশই এখন দেবত্ব লাভ করে পূজিত হচ্ছেন।

সেন রাজবংশের সময় বাগড়ি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল। চক্রদ্বীপ, অন্ধ্রদ্বীপ, কুশদ্বীপ ইত্যাদি। অন্ধ্রদ্বীপের মধ্যে বনগ্রাম, গৌরীপোতা, যাদবপুর, আন্ধারাকাটা প্রভৃতি অঞ্চল। কুশদ্বীপের মধ্যে গোবরডাঙ্গা, গাইঘাটা, বাদুড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চল। সমতটও সে সময় বাগড়ির একটা অংশ ছিল। জলেশ্বর ও লাউপালায় মন্দির সংস্কারকালে সেন রাজারা বাসুদেব মূর্তি স্থাপন করেন ,মন্দির গাত্রে। জলেশ্বরে বাসুদেব মূর্তিটি অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে।

পরবর্তী চারিশত বৎসরাধিক কাল পরে আকবরের চিতোর আক্রমণের সময় ১৫৬৩ খৃঃ থেকে ১৫৭১ খৃঃ যখন সোলেমান করবানী গৌড়ের ফৌজদার ছিলেন সে সময় রাজসাহী জেলায় মান্দা থানাব অধীন বীরজাওন গ্রামে নয়ন চাঁদ রায় নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর পুত্র কালাচাঁদ রায়। কালাচাঁদের মা তাকে 'রাজু' বলে ডাকতেন। ' কালাচাঁদের পিতা সঙ্গতি-সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন না। কালাচাঁদ শ্রীপুব নিবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। কালাচাঁদের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে সোলেমান তাঁকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন। সোলেমানের কন্যা এই ব্রাহ্মণ সন্তানের রূপ ও বীরত্বে আকৃষ্ট হন। কালাচাঁদও সোলেমান কন্যার আকর্ষণে ধরা দেন। পরে তাঁকে বিবাহ করেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ' তদানীন্তন সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে কালাচাঁদ মুসলমান হন এ কাহিনীও ইতিহাসে পাওয়া যায়।

কালাচাঁদ হয়ে ওঠেন হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী। তিনি ১৫৬৮ খৃঃ পুরী আক্রমণ করেন এবং জগন্নাথের মন্দির লুণ্ঠন করে তার কতকাংশ ধ্বংস করেছেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয় কালা-পাহাড়। কালাপাহাড় কামরূপ থেকে কাশী এবং পুরী ও তার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অসংখ্য দেব দেবীর মন্দির ধ্বংস করেন। কালা পাহাড় যে এই মন্দির ধ্বংস করেছিলেন তা সন্দেহাতীত। এই মন্দিরের ধ্বংস স্তূপ আজও কেউ খনন করে দেখেননি। তবুও যে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ঐ স্তূপের পাশে বটবৃক্ষতলে অবহেলায় রক্ষিত আছে তা দেখলেই অনুমান করা কঠিন নয় যে সেটি বিষ্ণু মূর্তি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তার অনেক চিত্র ও তা প্রমাণ করে। সোলেমানের পর দায়ুদ করবানীর সময়

বাংলা ও বিহার আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ১৫৮৩ খ্রীঃ। সেই যুদ্ধে বিদ্রোহের অন্যতম নেতা কালাপাহাড় নিহত হন।

কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্কের সময় বাংলাদেশের অনেক বৌদ্ধই পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। তান্ত্রিক সাধকদের অত্যাচার, সেন রাজাদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি তীব্র অনুরাগের ফলেও বৌদ্ধেরা পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। বুদ্ধদেব শিবের অবতার বলে হিন্দুরা মেনে নিলেন, ফলে বৌদ্ধরা শৈব হলেন। তাঁদের আচার আচরণে ও উপাসনা ক্ষেত্রে বৌদ্ধ রীতি অনুসারে শরীরকে নির্যাতন করার দিকটা পরিবর্তন করেননি। তাঁরা শিবকেই তাঁদের ইষ্টদেব বলে গ্রহণ করলেন। চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন উৎসব সেই বৌদ্ধরীতিরই রূপান্তর।

বর্তমানে গাইঘাটা থানায় যমুনা নদীর নিকট জলেশ্বরের শিবরাত্রি ও চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন উৎসব খুব ধুম ধামের সঙ্গেই হয়ে থাকে। এই উপলক্ষে চৈত্র মাসে ঐ ঢিবিকে ঘিরে বিরাট মেলা বসে। গাজন উৎসবে ব্রাহ্মণ পুরোহিত প্রয়োজন হত না, কিন্তু ক্রমে সমাজের অনুশাসনে দেখা দেয় ঐ শিবপূজায় পুরোহিত ও সেবায়েত। বর্তমানে সেবায়েত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় ও নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। এই মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করার জন্য ছিল কিছু বিষয় সম্পত্তি ও পুকুর ঢিবির পশ্চিম পার্শ্বে। যা সকল ক্ষেত্রে ঘটতে দেখা যায়, এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। দেবত্র সম্পত্তি হস্তান্তরিত, বিভিন্ন শরিক তার অংশীদার। দেবতা ভিখারী। ঢিবির পশ্চিম দিকে যে পুকুর তাতে সারা বছর গাজনের শিব ডোবানো থাকে। গাজন উৎসবের সময় বিজোড় দিন পূর্বে-অর্থাৎ নয়, সাত, পাঁচ কিম্বা তিন দিন পূর্বে শিবকে তোলা হয়। এই শিব জল থেকে তোলার ক্ষেত্রে বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত থাকলেও কেউ তা বিশ্বাস করেন আবার কেউ করেন না। কাহিনীটা এই যে গাজনের মূল সন্ন্যাসী বহু চেষ্টা করে তবে শিবকে জল থেকে তোলেন। শিব জলের মধ্যে লুকোচুরি খেলা করেন তোলার সময়। ভক্তদের ভক্তি পরীক্ষা করার জন্য। ভক্তেরা এই সময় সয়াল খাটেন। তাঁরা অবসন্ন হয়ে পড়লে তবে ধরা দেন। জানি না এর পিছনে কোন ইন্দ্রজাল আছে কিনা। অনেক জায়গায় গাজনের এই কাহিনী শুনে নিজে দেখেও কিছু নির্ণয় করতে পারিনি।

শিব ওঠার পর তাকে স্নান করান হয়। কোন কোন বৎসর আড়ম্বর করে বাদ্য সহকারে পদব্রজে হালিশহরের গঙ্গায় শিবকে স্নান করিয়ে আনা হয়। চড়ক পূজার রীতি সর্বত্রই সমান। ঢিবির দক্ষিণে আছে হাজরা-

পোতা, তার পাশেই মঙ্গলপোতা। ঐখানেই হাজরা ভাঁটা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বর্তমানে মূল সন্ন্যাসী আমকোলা নিবাসী কালিপদ ঘোষ। নব নির্মিত যে মন্দির তার প্রতিষ্ঠা হয় ২৩শে মাঘ সোমবার ১৩৮৪ সাল। এই নব নির্মিত মন্দিরের নির্মাণ ব্যয় বহন করেছেন উক্ত মূল সন্ন্যাসীর মাতুল হাবড়া থানার অন্তর্গত মল্লিকপুর নিবাসী উপেন্দ্রনাথ ঘোষ। মন্দিরের স্থপতি বা রাজমিস্ত্রী অগ্নিকুমার বিশ্বাস তাঁর বর্তমান নিবাস গ্রাম কয়া, গাইঘাটা, চব্বিশ পরগণা। তাঁর পূর্ব নিবাস ছিল খুলনা জেলার অন্তর্গত মোরেলগঞ্জ।

বর্তমানে জলেশ্বর গ্রাম দৈর্ঘ্যে দেড় মাইল এবং প্রস্থে একমাইল। লোক সংখ্যা অনধিক তিনশত্ হবে। মাহিষ্যই সংখ্যায় অধিক, প্রায় দেড়-শত ঘর। এ ছাড়া ব্রাহ্মণ, ধীবর, বারুজীবী, কর্মকার, পরামাণিক, বণিক আছেন। আর আছেন সত্তর ঘর মুসলমান। এই গ্রামের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। কয়েকটি পুকুর এই গ্রামে আছে, তার কোনটাতেই স্বচ্ছ জলের দেখা মেলে না। সংস্কার অভাবে পঙ্কিল। ১৯৪৭ খ্রীঃ বঙ্গ-বিভাগের পর পূর্ব বাংলার থেকে আগত অনেকে ঘর বেঁধেছেন। তারাও সকলে কৃষিজীবী। এখন ঢিবির পাশে পিচের সড়কের ধারে দোকান পসার গড়ে উঠেছে, বিজলী বাতিও হয়েছে। ধীরে ধীরে শহরের রূপ নিচ্ছে অজান্তেই। হয়ত একদিন এর গুরুত্ব বেড়ে যাবে। ঢিবির পাশে উত্তর দিকে একটি কালী মন্দিরও গড়ে উঠেছে। এই বিগ্রহের নিত্য পূজা হয়।

জলেশ্বর একদিন জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে ছিল। পূর্বে ব্রাহ্মণ বসতির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ছিল। ঘটকরা ছিলেন গ্রামের জমিদার। কয়েকটি ধ্বংস-প্রাপ্ত কোঠাবাড়ি এখন ব্রাহ্মণদের অতীত দিনের সঙ্গতির স্বাক্ষর। ম্যালেরিয়া ও মহামারীতে এক সময় গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। অনেকেই স্থান ত্যাগ করেছেন। এই মারাত্মক দৈত্যদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাঁরা টিকে ছিলেন তাঁদের বংশধরেরা আজ ওখানকার প্রাচীন অধিবাসী। এছাড়া সকলেই নবাগত।

এখন গড়ে উঠেছে নূতন সমাজ। এখন ধর্ম-অধর্ম গৌণ। এখন সকলেই রাজনীতি জড়িত। সুতরাং জাতি, গোষ্ঠী-বর্ণের বৈষম্য সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যাবে পূর্বের সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে যে নূতন সমাজ গড়ে উঠেছে তাতে দলাদলি, বিদ্বেষ এখন খুব উগ্র। এখন সকলেই গণতন্ত্র রক্ষায় আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। সুতরাং সেখানে দল গড়ার ও প্রাধান্য লাভ করার প্রতিযোগিতায় সকলেই সক্রিয়। গ্রামের ভেদাভেদ এখন জাতি বর্ণে

দেশ বিভাগের পর গ্রামের লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ গ্রামে শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা গাইঘাটা উচ্চ বিদ্যালয় এবং হাবড়া, গোবরডাঙ্গা কলেজে শিক্ষালাভ করার সুযোগ পাচ্ছে। যোগাযোগ ও সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটায় আজ আর গ্রাম দূরে নয়। শিক্ষার সুযোগ হলেও এই শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা বেকার যন্ত্রণায় ভুগছে।

প্রশ্ন জাগে মনে এই ঢিবির নিচেয় যা চাপা পড়ে আছে তার অনুসন্ধান করার পূর্বেই একটা পাকা মন্দির গড়ে উঠল। ব্যক্তিগত ইচ্ছায় বা প্রচেষ্টায় যে মন্দির গড়ে উঠল যদি প্রয়োজন দেখা দেয় ঐ ঢিবি খনন করার তখন কি তা সম্ভব হবে!

২০

ইছাপুর-গৈপুর

গোবরডাঙ্গার নিকট হলেও ইছাপুর ও গৈপুর গ্রাম বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত ছিল। খুলনা জেলার উৎপত্তির সময় নদীয়া জেলার থেকে গ্রাম দুইটি বিচ্ছিন্ন করা হয়। ইছাপুর যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার সঙ্গে যুক্ত হয় আর গৈপুর যুক্ত হয় ২৪ পরগণা জেলার বারাসাত মহকুমায়। কিন্তু এই দুটি গ্রামের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক কাঠামো আজও একই সূত্রে গাঁথা।

বনগ্রাম থেকে গাইঘাটা যশোহর-কলিকাতা সড়কের উপর। গাইঘাটা বনগ্রাম মহকুমার একটি থানা। যশোহর-কলিকাতা সড়ক থেকে বাঁদিকে একটা পিচঢালা রাস্তা বার হয়ে চলে গেছে গোবরডাঙ্গার মধ্য দিয়ে বেড়ি-গোপালপুর ঘাট পর্যন্ত। এই পথে এখন ৯৬ডি বাস চলাচল করে। গাইঘাটা থানা পিছনে রেখে এই পথে প্রবেশ করলেই বাঁদিকে দেখা যাবে গাইঘাটা উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবৃহৎ অট্টালিকা। স্বাধীনতা লাভের পর জনবসতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই স্থানের গুরুত্ব বেড়েছে। গাইঘাটা এখন বড় মোকাম ও শহর বললেও অত্যুক্তি হবেনা। যমুনা নদী এর নীচে দিয়েই প্রবাহিত। পূর্বে বনগ্রামের ইছামতীর বোটের পুলের মত এখানে যমুনা বক্ষে বোটের পুল ছিল। এখন নূতন করে পাকা সেতু নির্ম্মাণ করা হয়েছে।

বেড়িগোপালপুর ঘাট সড়ক ধরে অগ্রসর হলে এক মাইলের মাথায়

ডানহাতে পড়বে মাটকুমরা গ্রাম। পূর্বে যমুনা-নদী-তীরে বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। অনেক প্রাচীন বাড়ির ধ্বংসস্তূপ নজরে পড়বে। এই পথ ধরে আরও দুই মাইল অতিক্রম করলেই ইছাপুর গ্রাম। এই পথের সমান্তরালে ডান দিকে যমুনা নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে। পথের বাঁ দিকে ইছাপুর গ্রাম এই যমুনা নদীর তীরে।

ইছাপুর গ্রামের পত্তন করেন হড়চৌধুরী বংশ। কান্যকুব্জবাসী ধৃতির পুত্র দক্ষ আদিশূরের যজ্ঞে আনীত হন। দক্ষের পুত্র কাকত্য হোড়ো গ্রামে বাস করতেন। তিনি হোড়ো গ্রাম ত্যাগ করে ইছাপুরে এসে বসতি স্থাপন করেন। এই জন্য এই বংশের পূর্বে হড় শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই বংশের অষ্টম পুরুষ রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ ছিলেন মহাপণ্ডিত এবং মহাযোগী। তিনি যশোহর রাজ প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন। এই অঞ্চল তখন প্রতাপাদিত্যের রাজত্বের অন্তর্গত বলে প্রতাপ দাবি করেন। রাঘব সিদ্ধান্ত-বাগীশ প্রতাপাদিত্যকে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করেন। এজন্য প্রতাপাদিত্য ক্রুদ্ধ হয়ে সসৈন্যে এসে ছাউনি ফেলেন গোবরডাঙ্গায়। বর্তমানে যেখানে যমুনার উপর রেলসেতু তারই সন্নিকট। এই সংবাদ জানতে পেরে সিদ্ধান্ত-বাগীশ যোগ বলে ছাউনির মধ্যে প্রবেশ করেন সকলের অলক্ষ্যে এবং নিজের হাতে যশোহর রাজের পূজার সাজ-সজ্জা করে রাখেন। প্রতাপ পূজা করতে গিয়ে পূজার সাজ-সজ্জা দেখে অত্যন্ত প্রীত হন এবং কে এরূপ ভাবে সাজ-সজ্জা করেছে তার অনুসন্ধান করার সময় সিদ্ধান্তবাগীশ আত্ম-প্রকাশ করেন ও নিজের পরিচয় প্রতাপকে দেন। প্রতাপ তার সৌম্যমূর্তি দর্শনে মুগ্ধ হন। তাঁর ক্রোধ আর থাকল না। সিদ্ধান্তবাগীশের সঙ্গে প্রতাপের বন্ধুত্ব হল। সিদ্ধান্তবাগীশ অন্ন গ্রহণের জন্য প্রতাপকে আমন্ত্রণ করেন। প্রতাপ তাঁর আমন্ত্রণের জবাবে বলেন যে তিনি পররাজ্যে অন্ন-গ্রহণ করেন না। সিদ্ধান্তবাগীশ তৎক্ষণাৎ দলিল করে ছাউনির স্থানটি প্রতাপকে দান করেন। সেই থেকেই ঐ স্থানটি প্রতাপপুর নামে অভিহিত হয়ে আসছে।

প্রতাপের পতনের পর সিদ্ধান্তবাগীশ মানসিংহের দরবারে আহূত হন এবং সমাদরে সৎকৃত হন। সেই উপলক্ষে রচিত শ্লোকের কিয়দংশে দেখা যায়

সাংখ্যাবান সাংখ্যতর্কাগম বিচারেষু বিশ্বপ্রকাশি।
সুশ্রী মানসিংহ প্রভৃতি নৃপতিভিঃ সৎকৃতো ইয়ং সভায়াং।*

* বঙ্গীয় সমাজ, পৃঃ ১৮৪

সিদ্ধান্তবাগীশের পুত্র রামচন্দ্র সার্বভৌম। পৌত্র রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী চতুষ্করীণ্। এই রঘুনাথের সময় ইছাপুরে সৌধাবলী, নবরত্নমন্দির এবং জোড়া বাংলার নির্মাণ করা হয়।*

বর্তমানে এই নবরত্নমন্দির জঙ্গলাকীর্ণ এবং বিধ্বস্ত। বিগ্রহ স্থানান্তরিত হয়ে তার অনতিদূরে একটি কোঠা ঘরে নিত্য-পূজিত হচ্ছেন। প্রাচীন সৌধাবলীর আজ অনেক অংশই লুপ্ত। চৌধুরী বংশের বংশধরদের কেউ কেউ নিজের সুবিধামত ও সামর্থমত কিছু অংশ সংস্কার করে বসবাস করছেন। নবরত্ন মন্দিরের টেরাকোটার কাজ অপূর্ব। তার কয়েকখানি ইট ইছাপুর পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে।

ইছাপুর ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম। এ ছাড়া নানা বর্ণের হিন্দুর বসতি। মুসলমান বসতি ইছাপুর খালের সন্নিকটে। তাঁদের কারও কারও সম্পন্ন অবস্থা। পূর্বে ইছাপুরে বাজার বসত। নারীরাও বিশেষ সময়ে বাজার করতে যেতেন। সে সময় পুরুষের যাওয়া নিষেধ ছিল। বহু অট্টালিকা শোভিত এই গ্রাম ধনে জনে পূর্ণ ছিল।

চৌধুরী বংশের রামচরণ চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করেন শ্যামরাম মুখোপাধ্যায়। তাঁর পুত্রই গোবরডাঙ্গার প্রতাপশালী জমিদার খেলারাম মুখোপাধ্যায়। শোনা যায় বিবাহের যৌতুক স্বরূপ শ্যামরাম জমিদারির কিছু অংশ পান। স্বীয় ক্ষমতাবলে বিশাল জমিদারির মালিক হন খেলারাম মুখোপাধ্যায়।

এই গ্রাম ক্রমে জনশূন্য হয়ে পড়ে। ক্রমশ জমিদার যেমন ধীরে ধীরে বহুধা-বিভক্ত হয়ে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকলেন, গ্রামের অন্যান্য লোকেদের অবস্থায়ও ভাঁটা পড়তে থাকল। প্রবল ম্যালেরিয়া ও মহা-মারীতেও গ্রামের বহুলোক মারা গেলেন। বহুলোক স্থান ত্যাগ করলেন। ক্রমশ গ্রাম জনহীন হয়ে পড়ল। প্রকৃতি সাজাতে লাগলেন ইছাপুরকে নূতন সাজে। পোড়োবাড়ি আর জঙ্গল পূর্ণ হল গ্রাম। বাঘ আর বুনো-শুয়োর আস্তানা গাড়ল। উৎসব আনন্দে ভাঁটা পড়ল। বাজার দোকান-পসার ধীরে ধীরে গেল অস্তাচলে। যমুনা নদী মজে গেল। যাতায়াতের অসুবিধা দেখা দিল। রুজি রোজগারের জন্য মধ্যবিত্ত সমাজ গ্রাম ছেড়ে বার হলেন দিকে দিকে। যাঁরা গ্রাম আঁকড়ে থাকলেন তাঁদের অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে কোন রকমে দিনাতিপাত ছাড়া আর কিছু করার থাকল না।

এই গ্রামে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত চৌধুরীদের পৃষ্ঠপোষকতায়।

*খাঁটুরার ইতিহাস পৃঃ ১৪৭-১৪৯।

বনগ্রাম মহকুমায় প্রথম থিয়েটার হয় চৌধুরী বাড়িতে। সিনের অভাবে শতরঞ্চি টাঙিয়ে। আধুনিক ভঙ্গিমায় অভিনয় করা হয়। এই ইছাপুর গ্রামেই জন্মেছিলেন বনগ্রামের উকিল রাণী দুর্গাবতী, দধিচী, রামপ্রসাদ প্রভৃতি নাটকের লেখক হরিপদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর পুত্রই বর্তমানে সাহিত্যিক 'শংকর' নামে খ্যাত মণিশংকর মুখোপাধ্যায়।

ইছাপুরে দোল উৎসব এখনও হয় ঘটা করে। এই উপলক্ষে মেলা বসে। যাদব বংশীয় নন্দরাম ঘোষ ইছাপুরের বিখ্যাত দোল মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে এই ঘোষ বংশের নন্দরাম ঘোষ থেকে অধঃস্তন সাত পুরুষ চলছে। তাঁরা বলেন ঐ দোলমঞ্চ ১৮২৫/২৬ খ্রীঃ স্থাপিত হয়েছিল। দোলমঞ্চের অনতিদূরে তুলসীমঞ্চ। ১৩৪১ সালে ঐ মঞ্চের প্রতিষ্ঠা।

ইছাপুরে দোল উৎসব দুর্গোৎসব ইত্যাদি সকলক্ষেত্রেই আজও চৌধুরীদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। চৌধুরী বাড়ি আগে উৎসব আরম্ভ হলে তারপর ঘোষেদের ঐ দোলমঞ্চে উৎসব আরম্ভ হয়। গৈপুরেও ঐ উৎসব হয় বোস বাড়িতে ও মিত্র বাড়িতে। বোস বাড়িতে হয় পরবর্তী কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে আর মিত্র বাড়িতে হয় কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে। দুর্গা পূজায়ও ইছাপুরের চৌধুরীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয় বলিদান, নিরঞ্জন ইত্যাদি ক্ষেত্রে। বিজয়া দশমীর দিন চৌধুরী বাড়ির প্রতিমা ভাসানের জন্য যমুনা বক্ষে নৌকায় না উঠলে গৈপুর ইত্যাদির প্রতিমা নৌকায় তোলা হয় না। বাছের পর নিরঞ্জন, আগে চৌধুরী বাড়ির প্রতিমা নিরঞ্জন হয় তার পর অন্যান্য প্রতিমা নিরঞ্জন হয়। এ রীতি এখনও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়ে থাকে।

যমুনা নদী আর শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে এ অঞ্চলে নানা কাহিনী শোনা যায়। শ্রীকৃষ্ণ এই যমুনাতটে বাঁশী বাজিয়ে ধেনু চরাতেন। গোপিনীরাও এই গৈপুর গোবরডাঙা অঞ্চলে বাস করতেন। তাই তাদের বাড়ির পোঁতা এখনও বর্তমান। সেগুলি গোপিনী পোঁতা নামে চিহ্নিত করা হয়। গোবরডাঙায় আছে কানাই নাট শালপাড়া। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আর গোপিনীদের এই সকল কাহিনীর কোন ভিত্তি আছে এ বিশ্বাস করা কি সম্ভব! পূর্বে ইছামতী যমুনা নদীতে প্রায়ই বন্যা হত। বন্যার পর যে বালির স্তূপ পড়ে থাকত সেগুলিকেই পরবর্তীকালে গোপিনীপোঁতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এ যুক্তি অনেকে নাও গ্রহণ করতে পারেন সুতরাং এখানে বিতর্কের অবকাশ দেখিনা।

গৈপুর গ্রামে বহু কৃতবিদ্য কায়স্থ-ব্রাহ্মণের বাস ছিল। এখন ভগ্ন ও

প্রাচীন সৌধাবলী অতীত দিনের স্মৃতি চিহ্ন বহন করছে। এই গ্রামেই জন্মেছিলেন প্রমথনাথ বসু। জামসেদপুর লৌহ ইস্পাত কারখানার ভিত্তিস্থাপনের পশ্চাতে যাঁর অবদান অতুলনীয়। তাঁরই বংশধর বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মধু বসু। মধু বসুর স্ত্রীই অভিনেত্রী সাধনা বসু। এই গ্রামেই কবি অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য জন্মেছিলেন। তাঁর গৃহ আজও গ্রামে বর্তমান আছে। বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যিনি সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর খুলনার ইতিহাসের বহু তথ্য সরবরাহ করেছিলেন সেই চারুচন্দ্রের জন্মস্থান এই গৈপুর গ্রাম। তাঁর পুত্র ও বংশধরেরা এখনও এই গ্রামে বাস করছেন। এছাড়া গৈপুরের গাঙ্গুলী বংশে একাধিক খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন, এখনও আছেন। বর্তমানে গোবরডাঙ্গা কলেজ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং শিশুচিকিৎসালয় এই গৈপুর গ্রামের অংশ বিশেষে স্থাপিত হয়েছে।

গৈপুরে ওলাই বিবির দরগা আছে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পবিত্রস্থান। এই দরগাকে কেন্দ্র করে প্রতি বর্ষে চৈত্রমাসে মেলা বসে। মেলা চলে একমাস। পয়লা বৈশাখ মেলা শেষ হয়। তবে এখন আর সে জাঁক ও জৌলুস নেই। গৈপুর গোবরডাঙ্গা পৌর প্রতিষ্ঠানের অধীন। তাই গ্রামের ভিতরও পাকা রাস্তা দৃষ্ট হয়। এখন আধুনিকতার রং ধরেছে। পোড়ো বাড়িও আছে আবার নবনির্মিত হাল ফ্যাসানের বাড়িও আছে। বিজলিবাতি জ্বলে পথে ও বাড়িতে। বৈদ্যুতিক পাখাও ঘুরছে অনেক গৃহস্থবাড়িতে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গৈপুর পশ্চাদ্‌পদ নয়। প্রতি বৎসর একাধিক নাটক মঞ্চস্থ হত, এখনও হচ্ছে।

স্বাধীনতালাভের পর ইছাপুরে লোক সমাগম হতে থাকে। জঙ্গল অন্তর্হিত হতে থাকে সেই সঙ্গে অন্তর্হিত হয়ে গেল অনেক কলমের আম বাগান যা ছিল এক সময় গ্রামবাসীদের অর্থকরী ফসল। আবার ইছাপুরে দোকান পসার বসেছে। নিত্য বসছে বাজার দু'বেলা। ডাকঘর, প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাঠাগার, ক্লাব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কিন্তু অতীত সমাজব্যবস্থা ফিরে আর আসবে না, আসবে না আর সে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ উৎসব। যাতায়াতের সুযোগ বেড়েছে। গ্রামের মধ্যবিত্ত অনেকে নিত্য রেলযাত্রী, কলিকাতা তাদের কর্মস্থল। মধ্যবিত্ত অনেকের কিছুকিছু জমি জমাও আছে। চাষবাসও হয়। যমুনার কিনারে যাদের জমি আছে তারা ভাগ্যবান। আর একদিন এমন ছিল যে অনেক জমি পড়ে থাকত। চাষ করার লোক জুটত না।

এখনও ইছাপুরে কত অট্টালিকা ধ্বংসস্তূপ পড়ে আছে অতীতের ব্যথা-

বেদনা, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার স্মৃতি বুকে নিয়ে। কত কাহিনী, কত ইতিহাস সুপ্ত হয়ে আছে তার তলায়। তা উদ্ধার করা এখন দুঃসাধ্য। বনগ্রাম মহকুমা উৎপত্তির বহু পূর্বেই ইছাপুর গৈপুরের উৎপত্তি। সুতরাং এই গ্রাম দু'টি বহু প্রাচীন। সে দিনের ইতিহাস এখন লুপ্ত তবে ইছাপুরে চৌধুরীরা আসার পর থেকেই এই গ্রাম খ্যাতির শিখরে পৌছে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

২১

পাইকপাড়া

মতিগঞ্জ শহর এলাকা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে পাইকপাড়া পর্যন্ত পথের দু'ধারেই আড়ৎ, পাকাবাড়ি- গুদাম, টালিখোলা, জনবসতি। যানবাহনের লোকজনের আনাগোনা বিরামহীন। জয়পুর কুঠিবাড়ি এই রাস্তার বাঁধারে—ইছামতী তীরেই ছিল। কয়েকটি নারিকেল গাছ ছাড়া কুঠিবাড়ির আর কোন প্রাচীন স্মৃতি বর্তমান নেই। এক সময় নীল কুঠিয়াল সাহেবদের পাকাবাড়ি ছাড়া এ অঞ্চলে আর কোন পাকাবাড়ির চিহ্ন ছিল না। এই নীলকর কুঠিয়াল সাহেবরা আমদানী করেছিলেন নীল চাষের জন্ত সস্তা শ্রমিক সাঁওতাল পরগণা থেকে। ইছামতী তীরে নীল কুঠির পাশেই তাদের পল্লী—পথের পাশ থেকেই ছিল। এখন সে পল্লী বড় বড় বাড়ি' আর আড়তের আড়ালে আত্মগোপন করেছে। দারিদ্র্যের আঘাতে তারা একে একে হস্তান্তর করেছে পথের ধারের জমি। তাদের সংখ্যা ছিল এখনকার থেকে অনেক বেশী। নীলকর সাহেবরা চলে যাওয়ার সময় তাদের জমি জায়গা সবই দিয়ে গিয়েছিল এই আদিবাসী সাঁওতালদের। অশিক্ষিত সাঁওতালদের ঠকিয়ে সুযোগ সন্ধানীরা ক্রমে ক্রমে তাদের জমি জায়গা গ্রাস করে নিল। সেই জমিতেই তারা চাষ আবাদ করত। জমি জায়গা হারিয়ে রুজির তাগিদে তারা করতে আরম্ভ করে তবলদারী। আড়াকুশীর কাজও তাদের কেউ কেউ করত। আবার অনেকে হল ক্ষেত মজুর। শিকার তাদের জাতীয় বৃত্তি। বিশেষ করে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিন শড়কি

বল্লম, তীর-ধনুক, জাল আর শিকারী কুকুর নিয়ে হৈ হৈ করে, বের হত বুনোশুয়োর শিকার করতে। হাঁড়িয়া খেত নাচ গান করত। মেয়েরাও পরিশ্রম করত রুজির তাগিদে। তারা মাঠেও ক্ষেত মজুরের কাজ করত, এখনও করে থাকে। মেয়েরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বন জঙ্গল কাটত। অপরাহ্নে কাটা বন এক জায়গায় জড় করে পুড়িয়ে জল ছিটিয়ে কয়লা করত। মাথায় করে নিয়ে বাড়ি ফিরত সন্ধ্যার সময়। রাত্রে ঢেঁকিতে সেই কয়লা কুটে গুঁড়ো করে জল দিয়ে মেখে টিকে বানাত। আজ তাদের সে জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এখন কেউ রিক্সা চালায়, কেউ মোট বয়, কেউ বা তরিতরকারী নিয়ে ভেণ্ডারী করে কলিকাতায়। বাবুরা এদের নাম দিয়েছিল বুনো। এদের পাড়ার নাম বুনো পাড়া। এদের নিজস্ব ভাষা ছিল, সংস্কৃতি ছিল। এখন সব হারিয়ে গেছে। বাংলা ভাষাই এখন এদের মাতৃভাষা হয়েছে। শিক্ষা এদের মধ্যে প্রসারলাভ করার সুযোগ আজও পায়নি।

একটু এগিয়ে গেলেই ডান ধারে দেখা যাবে বি. ডি. ও. অফিস, সরকারী খামার। বাঁ-ধারে নদীর তীর দিয়ে বাস্তুত্যাগী গৃহস্থেরা ঘর বেঁধেছেন। তবে তাঁরা নিতান্ত ছন্নছাড়া নন। কিছু আশেপাশের গ্রাম অঞ্চলের লোকও আছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই নীলকুঠিবাড়ি ভাঙ্গা শুরু হয়। সম্পত্তি অবশ্য সাহেবদের পর থেকে অনেকবার হস্তান্তর হয়েছে। সে হিসাব এখানে দেওয়া আবশ্যক মনে করছি না। এখানকার পথের কাদা ছিল বিখ্যাত। বর্ষাকাল কুঠিবাড়ির মাঠের পথের কাদা পথিকদের ত্রাস ছিল। লোকে বলত, 'কুঠির মাঠের মাটি/দু'পা আর এক লাঠি।' অর্থাৎ লাঠি ভর দিয়ে এক পা কাদা থেকে টেনে তুলে তবে আর এক পা ফেলতে হত। অনেক গরুর গাড়ীর চাকা কাদায় আটকে দিনের পর দিন পড়ে থাকত কাঠের ঘুরো ভেঙ্গে। এমনি এঁটেল মাটি ছিল। সেই পথের পাশেই এখন বি, ডি, ও, অফিস। ঐখানেই সোনা ফলত একদিন। নীলকর সাহেবরা সেরা জমিতেই নীল চাষ করত। পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনে ব্রিটিশ সরকার নীলকুঠির এই মাঠ দখল করে সামরিক প্রয়োজনে। স্বাধীনতার পর পাকা সড়ক নির্মাণ করতে ঐ মাঠ কাজে লাগান হয় ইট খোলার। পাইকপাড়ার ও জয়পুরের অনেক কৃষককে সর্বস্বান্ত হতে হয়। অবশ্য তাঁরা খেসারৎ পেয়েছেন। কিন্তু ক্ষতির তুলনায় সান্ত্বনা তাঁদের কতটুকু! এখন কুঠির মাঠের পথের উভয় পাশেই লোক বসতিতে জমজমাট।

বি, ডি, ও, অফিস থেকে একটু এগোলেই একটা গঞ্জ দেখা যাবে।

পথের ধারে পর পর আড়ৎ, দোকান—সারি সারি রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে। লরি বাসের আনাগোনা। কর্মব্যস্ততা লেগেই আছে। ইছামতী নদীর উঁচু পাড়ের উপরেই এখনও দাঁড়িয়ে আছে অতি প্রাচীন একটা বটগাছের কিয়দংশ। ইছামতী এর কিছু অংশ গ্রাস করেছে। পাশে আরও কয়েকটা বৃহৎ বটগাছ আর একটা অশ্বত্থ গাছ ছিল। তারা সকলেই ইছামতীর ভাঙ্গনে একে একে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এই স্থানটির নামই পাইকপাড়া। বর্তমানে গঞ্জ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। পাইকপাড়ায় একদিন নীল কুঠিয়াল সাহেবদের পাইকদের বসতি ছিল, সেই থেকেই গ্রামের নামকরণ হয়েছে পাইকপাড়া। প্রবহমানা ইছামতীর বাঁকের উপর এই গ্রাম দাঁড়িয়ে আছে। নদীর পাড়ে দাঁড়ালে দেখা যাবে ইছামতীর পাড় ভাঙতে ভাঙতে ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছে, আর পরপারে গড়ে উঠছে নূতন বসতি নব বনগ্রামের। সম্প্রতি ভাঙ্গন রোধ করার জন্য শালবল্লীর বাঁধ দেওয়া হয়েছে।

বনগ্রাম বয়ড়া সড়ক থেকে ডান হাতে চলে গেছে সুটিয়া পর্যন্ত পিচঢালা সড়ক। এই সড়ক থেকেই একটা কাঁচা রাস্তা কোদলা পার হয়ে মিশেছে বনগ্রাম বয়ড়া রাস্তার সঙ্গে কুড়ুলিয়ায়।

কর্মব্যস্ত পিচের সড়ক দেখলে পাইকপাড়াকে একটা বেশ বড় গ্রাম্য গঞ্জ বলেই মনে হবে। সকল সময় কর্মব্যস্ততা লেগেই থাকে। বঙ্গভঙ্গের পূর্বে পাইকপাড়ার এ জৌলুস ছিল না। বিদ্যুৎ ও টেলিফোন অনেকের কাছে অজ্ঞাত ছিল। কোঠাবাড়ি, আড়ৎ, পাকা গুদাম-এর চিহ্নই একদিন ছিল না। পাইকপাড়া গ্রামে কৃষিজীবীদের বাস ছিল। পরবর্তী সময়ে বঙ্গভঙ্গের পূর্বে পথের ধারে দু'একখানা ছোট চালাঘর হয়, গুদাম ও হ'ল টাচের বেড়ার। পথ চলতি মালের কিছু কেনা বেচা চলত। তবে সেটা বাংলা ১৩৩২ সাল থেকে। সেবার চার টাকা মণের পাটের দর চল্লিশ টাকা দরে বিক্রী হয়েছিল। তার আগে একটা কামারশালা ছিল মাত্র পথের ঠিক পাশে। মাঝে মাঝে একখানা মুদীর দোকান দেখা যেত চালাঘরে, দু'এক বছর চলেই ফেল মারত। আবার হয়ত কেউ ভাগ্য পরীক্ষা করতে কিছু দিন দোকান সাজিয়ে বসতেন।

কোম্পানীর নীল কুঠিয়াল সাহেবদের আমলে ভাগ্যান্বেষণে অনেক ইংরেজই বাংলার রস শোষণ করতে এসেছিলেন। সেই রকম এক সাহেব ভাগ্য ফেরাতে এসেছিলেন এই পাইকপাড়ায়। চামড়ার ব্যবসা করার সুবাদে তিনি চামড়া সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর ছিল চামড়ার খটী।

ব্যবসায়ের এলাকা ছিল বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। সেই চামড়া খটির সাহেবের দ্বিতল বাড়ি আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পড়ে আছে চামড়া ধোলাই করার চৌবাচ্চা। পাইকপাড়া থেকে দেখা যাবে পথের বাঁদিকে ইছামতী আর ডান দিকে বিরাট বাঁওড়। সেই বাঁওড়ের ধারেই ঐ দ্বিতল বাড়ি আর সংলগ্ন তিন গম্বুজ ও আট মিনারযুক্ত বড় মসজিদ মাথা তুলে অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

খ্রীষ্টান সাহেব বাড়ি কি করে মসজিদ হল তারও একটা কাহিনী আছে। চামড়া সাহেব সস্ত্রীক থাকতেন ঐ দ্বিতল বাড়ি নির্মাণ করে। নীলকর কুঠিয়াল সাহেবরাও আসতেন তাঁর বাড়ি। রবিবার প্রার্থনা সভা বসত বাড়িতে। তার জন্য ছিল একটি বড় হলঘর। চামড়া সাহেবের ছিল অনেক কর্মচারী। চামড়ার কাজ ছাড়া ছিল চাষবাস। অনেক জমি জমাও করেছিলেন এদেশে। চামড়ার কাজের জন্য অনেক ঋষি জাতীয় কর্মচারী ছিল। তাদের বসতি করে দিয়েছিলেন নিজের বাড়ির পাশেই। আজও তাদের কয়েক ঘর এখনও ঝুড়ি, চাঁচ, ধামা, কুলো ইত্যাদি বাঁশের ও বেতের কাজ করে কোন রকমে টিকে থাকার চেষ্টা করছে। চামড়া সাহেব আর তাঁর মেম যাতায়াত করতেন, বেড়াতেও বের হতেন সে জন্য তখনকার সেরা যানবাহন হিসাবে তাঁর ছিল ষোল বেহারার পালকি। সে কারণে ঋষি পাড়ার পাশেই ছিল বেহারা পাড়া। আজও পাইকপাড়ায় বেহারা পাড়া নামে পাড়া বর্তমান আছে। এখন আর পালকি নেই সুতরাং বেহারাও কেউ নেই। সাহেবের বেহারাদের মধ্যে দুই জন বেহারা হানিফ আর কেফাতুল্লা। তারা দুই ভাই। সাহেবের অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠে। তারা বেহারাদের খবরদারি করার ভার পেল। ক্রমে সাহেবের মূল কাজের কিছু কিছু দায়িত্বও তারা পালন করত। এইভাবে তারা ঐ ব্যবসায়ে যথেষ্ট দক্ষতা লাভ করে।

সাহেবের একমাত্র পুত্র ইংলণ্ডে থাকত তার দিদিমার কাছে। সেই ছেলের রোগের সংবাদ এল ইংলণ্ড থেকে। সাহেব ও মেম অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। তখনকার দিনে যাওয়া আসা খুব সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এদিকে ব্যবসাও কারও হাতে দেওয়া সম্ভব নয়। স্বজাতি কেউ নিলে আর ফেরৎ দেবেনা। এই সব বিবেচনা করে তাঁরা উভয়েই অত্যন্ত অস্থির হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত হানিফ আর কেফাতুল্লার হাতেই সকল দায়িত্ব দিয়ে যান। যাবার সময় বলে যান যদি ব্যবসায় ঠিকমত চলে আর লাভ দেখাতে পারে তা'হলে তাদের উপযুক্ত পুরস্কার তিনি দেবেন। হানিফ

আর কেফাতুল্লা ব্যবসায় পরিচালনা করতে লাগল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর সাহেব ফিরে এলেন। দেখেন হানিফ ও কেফাতুল্লার অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি যা ছিল তাই আছে। কিন্তু তাঁর ব্যবসায় আশাতীত লাভ হয়েছে। তাঁর থেকেও তারা দুই ভাই অধিক লাভ দেখিয়েছে। সাহেব তাদের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। একমাত্র পুত্রের বিয়োগে ব্যবসায়ে বীতস্পৃহ হয়ে পড়েন। বিশেষ করে তাঁর মেমসাহেবও সঙ্গে আসেন নি। চামড়া সাহেব সমস্ত জমি-জমা বাড়ি আর প্রভূত সম্পদ দেন ঐ দুই ভাইকে। চলতি কারবারও রইল তাদেরই হাতে। কিছুকাল থাকার পর চামড়া সাহেব দেশে চলে গেলেন। পালকি বাহক এইভাবে সততা আর কর্মক্ষমতার জোরে পালকির সোয়ারি হয়ে উঠলেন। পরে পরিণত বয়সে দুই ভাই মক্কা তীর্থে যাত্রা করে। হাজী হয়ে দেশে ফেরে। সেই থেকে তারা হাজী হানিফ ও হাজী কেফাতুল্লা নামে পরিচিত হয়।

সাহেবদের যে ঘরে প্রার্থনা সভা বসত সেই ঘরকেই তারা রূপ দেয় মসজিদরূপে। দীর্ঘ দিনেও ঐ বাড়ি আর মসজিদ অক্ষত অবস্থায় আছে। বাড়ির প্রতিটি ঘরে পঙ্খের কাজ, চুনকাম করার দরকার এত কালেও হয়নি। বৃহৎ মসজিদ আজও সেই অবস্থায় আছে।

হাজী কেফাতুল্লার কোন সন্তান ছিল না। হাজী হানিফের একমাত্র পুত্র বরি মহাম্মদ সরকার। অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। ব্যবসায় ধ্বংস তাঁর সময় থেকেই হয়। তিনি কলিকাতায় থাকতেন। মাঝে মাঝে কলিকাতা থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে নবাবী কেতায় পাইকপাড়ার বাড়িতে আসতেন। তখন রেল ছিল না ১৮৭৮/৭৯ সালের কথা। তাঁর লাম্পট্য আর অত্যাচারের ভয়ে গ্রামবাসীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত। তাঁর পুত্র হাজী আবদুল ওয়াছেল সরকার। তিনি ধর্মভীরু লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁর পিতা বরি মহাম্মদ উচ্ছৃঙ্খল জীবনে যে পাপ অর্জন করেছিলেন পূর্ব পুরুষ ও পরপুরুষের সকল তীর্থফল দিয়েও তার পূরণ হয়নি। তাই ঐ বংশের ভাঁটার টান কেউ রোধ করতে পারেননি। আজও সেই বংশের কিছু বংশধর বর্ত্তমান আছেন কিন্তু ঐ গৃহে আর তাঁদের স্থান নেই সকল সম্পত্তিই হস্তান্তরিত হয়েছে।

পাইকপাড়া গ্রামে একমাত্র চামড়া সাহেবের বাড়ি ছাড়া আর অট্টালিকা ছিল না। বর্ত্তমানে তদপেক্ষা সুদর্শন একাধিক গৃহও হয়েছে। পাকাবাড়ির সংখ্যাও এখন অনেক। বঙ্গভঙ্গের পর বহু বাস্তুত্যাগী ঐ গ্রামে এসেছেন। আবার স্থানের গুরুত্ব উপলব্ধি করেও অনেকে ঐ স্থানে বসবাস করছেন।

শ্রমিক, মুটে, মজুর, শকটচালকের নিত্য আনাগোনা। এছাড়াও আছে গ্রামের কৃষিজীবী অধিবাসী। প্রাচীনের সঙ্গে বর্ত্তমানের সমন্বয় ঘটেছে। নীলকর কুঠিয়াল সাহেবদের অত্যাচার যাঁরা সহ্য করেছেন, যাঁদের পূর্ব্বপুরুষদের মাথায় কাদা দিয়ে সাহেবরা নীলের চারা তৈয়ারী করত কাজে অক্ষমতা জানানর শাস্তি হিসাবে, তারা এই স্বাধীন ভারতে যে এখন মানুষের মর্যাদা পেয়েছেন একথা বলার অবকাশ কোথায়। এখনও বেহারা আছে, তবে তা পালকির নয়, রিক্সার। যান্ত্রিক যুগে প্রগতিশীল সমাজে যানের আর বাহকের রূপান্তর ঘটেছে। মানুষের বাঁচার জন্য সংগ্রাম বেড়েছে, কমেনি। তাই বেকার আছে, অর্ধবেকার আছে, আছে ভিক্ষা, আছে খয়রাতি সাহায্য ড্রাইডোল। তাই পাইকপাড়া আজও পাইক ধর্ষিত। নীল কুঠিয়াল সাহেবদের জুলুম চলছে একইভাবে অন্য পথে। সুযোগ সন্ধানী কারও কারও আর্থিক উন্নতি ঘটলে তাকে সামগ্রিক উন্নতি বলা চলে কি?

২২

ঘাটবাঁওড়

পাইকপাড়াব উত্তব-পশ্চিম সীমাবেখা দিযেই ঘাটবাঁওড সীমানা আরম্ভ
ঘাটবাঁওড গ্রামেব কথা বলতে গেলে প্রথমেই ব'লতে হয বাঁওডেব কথা। ঘাটবাঁওডেব এ বাঁওড এখন দেখলে মনে বিশ্বাস হ'তেই চাইবে না যে একদিন গভীব কাকচক্ষু জল বাতাসে হিল্লোল তুলত। চকাচকি, ডাহুব-ডাহুকি সকল সময সঞ্চবমান থাকত আব শীতকালে নানা বকমেব মৌসুমী পাখি এসে চাবিদিক কূজনে মুখব কবে তুলত। শালুক, কমল ফুটত এই বাঁওডেব জলে। এই জলই একদিন তীবেব অধিবাসীদেব পানীয ছিল।

ঘাট বাঁওডেব উৎপত্তি বেশীদিনেব নয। বর্গীব অত্যাচারের ভযে কযেক ঘব লোক গঙ্গাব পবপাব বর্দ্ধমান অঞ্চল থেকে এই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে আসেন। শোনা যায ঘটক উপাধিধাবী যাঁবা তাঁবাই দলেব নেতৃত্ব কবেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল মালো, কুম্ভকাব, যাদব, কর্মকাব প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণেব কযেক ঘর গৃহস্থ। সেই দলেব বর্ণশ্রেষ্ঠ ঘটক ব্রাহ্মণ সুতরাং নেতৃত্ব তাঁদেবই ছিল। তাঁবাই জঙ্গলাকীর্ণ এই অঞ্চল পবিষ্কাব করেন এবং বসতি স্থাপন কবেন। বাঁওড়ের দৃশ্য তাঁদের মুগ্ধ করে। বাঁওড়ের ঘাটও একটা করেছিলেন। আজ তা লুপ্ত হলেও বাঁওড ও ঘাট এই দুটি শব্দের সংমিশ্রণেই এই স্থানের নাম পরবর্তীকালে ঘাটবাঁওড রূপ গ্রহণ করেছে। পরবর্তীকালে মুসলমান কয়েক ঘরও ঐ বাঁওড়ের তীরে বসতি স্থাপন করেন। তাঁরাও ঐ একই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন এই কথা তারা বলেন। এখন সেই মুসলমান পল্লীই হাজিপাড়া।

ধীরে ধীরে লোক চক্ষুর সামনেই নদীতীরে গড়ে উঠল গঞ্জ। নাম হল রাণীগঞ্জ। বিরাট তার পশ্চাদভূমি। আজ তার স্মৃতিচিহ্ন কিছু নেই এমন কি সে নামও লোকে ভুলতে বসেছে।

ঘাটবাঁওড় গ্রামে যেতে গেলে দেখা যাবে রয়ড়া রাস্তার বাঁপাশে দক্ষিণ-বাহিনী নদী ইছামতী আর ডান পাশে বাঁওড়। বাঁওড় এখন সকীর্ণ হয়ে পড়েছে, সৃষ্টি করেছে কৃষিকাজের উপযুক্ত ভূমি। সেখানে কৃষকেরা আবাদ করেছেন। পূর্বে বাঁওড় আর নদীর সঙ্গে যোগ ছিল, বিরাট খাল ছিল। প্রতি বর্ষায় নদীর জল আর মাছ আসত বাঁওড়ে। এখনও পূর্বের সে রাস্তা আর খালের উপরের সাঁকোর ভগ্নাবশেষ বর্তমান আছে। সে নদীও নেই আর নদী সৃষ্ট বাঁওড়ের শেষ দশা। শেওলা, কচুড়ী পানায় ভর্তি জল অব্যবহার্য। একদিন যে বাঁওড়ে ছিল অজস্র মাছ আর আজ বাঙ্গালীর মৎস্য সঙ্কটের দিনে সেই বাঁওড় মৎস্যহীন মানুষের অবহেলায়। এ অবহেলার প্রতিকারের পথ থাকলেও প্রবৃত্তি বা উৎসাহ নেই। গণতন্ত্রকে দীর্ঘদিন ধরে ব্যক্তিগত স্বার্থেই আমরা লাগাতে শিখে এসেছি। এ পর্যন্ত ভাষণ, পরিকল্পনা, নানা দল আর মতাদর্শের প্রচারের ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। নূতন সৃষ্টিতে আনন্দ আছে, খ্যাতি আছে। তাই প্রাচীনের সংস্কার করে কাজে লাগাতে চাইনা। মাছের সন্ধান করতে সমুদ্র গর্ভে লক্ষ লক্ষ টাকা বিসর্জন দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করি। মৃতপ্রায় নদীর সংস্কারের কথা ভুলে গিয়ে ভূপৃষ্ঠের গভীরতম প্রদেশে জলের সন্ধান করে আনতে বিদেশীদের হাতে কোটি কোটি অর্থ তুলে দিই, চাঁদে আমরা কৃত্রিম প্রকৃতি সৃষ্টি করতে চাই পৃথিবীর স্বাভাবিক প্রকৃতিকে বাঁচাবার অবকাশ নেই। গতিশীল সভ্যতার পথের ধারে কত আবর্জনা জমে। পিছনে ফিরে সাফ সাফাই করে এগিয়ে যেতে ক'জনে চায়। এই বাঁওড়ে একদিন পাট পচানোর নিষিদ্ধ ছিল। আজ সেই বাঁওড়ই আশে-পাশের বহু গ্রামের পাট পচানো একমাত্র জলাশয় হয়েছে। সুতরাং বাঁওড় পঙ্কিল আর অগভীর হয়ে ভরাট হয়ে উঠেছে দিন দিন। সেই ভরাট হওয়া জমিতে কেউ করছে আবাদ আবার কেউ বা পুকুর কেটেছেন। কয়েকবার অনেকে জমা নিয়ে মৎস্য চাষ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু স্থানীয় কয়েক-খানি গ্রামের চাষীদের পাট পচানোর দাবীর কাছে টিকে থাকতে পারেনি তাঁরা। ব্যর্থ হয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন।

দূর থেকে বাঁশ আম ও নারিকেল কুঞ্জে ঘেরা বাঁওড়ের ধারে গ্রামখানি ছবির মত দেখায়। গ্রামের প্রথম প্রবেশ পথে নদীর ধারে সরকারী পি, টি, স্কুল যা আগে ছিল জি, টি, স্কুল। চার কক্ষযুক্ত অট্টালিকায়

স্কুল বসে ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের নিয়ে। এছাড়া আছে শিক্ষার্থী শিক্ষকদের আবাস। তাঁদের পাকশালা হিন্দু এবং মুসলমান পৃথক পৃথক। আর আছে প্রধান শিক্ষকের আবাস। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৬-১৭ সালে। পূর্বে বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ছিল। তখন ছিল ইটের দেওয়াল যুক্ত খড়ের চালা একখানি গৃহ। বর্তমানে সেই সম্পত্তি হাই স্কুলের। সেখানে বিদ্যালয়ের দ্বিতল অট্টালিকা যার উপর তলায় টিনের ছাদ।

পি, টি, স্কুলের পাশেই দেখা যাবে দু একটি বট ও অশ্বথ বৃক্ষ। বঙ্গভঙ্গের পূর্বেও ছিল সাত আটটা বৃহৎ বটবৃক্ষ। আর তার তলাতেই বসত রাণীগঞ্জের বিরাট হাট। অতীতে মানুষের মঙ্গল চিন্তা করেই বট অশ্বথ গাছ ছেদন নিষিদ্ধ ছিল। এখন সে ধর্মীয় অনুশাসনে সমাজ পরিচালিত হয় না, তাই মানুষের আশু ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাতেই সেই সকল বৃক্ষ দেবতারা আত্মদান করেছে। সকলের মঙ্গলচিন্তা বাক্যে প্রকাশ করলেও বাস্তবে উৎসাহ তার নিদর্শন বড় দেখা যায় না। আত্মোন্নতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতৃত্বকে প্রলুব্ধ করে একথা বলার যথেষ্ট অবকাশ পাওয়া যায় সেই বৃক্ষকুলের নিধনে।

বনগ্রামের উৎপত্তি আর সীমানা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাণীগঞ্জের সে হাট ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগল। শনি ও মঙ্গলবারে এই হাট বসত। তখন মণিগঞ্জ-মতিরগঞ্জ হলেও হাট ছিল না। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই হাটখোলায় সৈন্যেরা ঘাঁটি করল সে কারণে হাটের শেষ রশ্মিটুকুও মিলিয়ে গেল। এই রাণীগঞ্জের হাট আর গঞ্জ তখনকার দিনে খুব প্রসিদ্ধ ছিল। সারিসারি দোকান পসার সকল সময় লোকজনের আনাগোনা কলকোলাহলে জমজমাট থাকত। হাটের নিচেয় বাজারের ঘাটে সারি সারি অগণিত নৌকা বাঁধা থাকত। মাঝি মাল্লার হাঁক ডাক সকল সময়। তারা বইত মাল, বইত সোয়ারি। দূর দূর অঞ্চলে পাড়ি জমাত। তখন পথ বলতে নদী পথের প্রাধান্যই বেশী ছিল। ঘাটবাঁওড়ের রাণীগঞ্জের স্মৃতি ম্লান হয়ে গেল। বর্তমানে প্রাচীন অধিবাসীর সংখ্যা নবাগতের তুলনায় কম। বিশেষ করে এই গ্রামের পাশে মৃধা পাড়ার মুসলমানেরা বেশীর ভাগ গৃহস্থই বিনিময় সূত্রে চলে গেছেন পূর্ববঙ্গে। তবে হাজীপাড়ার সকলেই আছেন, বিনিময়ও কেউ করেন নি।

পথ ধরে অগ্রসর হলে দেখা যাবে বাঁ-ধারে ধীবর পল্লী তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট তেঁতুল গাছ। তার তলায় চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন উৎসব হয়। অতীতের সে জৌলুস স্তিমিত। স্থানও অনেক সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে।

ক্রমশ প্রাচীন উৎসবে ভাঁটা পড়ে আসছে। তবে এখনও সে উৎসবের উৎস বন্ধ হয়ে যায় নি। মানুষের অতীতের আবেগ আছে কিন্তু প্রাচুর্যের অভাব সমধিক। আচার আচরণের গ্রন্থি আছে কিন্তু শিথিল। ধীবর শ্রেণীরাই এই গাজন উৎসবের উদ্যোক্তা। আজ তারা রুজিহীন। তাদের পূর্ব পুরুষদের ব্যবসায়ে আর দিন চলে না। যাঁরা এখনও পৈতৃক ব্যবসা চালাতে চেষ্টা করছেন তারা মৎস্যহীন নদী আর বাঁওড়ে অসার চেষ্টায় জীবনমৃত। এখন অনেকেই অন্য বৃত্তি নিয়েছেন। চাষবাস, চাকুরি, ব্যবসা তারা সবই করেন কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে কারও অবস্থার স্বচ্ছলতা আসেনি। দিন কাটে এই মাত্র বলা চলে। আবার অনেকের ঘরে হাহাকারও আছে, হতাশাও আছে। এই পল্লীতে একদিন চালে চালে গৃহস্থের বাস ছিল। বৃটিশ শাসনে অবহেলার যুগে ম্যালেরিয়া আর কলেরায় বছর বছর জন সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে, বহু পতিত ভিটে আজো পড়ে আছে বা নবাগতেরা ঘর বেঁধেছেন বঙ্গভঙ্গের পর।

ধীবর পল্লীর পূর্বপাশে কুম্ভকার পল্লী ও যাদব পল্লী। তার অবস্থাও অনুরূপভাবে শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। এখন দু'একখানি অট্টালিকা দেখা গেলেও যাদবরা এখন গোধন হারা অনেকেই কৃষিজীবী। তাঁদের সে গরুর পাল সকালে মাঠে যায় না, ধূলি উড়িয়ে গোধূলি লগ্নেরও সৃষ্টি করে না। কুম্ভকারদের পূর্ব পুরুষদের ব্যবসায় এক প্রকার গত; তাঁদের আর সে ব্যবসায়ে বাঁচার মত উপার্জন নেই। তাই নানাভাবে বেঁচে থাকার লড়াই করছেন। রাণীগঞ্জের ব্যবসায়ীরা এখন ছন্নছাড়া।

পিচ ঢালা পথের ডানধারে ব্রাহ্মণ পল্লী। প্রবেশ করলেই দেখা যাবে ভগ্ন ইটের স্তূপ। । চক্রবর্তীদের জীর্ণ দ্বিতল অট্টালিকা, খসে পড়েছে। বাহির প্রাঙ্গণের বৈঠকখানা অবলুপ্ত তার উপর মাটি ধসে ঢিপি হয়েছে। একপাশে শিবমন্দির আজও দাঁড়িয়ে আছে। নিত্য পূজাও হয় গৃহ দেবতার। কিন্তু আজ সে জমিদারী নেই, সে দিনও নেই। রুজিরোজগারের জন্য অনেকেই প্রবাসে আছেন। যাঁরা এখনও মাটি আঁকড়ে আছেন তাঁদের তাল পুকুরে আর ঘটি ডুবছে না। তিনশত বৎসরের প্রাচীন মন্দিরে জৌলুস নেই তবে এখনও খসে পড়েনি। চক্রবর্তীরা ঘটকদের দৌহিত্র বংশ। এছাড়া মুখোপাধ্যায়রাও ছিলেন। শোনা যায় এককালে পঞ্চু মুখুজ্যের দাপট ছিল প্রবল। তার বংশধরদের আর কেহ গ্রামে নেই। এখন যাঁরা বাহিরে থাকেন তাদের খবর অনেকেই রাখেন না। গ্রামের সঙ্গে অনেকের যোগাযোগ নেই। যাঁরা গ্রামে আছেন তাঁরা বেঁচে থাকার জন্য আছেন। সুতরাং

জীবন সংগ্রামের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষায় তাদেরও উৎসাহ নেই বড়।

তখনকার দিনে শিক্ষালাভের সুযোগ এ গ্রামে ছিল না। ম্যালেরিয়ার প্রকোপও ছিল প্রবল। গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তার ছিলেন রোগের সান্ত্বনা। পোষ্ট অফিসের কুইনাইন মুদীর দোকানে বিক্রি হত। অভাবে জরাজীর্ণ পতনোন্মুখ গ্রামখানা বাঁচাবার উপায় ছিল না। হতবাক পল্লীবাসীদের শিক্ষার কথা চিন্তা করার অবসর ছিল না। চক্রবর্তী বাড়িতেই বর্তমানে গ্রাম্য ডাকঘর বসেছে এখন। পূর্বে এ অঞ্চলের ডাকঘর বনগ্রামেই ছিল। বনগ্রাম থেকে বাগদহের মধ্যে গাঁড়াপোতা ছাড়া আর কোন ডাকঘর ছিল না।

ব্রাহ্মণপাড়ার পাশেই হাজীপাড়া। প্রবেশ পথে সাহেবপোতা। নীল কুঠিয়াল লালমোহন সাহেবের সমাধি এখানে। কোন স্মৃতি ফলক নেই। তার পাশেই এক নবাগত গৃহস্থের বাড়ি। তারপরই আমবাগানের মাঝে শত-বর্ষের অধিক দিনের প্রাচীন মসজিদ। এখন পারিবারিক সম্পত্তি। কিন্তু সর্বমুসলমানজন ব্যবহার্য। এই মসজিদের উত্তরাধিকার সূত্রে 'মাতোয়ারী' (তত্ত্বাবধায়ক) হাজী জহুরআলির কাছ থেকে হাজী সমশের আলি এবং তাঁর ভাই হাজী এরসাদ আলি কিনে নেন ১৯১৪ সালে। তাঁরা ভগ্নপ্রায় মসজিদ সম্পূর্ণ ভাবে সংস্কার করেন। হাজী ভ্রাতাদ্বয় ১৯২০ সালে একটি নারী শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন আজও সেটি বর্তমান। ঘরবাড়ি ভগ্নদশা। হাজীপাড়ায় দু'একজন হাজী থাকেন না এরকম অবস্থা কখনো দেখা যায় না—এজন্যই এই পাড়ার নাম হাজীপাড়া হয়েছে। হাজীপাড়ার অধিকাংশের ব্যবসা পুরাতন কাগজের। কলিকাতা বৈঠকখানা, মির্জাপুর ষ্ট্রীটে অনেকেরই দোকান আছে। আবার অনেকে ঐ সকল দোকানের কর্মচারী। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁদের সুবর্ণযুগ গিয়েছে। সে সময় কেহ কেহ কলিকাতা এবং অন্যান্য শহরে বাড়িঘরও করেছিলেন। আবার কেহ কেহ হৃত সর্বস্বও হয়েছেন।

বনগ্রামের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাণীগঞ্জের গৌরব রবি অস্ত গেল। হাজী-পাড়ার পূর্বপাশেই স্বর্ণশিল্পীদের বাস। রাণী আভরণহীনা। স্বর্ণশিল্পীরাও কর্মহীন হয়ে পড়লেন। অবস্থার চাপে তারা একে একে বনগ্রামে এসে আবার দোকান দিয়েছেন। কেউ আবার ভিটেয় থেকে দারিদ্র্যের যাতনা সহ্য করছেন সুযোগের অভাবে। রাণীগঞ্জের ব্যবসায়ীদের বংশধরদের যারা এখনও টিকে আছেন তাদের বর্তমান সমাজ জীবন সুন্দরই বলে মনে হবে। বর্তমানের কথা নয় অতীতেও ছিল হিন্দু মুসলমানের পাশাপাশি বাস। মন্দির-মসজিদও পাশাপাশি। মসজিদের আজানধ্বনিতে শিবের জটা খসে

পড়েনি , আবার কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজে রসুলের শান্তিভঙ্গ হয়নি। মুসলিম লীগের আমলেও এ গ্রামে কোন চাঞ্চল্য দেখা যায় নি। আজও সেই সহাবস্থানেই তাঁরা আছেন। পরস্পরের দুঃখের অংশীদার হয়ে অতীতের সুখস্মৃতি রোমন্থন করছেন। নবাগতের ভীড়ে চিত্ত চাঞ্চল্য হিন্দু-মুসলমান সকলের হয়েছিল ; কারণ স্বাভাবিকভাবে কেউ আসেননি। বহিরাগতকে স্বাগত জানাতে অনেকের অন্তরেই সাড়া জেগেছিল যেমন তেমন বিশ্বাসের অবিশ্বাসের প্রশ্নও দানা বেঁধেছিল। এখন অতীতের বৈশিষ্ট্যের আদর্শেই তারা সকল জীবন একসূত্রে গেঁথে ফেলেছেন বলে মনে হয়। তবে রাজনীতির উত্তাপ আজ সর্বত্র। সাম্প্রদায়িকতার উত্তাপ যাঁদের স্পর্শ করতে পারেনি তাঁরা রাজনীতির উত্তাপ থেকে রেহাই পাননি। রাজনৈতিক বর্ণ বৈষম্য আজ শুধু ঘাটবাঁওড়ে কেন বাংলার তথা ভারতের সর্বত্র। মনে হয় অতীতের সংস্কার আবার নূতন ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। প্রাচীন সমাজ বন্ধন ভেঙ্গেছিল ধর্ম ও বর্ণের বিভেদ সৃষ্টিতে, আর আজ জাতীয় সংহতিতে বহু ফাটল সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন মতাদর্শের উগ্র গোঁড়ামিতে।

২৩

গাঁড়াপোতা গোবরাপুর

সারা ভারতক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের প্লাবনে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ভেসে গেল। ভারতের বাইরেও সেই প্লাবনের উচ্ছ্বাস গিয়ে পৌঁছেছিল দিকে দিকে। গুপ্ত যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম আবার জেগে উঠল। গুপ্ত রাজারা বিশেষ করে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য তন্ত্র সাধনার অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের বিরোধী তান্ত্রিকগণ ভারতের বিভিন্ন অংশে সাধনক্ষেত্র স্থাপন করেন। বনগ্রামের এইরূপ একটি সাধনক্ষেত্রের পরিচয় পূর্বে দিয়েছি। এই গুপ্ত তান্ত্রিক সাধকগণের প্রতিষ্ঠিত আরও একটি সাধনক্ষেত্রের পরিচয় দিতে এ অনুচ্ছেদের অবতারণা।

গাঁড়াপোতা এখন বাঁওড়ের তীরে। পূর্বে ইছামতী নদীর তীরেই ছিল আজকের গাঁড়াপোতা, গোবরাপুর, কুঁদিপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি। ইছামতী এখন দূরে সরে অন্য খাতে বয়ে যাচ্ছে। পূর্বে যেখান দিয়ে বয়ে যেত সেখানে এখন প্রকাণ্ড বাঁওড়। বাঁওড় আর ইছামতীর মধ্যস্থলে একটি বিরাট চর সৃষ্টি হ'ল, সেখানে আবার কয়েকটি গ্রামও একে একে গড়ে উঠেছে। রাণীনগর, ভরতপুর, নূতনপুর ইত্যাদি গ্রামগুলি ঐ চরের উপর বর্তমান। ঐ গ্রামের লোকেরা প্রায় সকলেই কৃষিজীবী।

যখন গাঁড়াপোতা গোবরাপুর ইছামতী তীরে ছিল সেই সময়ে তান্ত্রিক সাধকগণের সাধনক্ষেত্র ছিল নিবিড় অরণ্যের মাঝে। গাঁড়াপোতার ৺ সিদ্ধেশ্বরী কালীর এখন কোন মূর্তি নেই। বটবৃক্ষতলে কেবল তার বেদী আর একখানি ঘর আছে। পূর্বে নিত্য পূজা হ'ত—অবশ্য গ্রাম প্রতিষ্ঠা

হওয়ার পর থেকে। গ্রাম্য জমিদার নিত্য পূজার ব্যয়ভার বহন করতেন। পূজারীর জন্য জমি এবং হাটে তোলার ব্যবস্থা ছিল। এখন সকলই বন্ধ। কেবলমাত্র মাঙ্গলিক ক্রিয়া কর্মে স্থানীয় অধিবাসীরা সিদ্ধিলাভের আশায় আগে ৺ সিদ্ধেশ্বরীর পূজা দিয়া তারপর নিজ নিজ অনুষ্ঠান করে থাকেন।

আর একটি ৺ কালীর বেদী আছে গোবরাপুর। তাকে ঘাটকুলের কালী বলা হয়ে থাকে। গ্রাম্য জমিদার রায়চৌধুরীরা যখন গ্রাম পত্তন করেন সে সময় জঙ্গল পরিষ্কার করতে করতে নিবিড় অরণ্যের মাঝে, বট বৃক্ষতলে এই বেদী আবিষ্কার করেন। সম্ভবতঃ বাঁওড়ের স্নানের ঘাটের নিকটে বলেই ঐ রকম নামকরণ করা হয়ে থাকবে। অবশ্য বর্তমানে ইট দিয়ে প্রস্তুত যে পাকা বেদী আছে তা বেশী দিনের নয়। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে স্বর্গত মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ বেদীটি বাঁধানোর ব্যবস্থা করেন। এখন সেখানে প্রতি বৎসর কালীপূজার রাত্রে পূজা হ'য়ে থাকে। গ্রাম্য আদি দেবতা হিসাবে আগে সেখানে পূজা করা হয়। তারপর বাড়ি বাড়ি পূজা পার্বণ যা কিছু হয়ে থাকে।

এই জঙ্গলাকীর্ণ গোবরাপুর-গাঁড়াপোতা গড়ে ওঠে বিরাট গণ্ডগ্রামে। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে ছয়ঘরিয়ার রায়চৌধুরী বংশের একজন তাঁদের জঙ্গলাকীর্ণ জমিদারী এলাকায় নতুন করে বসতি বিস্তারে মন দেন। প্রথমে তিনি সোনাই নদী তীরে এসে বসবাস করতে থাকেন। এখন সামান্য খালের রেখা সেখানে আছে। বর্ষাকালে জল চলে। এখন তার উপর একটা ছোট সাঁকো আছে, পাশে একটা বটগাছ। এখন লোকে সেই স্থানকে পেতেল বাগান বলে। এখন ঐ খালে ধান পাট চাষও আরম্ভ হয়েছে কয়েক বৎসর ধরে। ঐ স্থানে জলাশয় খনন করার কালে বড় বড় নৌকার ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়েছিল। তাতেই বোঝা যায় এককালে ঐ নদী খুব প্রশস্ত ছিল। এর কিছুদিন পরে জমিদার বাঁওড়ের সন্ধান পান এবং তখন ঐ বৃহত্তর জলাশয়ের তীর জঙ্গল পরিষ্কার করে গ্রামের পত্তন করেন। বহু ব্রাহ্মণ বিভিন্ন স্থান থেকে আনিয়ে তাঁদের জায়গা জমি দান করেন। তাঁর জমিদারীর দশ আনা অংশই ঐরূপে দান করেন। নিজ দখলে শেষ পর্যন্ত ছয় আনা অংশ থাকে। ধীরে ধীরে গোবরাপুর নানা বর্ণের জন-বসতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। রায়চৌধুরী, ব্রাহ্মণ জমিদার, নানাপ্রকার উৎসবের আয়োজন গ্রামে করার ব্যবস্থা করেন। সে সকল উৎসবের মধ্যে একটি আজও প্রচলিত আছে। প্রতি বছর বৈশাখ মাসের প্রথম দিন থেকে ঐ উৎসবের সুরু হয়। মহিষমর্দিনী দুর্গাপূজা। মহিষমর্দিনী পূজা ঠিক দুর্গা-

পূজার মতই হয়ে থাকে। তবে দেবীর মূর্তির সঙ্গে কার্তিক-গণেশের স্থান নেই। এই পূজা উপলক্ষে মহিষ বলি হত। এখনও ছাগ বলি হয়। মহিষ বলিও খুব অল্পদিন হল উঠে গেছে।

গাঁড়াপোতায় কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক বাণেশ্বর শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন এইরূপ জনশ্রুতি আছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বহু শিবলিঙ্গ বাংলাদেশে আছে। সম্ভবতঃ এটিও তার মধ্যে একটি। গাঁড়াপোতার বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ এখন ইছামতী তীরে বাজিতপুরে আছে। এই শিবলিঙ্গ ঐ স্থান হ'তে কোনো এক সময় অপহৃত হয়।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের চাপে পড়ে বৌদ্ধগণ যখন আশুতোষের পূজা আরম্ভ করে তখন ঘটা করে ঐ শিবের পূজা হ'ত। গাজনের সময় চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে দেল পূজাও হ'ত। ক্রমে গোবরাপুরে শৈব এবং শাক্তের সমন্বয় ঘটলো। কারণ বোধ হয় উৎসবের সময় এবং কাল একই ছিল বলে। গাজনের মূল সন্ন্যাসী যিনি হতেন তিনিই মহিষমর্দিনীর সম্মুখে বলি দিতেন। এখনও সেই প্রথা চলে আসছে। চড়কের বা দেল পূজার পূর্বরাত্রে নীল পূজায়ও বলি দেওয়ার প্রচলন হ'ল। কালক্রমে বৈষ্ণবগণও এই উৎসবে যোগদান করতেন। তাঁরা এই উৎসবকে কেন্দ্র করে শ্রীকৃষ্ণের পূজার প্রচলন করেন ও সেই উপলক্ষে গোষ্ঠ বিহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার বিভিন্ন মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করতেন। সেই উপলক্ষে বিরাট মেলাও বসত।

গাঁড়াপোতায় গণেশজননী পূজা প্রচলন হ'ল। তবে সেখানে কখনও বলি দেওয়া হয়নি। গাঁড়াপোতা-গোবরাপুরের এই নববর্ষের উৎসবে বাংলার শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের মিলনক্ষেত্রের সৃষ্টি হল। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বিরাট মেলা বসতে আরম্ভ করল। গোষ্ঠ-বিহারের মেলা ও প্রদর্শনী যে বিরাট আমবাগানে বসত এখন সে আমবাগান নেই, মেলাও আর বসে না। সেই বাগানের ঠিক কেন্দ্রস্থল ভেদ করেই বনগ্রাম-বাগদহ নতুন রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।

ঐ উৎসব এক পক্ষকাল চলত। চারদিনে দেবীর দর্পণ বিসর্জন হওয়ার পর দেবী প্রতিমা পনের দিন রাখা হ'ত। প্রতি রাত্রে যাত্রা, ঢপ, কীর্ত্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হ'ত। সাতদিনের দিন সন্ধ্যায় শিবের বিবাহ হ'ত। গাঁড়াপোতার শিব এবং গোবরাপুরের গৌরী। শিব মৃন্ময় আর গৌরী একটি আট থেকে বার বৎসরের কুমারী ব্রাহ্মণ কন্যা। গৌরীকে অপরূপ রত্নালঙ্কারে ভূষিত করা হ'ত। আটাশ জন বেহারা চতুর্দোলায় করে

গোবরাপুর থেকে গৌরীকে কাঁধে করে বহন করে নিয়ে যেত গাঁড়াপোতার দিকে। সে সময় বহু কন্যাযাত্রী আর নানা রকমের বিচিত্র সঙ্, নৃত্য, গীত-বাদ্য-সহকারে গৌরীর অনুগমন করত। হাজার হাজার নরনারী ঐ দিন ঐ উৎসব আর শিবের বিবাহ দেখতে বহু দূর দেশ থেকে আসত। ১৩৪৮ সালের (বঙ্গাব্দ) বৈশাখে শিবের বিবাহ শেষ হয়ে গেছে। শিবকে বিবাহ করবার জন্য আর কোন গৌরী গোবরাপুরের ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মায়নি। অনুষ্ঠানেরও ক্ষীণস্রোত তারপর তিন চার বৎসর ছিল মাত্র। এখন কেবল প্রথা হিসাবে মহিষমর্দিনী নববর্ষে দর্শন দিতে আসেন। আর সবই শেষ।

এই মেলা বসত দু'মাইল জায়গা জুড়ে রাস্তার দু'পাশে। সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিস এই মেলায় আমদানী হ'ত। তখনকারের দিন রাস্তাঘাট এবং যানবাহনের এত উন্নতি হয়নি। শহর বাজারও অনেক দূরে। সে কারণে এ মেলার গুরুত্বও ছিল অনেক। বহু গৃহস্থ এই মেলায় সারা বছরের সাংসারিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনে রাখতেন। চাল, ডাল, মসলা-পাতি, মাদুর, কৃষিকর্মের যন্ত্র, আসবাবপত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ আরও কত কি! গোবরাপুরের জমিদার রায়চৌধুরীরাই এই উৎসবের উদ্যোক্তা। ক্রমে এই উৎসব গ্রামের জনসাধারণের হাতে যায়। জমিদারদেরও অবস্থায় ভাঁটা পড়ল। গ্রামের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ধ্বংসের পথে। যাঁরা একটু সঙ্গতিসম্পন্ন তাঁরা শহরাঞ্চলে বসবাস করতে গেলেন উচ্চবৃত্তির সন্ধানে। উৎসবের ঘটা আর থাকল না। এখন পূজা, গাজন উৎসব হয় বটে কিন্তু সে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ কলরোল আর নেই। আর্থিক সংকট, রাজনৈতিক মতভেদ, যান্ত্রিক সভ্যতার চাপ ইত্যাদিতে গ্রাম্য উৎসব, আনন্দ ভক্তি ও বিশ্বাস সকলই প্রাণহীন করে দিয়েছে।

ইংরাজী ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর স্বর্গত মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বদান্য জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় সুধীন চট্টোপাধ্যায় বহু অর্থ-ব্যয়ে পূজার মন্দিরের সম্মুখে একটি স্থায়ী নাটমন্দির নির্মাণ করে দিয়েছেন। এখন সেই নাটমন্দিরে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

এখন পথ ঘাট, যানবাহনের অনেক সুবিধা হয়েছে, লোকের বসতি আবার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু হায়! ছিন্নমূল বাংলার বাঙ্গালীর আজ হৃদয়ের আনন্দের উৎস শুকিয়ে গেছে। এখন পূজা ও উৎসব আনুষ্ঠানিকভাবে হয়ে থাকে এইমাত্র। পথঘাট ভাল হওয়ায় শহরাঞ্চলে যাতায়াতের সুবিধা হয়েছে বলে মেলার প্রয়োজনও অনেক অংশে কমে গেছে। তবুও মনে হয় সেই অতীত পল্লীজীবন যেন স্বপ্নের মত সুন্দর।

যাঁরা সেই অতীত দিনের উৎসব আনন্দ প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা ক্ষণেক্ষণে নিজেদের হারিয়ে ফেলেন অতীত স্মৃতির মাঝে। শুধু বনগ্রামে কেন বাংলার দিকে দিকে সকল আনন্দস্রোত আজ স্তিমিত। আজ যাকে আমরা আনন্দ, সংস্কৃতি বলে গর্ব করি অতীতের তুলনায় তা' রুক্ষ কপট ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

২৪

মড়িঘাটা

বনগ্রাম থেকে বনগ্রাম-বয়ড়া সড়ক ধরে ছয়মাইল উত্তর পশ্চিমে গেলে গোবরাপুর। বয়ড়া রাস্তার থেকে গোবরাপুর গ্রামের মধ্য দিয়ে পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছে পিচঢালা রাস্তা মড়িঘাটা, ইছামতী নদীর তীর পর্যন্ত। তারপরই খেয়াতরী পৌছে দেবে ইছামতীর পরপারে। এই রাস্তাটা সম্পূর্ণ এখন পিচের হয়নি। গোবরাপুরের পাশের গ্রাম কেউটেপাড়ার শেষ সীমা পর্যন্তই পিচ দেওয়া পাকা রাস্তা। তারপরই মড়িঘাটা গ্রামের সীমা আরম্ভ থেকে ইছামতী নদীর তীর পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। মড়িঘাটা এতদ অঞ্চলের মহাশ্মশান। মড়ি পোড়ান হয় বলে ঐ গ্রামের নামও মড়িঘাটা হয়েছে। বহু প্রাচীন কাল থেকে আশপাশের গ্রাম এমনকি বার তের মাইল দূরের গ্রাম থেকেও শব নিয়ে আসা হয় এই মড়িঘাটার শ্মশানে দাহ করার জন্য। ইছামতীর পূতসলিল সেই অতীত দিন থেকে ধুইয়ে দিচ্ছে মানবের সকল অহঙ্কার, সকল গরিমা, এত যত্নের দেহের ভস্মাবশেষ। এই শ্মশানের পাশেই খেয়াঘাটের উপর উঁচু পাড়ের প্রশস্ত স্থান জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন বটগাছ। তার বয়স কত কে তা নির্ণয় করবে। দেহ ও বয়সের ভার রক্ষা করার জন্য কত ঝুরি নামিয়ে আসছে বছর বছর আর কত বোয়া তৈরি করে আসছে মানুষের চোখের সামনে, আবার কত ডাল কত ঝুরি শুকিয়ে যাচ্ছে কেই বা তার হিসাব রাখছে বা লক্ষ্য করছে। দীর্ঘদিনে ধীরে ধীরে প্রকৃতির পরিবর্তন, তাই মানুষের নজরে আসে না। স্বল্পস্থায়ী জীবনে মনুষ্য প্রকৃতির পরিবর্তন মানুষের হিসাবে

থাকে তাই তার প্রতিবাদ করার অবকাশ থাকে। দ্রুত প্রাকৃতিক পরিবর্তনে প্রতিবাদ করার অবকাশও থাকে না।

এই বটগাছের তলায় আর আশপাশে পথের ধারে কয়েকটি দোকান, আড়ৎ। যান্ত্রিক যুগে চাল ও গম ভাঙ্গান কলও বসেছে। অবিরত অনেক রাত্রি পর্যন্ত তার বিজয়বার্তা ঘোষণা করছে তার যান্ত্রিক শব্দে। এই গাছতলাতেই সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে, মঙ্গলবারে আর শুক্রবারে। দোকান পশারে সকল সময়ই লোকজন আনা গোনা করে। চায়ের দোকানও আছে। সেখানেও সামনে পাতা বেঞ্চিতে বসে গ্রামের ও পথ চলতি লোকেদের দেখা যায় নানা কথোপকথন করতে।

এ রকম দৃশ্যত আজকাল প্রায় গ্রাম অঞ্চলেই দেখা যায়, সুতরাং এটা আর এমন কিছু কথা নয়। মড়িঘাটার ও অতীত ছিল। বর্তমান বেদনা দায়ক বলে ঐ গ্রামের অধিবাসীরা এখন অতীতের কথাটাই যেন বলতে আনন্দ পায়।

মড়িঘাটা আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম। এ গ্রামের পত্তন হয়েছে বৃটিশ কোম্পানীর নীলকর কুঠিয়াল সাহেবদের আমলে। নীল কুঠিয়াল সাহেবরা তাঁদের নীল চাষ করার জন্য শ্রমিক এনেছিলেন সাঁওতাল পরগনা থেকে। এই আদিবাসীরা তাঁদেরই বংশধর। কুঠিয়াল সাহেবদের আমলে তাঁরা সাহেবের নীলের জমি চাষ করতেন। নীল তৈরী করতেন ন্যূনতম মজুরীতে। এ ছাড়া তাঁরা শিকার প্রিয় জাতি, সে কারণে তখনকার দিনে বন জঙ্গল ঢাকা ঐ অঞ্চলে করতেন শিকার। বন্য বরাহ ছিল তাদের প্রধান শিকার। সড়কি, বল্লম, তীর-ধনুক এই ছিল তাদের শিকারের অস্ত্র। আর সঙ্গে থাকত শিকারী কুকুর। অনেক সময় বন জঙ্গল জাল দিয়ে ঘিরে ফেলেও শিকার করা হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত কাঠুরের কাজ করত তারা। তখন এ অঞ্চলে কয়লার ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল। এমন কি কাছাকাছি শহর অঞ্চলেও কাঠের ব্যবহারই ছিল বেশী। কাঠের অভাবও তখন ছিল না।

এই আদিবাসীরা ছড়িয়ে আছে বনগ্রাম মহকুমায় বিভিন্ন গ্রামে। এদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগও আছে। যারা সাঁওতাল তাদের দেখা যায় মন্নহাটি, জয়পুর আর এই মড়িঘাটায়। এ ছাড়া বনগ্রামের বাহিরে শ্রীপুর, বলাগড়, মহেশগঞ্জ (নবদ্বীপ), বর্দ্ধমানে কমলাপুর, কালিকাতলায়ও এঁদের আত্মীয় স্বজন আছে। এদের বৈবাহিক সম্পর্ক এই সকল অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। এ ছাড়া শিমুলিয়া শ্রীনগরের আদিবাসীরা মুণ্ডা ও ওড়াং জাতির বংশধর। ধুলুনি, ময়না দোয়া আর গোচাখালিতে আছে ওড়াং শ্রেণীর আদিবাসী।

বৃটিশ কোম্পানি কত প্রলোভন আর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভাঁওতা দিয়ে এই সব অশিক্ষিত কর্মঠ মানুষগুলোকে পাহাড়-পর্বতের লীলা নিকেতন থেকে বাংলার এই সরস সমতল মাটিতে নিয়ে এসেছিল সে খবর আর কে দেবে?

মড়িঘাটার এই আদিবাসীদের বর্তমান অবস্থা শোচনীয় হলেও নীলকর কুঠিয়ালরা চলে যাবার সময় সমস্ত জমিজমা এদের দিয়ে যান। এরা এ দেশের কৃষকদের মত চাষ আবাদ করে গড়ে তুলেছিল কৃষিপ্রধান গ্রাম, পেয়েছিল সুষ্ঠু জীবনের সন্ধান। চাষী গৃহস্থের সংখ্যাই ছিল বেশী আর কিছু ক্ষেত মজুর। তারা শিকার করত, হাঁড়িয়া খেত আর গান বাজনা করত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই তাদের সেই জীবনের ছন্দপতন ঘটেছে। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ বাইশ বছর কাটছে তাদের অবহেলার মধ্য দিয়ে।? নিদারুণ অভাবের সম্মুখীন হয়ে তারা তাদের ভিটে জমি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। সুযোগ সন্ধানী লোকেরা গ্রাস করেছে তাদের অভাবের সুযোগে জ মজমা। বর্তমানে ১৩৭৬ মড়িঘাটায় আশি ঘর লোকের বসবাস। তার মধ্যে মাত্র দু'ঘর লোকের কিছু চাষের জমি আছে। এই দু'জনের মধ্যে এক জনের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল। বর্তমানে গ্রামের নেতৃত্বও এক রকম তারই হাতে। ঐ দু'ঘর বাদে সারা গ্রামখানায় একজন গৃহস্থেরও ঘরের চালে খড় দেখা গেল না। গ্রামের মাতব্বর ছিলেন একদিন রাম সর্দার। সাতফুট লম্বা দেহ বয়সের ভারে ও দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর আঘাতে ন্যুব্জ। তাঁর দু'টি মাটির ঘরে বর্ষার জল রক্ষা করতে খড়ের চালে বস্তা চাপা দেওয়া হয়েছে। বারান্দার চাল নেই। আর একখানা ঘরের দেওয়াল ধসে গিয়েছে। এই পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধের একদিন দোনালা বন্দুক ছিল। বাঘ শিকারী হিসাবে এ মহকুমায় নামও ছিল যথেষ্ট। আজ তাঁর শেষ জীবনে আছে হতাশা। কাঠা পনের ভিটেজমি ছাড়া পেটের দায়ে একে একে সবই গিয়েছে। এই পল্লীর নারী পুরুষ সকলেই এখন শ্রমিক। আসপাশের গ্রামে মজুর খাটে। দু'একজন গৃহস্থের বাড়ি মাত্র দু'একটা গবাদি পশু বা মুরগী দেখা যায়। কেবলমাত্র নিরাপদ সর্দারের ইটের দেওয়াল টালির চাল দু'খানা ঘর। তাঁর পনের বিঘা জমিও আছে।

হাটখোলার ঐ বটবৃক্ষতলে বছর তিনেক হল কালী মূর্তির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নিত্য পূজা হয়। একটা ছোট পাকা ঘরও হয়েছে। হাটখোলার পাশেই ইছামতী নদীর ধারে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়। ইটের দেওয়াল টিনের চাল। সামনে টালির বারান্দা। গ্রামে শিক্ষিত যুবক বলতে তিন জনকে বলা যায়। স্কুল ফাইনাল একজন, অষ্টম শ্রেণী একজন আর একজন বি, এ, ক্লাসের ছাত্র। দারিদ্র্যের কঠিন আঘাতে এই আদিবাসীদের সমাজ

জীবন ভেঙ্গে পড়েছে। ক্লাব ঘর আছে। পূর্বে নিত্য মহলা বসত। যাত্রার দল ছিল। এখন সে উৎসাহ আর নেই। সবই আছে কিন্তু কিছুই নেই। অন্ন চিন্তায় সে আনন্দের উৎস শুকিয়ে গেছে। তাই সারা গ্রামখানা অতী-তের স্মৃতি রোমন্থন করে বেঁচে আছে। তাদের জীবন এখন স্বাভাবিক নয়। অভাবের তাড়নে সমাজ বিরোধী কাজ করেও তাদের জীবন বাঁচাবার চেষ্টা করতে হচ্ছে, এ লজ্জার কথা তাঁরা নিজেদের মুখে স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হন না। বোধ হয় সাঁওতালী রক্তের স্বাভাবিক সরলতা তাঁদের সত্য কথা বলতে বাধ্য করে।

এই গ্রামে একটা বিরাট মেলা বসে মাঘী পূর্ণিমার দিন। চার পাঁচ দিন ধরে গ্রামখানি হয়ে ওঠে উৎসব মুখর। এই মেলা খুব অধিক দিনের নয়। বিগত বাংলা ১৩৪৫ সালে প্রথমে এই মেলা বসে। এই মেলা হয় গঙ্গাপূজা উপলক্ষ করে। এই পূজা আর মেলার অলৌকিক কাহিনীও আছে। যদিও অলৌকিক তবুও বাস্তব সত্য ঘটনাগুলিকে উপলক্ষ করেই এই মেলার অনুষ্ঠান হয়ে আসছে প্রতি বছর। এ কথা গ্রামবাসীরা জোর করেই বলেন।

১৩৪৫ সালে পৌষ মাসে কেউটে পাড়ার মহম্মদ নেপাল মণ্ডল এবং নিত্যগোপাল অধিকারী একই রাতে একই স্বপ্ন দেখলেন। মকর বাহিনী গঙ্গা মড়িঘাটায় ইছামতী নদীর ঘাটে ভাসছেন। আর আদিবাসীরা তাঁর পূজা করছে। বহু হিন্দু মুসলমান দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখছেন। নারী পুরুষ নির্বিশেষে স্নান করছেন ইছামতীতে গঙ্গা গঙ্গা বলে। ঘুম ভেঙে প্রভাতেই গেলেন আদিবাসীদের গ্রামে। আগে গেলেন মহম্মদ নেপাল মণ্ডল। আদিবাসীদের নেতৃস্থানীয় ভূষণ ও রাখাল সর্দারকে তাঁর স্বপ্নের কথা যখন বলছেন ঠিক সেই সময় এলেন নিত্যগোপাল অধিকারী তিনিও ঐ একই প্রকার স্বপ্নের কথা বললেন। মড়িঘাটার লোকদের আজ যারা গ্রাম্য-দেবতা কালীঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করেছে তখনকার দিন গঙ্গা পূজা করা তাদের পক্ষে ততটা সহজ ছিল না।

মড়িঘাটা গ্রামের একপাশে নকফুল অপর পাশে গোবরাপুর যে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বাস শুধু তাই নয় তাঁরা প্রভাবশালীও। বিশেষ করে গোবরাপুরে পূজা পার্বণ মেলা সবই তারা দেখে আসছে। সুতরাং তদানীন্তন গোবরা-পুরের মহিষমর্দিনী পূজার এবং মেলার ম্যানেজার ৺হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট এলেন মহম্মদ নেপাল মণ্ডল আর নিত্যগোপাল অধিকারী, ভূষণ সর্দার ও রাখাল সর্দার। বিধান মিলল। প্রথম বছর হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এবং আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থেকে মড়িঘাটায় গঙ্গাপূজার ব্যবস্থা করলেন। প্রথম বৎসর অধিবাসীদের পৌরহিত্য করার প্রশ্ন নিয়ে নানা সমস্যা দেখা দেয়। তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় এটা স্বাভাবিক। কেউ রাজী হন না। অবশেষে পুরোহিত আপনা থেকে উপস্থিত। তিনি গোবরাপুর নিবাসী অকৃতদার সংসার ত্যাগী ৺নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়। তিনি পৌরহিত্য করলেন। তাঁর সমাজ বন্ধন বলতে কিছুই ছিল না।

এই পূজা উপলক্ষে মেলাও বসল। সেই থেকেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ঐ মেলা আর গঙ্গা পূজা মড়িঘাটায়। এই মেলার প্রথম বছরে মানুষের মনে বিশ্বাস অবিশ্বাসের নানা প্রশ্নই দেখা দিয়েছিল। শোনা যায় প্রথম বছরে এক মহিলা, বাঁশঘাটা অঞ্চলের, তিনি গঙ্গা পূজা ইছামতী তীরে উপেক্ষা করে খেয়া পার হয়ে চাকদহে গঙ্গাস্নান করতে রওনা হলেন, কিন্তু নদী পার হয়ে কিছুদুর অগ্রসর হয়েই সহসা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর আত্মীয় স্বজন তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। মানসিক করে মড়িঘাটায় গঙ্গা পূজা দেওয়ায় তার জ্ঞান ফিরে আসে। তিনি ইছামতীর গঙ্গায় স্নান করে রোগ মুক্ত হন। এই ঘটনা প্রচার হওয়ার পর থেকে এতদ্ অঞ্চলের লোকদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে মড়িঘাটায় গঙ্গাদেবীর অবস্থিতি সম্বন্ধে। সে কারণে ঐ পূজার মেলায় মহিলা যাত্রীর সংখ্যাই অধিক হয়। এখন মেলাও বিরাট আকারে হয়। মেলার দায়িত্ব এখন মড়িঘাটার গ্রামবাসীদের হাতে। যে স্থানে মেলা বসে সে স্থান এখন সরকারের। বার্ষিক কর গ্রামবাসীরাই দেন; আর মেলার আয় গ্রামবাসীরাই ভোগ করেন।

মড়িঘাটার মানুষদের মনে রাজনৈতিক চেতনাবোধ নেই, এ কথা বলা যায় না। এখন পর্যন্ত ভোটাভুটিটা মেলায় জুয়া খেলার মত তাঁদের কাছে সহজ সাধ্য ব্যাপার, মনে দাগ কাটে না। যার যে বাবুকে ভাল লাগে প্রচারের সময় সেই বাবুকেই ভোট দেন। দলাদলির প্রশ্নের কোন গুরুত্ব আজও পর্যন্ত তাঁরা ঠিক বোঝেন বলে মনে হয় না। তবে বাংলার মাটিতে পুরুষানুক্রমিকভাবে বস বাস করে আসছেন আর দলাদলি করার উত্তাপের যে সুখ তা তাঁরা একেবারেই বোঝেন না সে কথা বলার অবকাশ নেই। মেলাকে কেন্দ্র করে ওঁদের দলাদলি হয় ঐ সময়। আবার ভুলেও যায়। রাজনৈতিক দলাদলির উত্তাপ থেকেও তারা বর্তমানে দূরে আছেন এ কথাও জোর দিয়ে বলার অবকাশ কোথায়?

ক্ষীয়মান ইছামতীর উঁচুপাড় জঙ্গলাকীর্ণ তার নিচেয় বিস্তীর্ণ বেলাভূমি। ইছামতীর স্রোতধারা ক্ষীণ বর্ষার সময়ও নদীর জল পাড়

ছোঁয় না। ক্রমশঃ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে ইছামতীব জলধারা। সেই সঙ্গে সঙ্গে জীবন যুদ্ধে নিপীড়িত এই আদিবাসীদের ভবিষ্যৎ আশাও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। সমস্ত গ্রামখানাই জানাচ্ছে নগ্ন বীভৎস দারিদ্র্যের আত্ম-কথা। নারী দেহের লজ্জা নিবারণের মত বস্ত্র সংগ্রহ করার মত সামর্থ্যও আজ তাদের নেই। আবার দু'একজন যুবক টেরিলিনের ট্রাউজারও পরছে। এদের এই মর্মবেদনার অংশীদার কে? কে তাদের ভরসার কূলে পৌছুতে পারবে। তাদের নৈতিক অধঃপতন যা ঘটেছে তাব থেকে কে তাদের বাঁচাবে—এই তাদের জিজ্ঞাসা। প্রাণ তাদের আছে কিন্তু প্রতিষ্ঠা কোথায়। বিংশ শতকের সভ্যতা রথচক্র আবর্তিত হয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে, আর তার সেই অগ্রগতির আবর্তে সম্মুখে পড়ে পিষ্ট হচ্ছে এ অবহেলিত দীন অনগ্রসর মানব গোষ্ঠী। দীর্ঘ পঁচিশ বছর স্বাধীনতা যারা ভোগ করল তারা দলাদলির উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া আর কি পেয়েছে? তারা কি শুধু রাজনৈতিক দলাদলির প্রজ্বলিত বহ্নির ইন্ধনের কাজই করবে যুগযুগ ধরে? তারা কি শুধু মিছিলের অংশীদার হয়েই পথ পরিক্রমা করবে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সুখময় স্মৃতির আশ্বাসে প্রলুব্ধ হয়ে? এ প্রশ্নের জবাব কবে তারা খুজে পাবে?

২৫

মাথাভাঙ্গা রাজকোল কুলিয়া রণঘাট

বনগ্রামের উত্তর সীমান্তের কয়েকখানি গ্রাম আজও যে অতীত ঐতিহ্য বুকে নিয়ে ভারতের মাটি আঁকড়ে থাকবার সুযোগ পেয়েছে এখানে সেই গ্রামের মধ্যে কয়েকখানির পরিচয় দিচ্ছি।

ইছামতী নদীর শাখা কোদলা নদী, বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের মহেশপুর থানার অন্তর্গত শামকুড় গ্রামের নিকট ইছামতী থেকে শাখা হয়ে কোদলা প্রবাহিত হল দক্ষিণ দিকে। কোদলা ও কিছু দক্ষিণে এসে আবার দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। এক অংশের নাম হল নাওভাঙ্গা অপর অংশের নাম হাঁকোর। এই দুই ধারাই আবার দক্ষিণে এসে বালির খালের নিকট ইছামতীতেই মিশে গেছে। এখন নাওভাঙ্গা, কোদলা, হাঁকোর তিনটি নদীই মজে খাল হয়ে গেছে। কচুরিপানা ভর্তি ক্ষীণস্রোতা ও শীর্ণকায়া, জলের গভীরতাও আর নেই। অতীত দিনে এই কোদলা নদী প্রশস্ত ছিল, আর গভীরতাও ছিল প্রচুর। এখনকার কোদলা দেখলে তা কল্পনাও করা যায় না।

বনগ্রাম থেকে পনের-ষোল মাইল উত্তর-পশ্চিমে কোদলার উভয় তীর গভীর জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। আসপাশের স্থানও জলা জঙ্গলাকীর্ণ, কোথাও বা উলুখড়, নল-খাগড়ার বনে পরিপূর্ণ হিংস্র শ্বাপদের লীলাভূমি।

বাংলা ১১৫০ সাল বর্গীর অত্যাচারে সারা বাংলায় ত্রাহি ত্রাহি রব তুলছে। জীবন, ধন, মান সবই বর্গীর অত্যাচারে পর্যুদস্ত। এমন সময় হুগলী জেলার শেওড়াফুলির রাজা শিবচন্দ্র দেব বর্গীর অত্যাচারের হাত

থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রচুর ধন-সম্পদ ও লোকজন নিয়ে তাঁরই রাজ্যের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে কোদলা নদীর তীরে এসে আত্মগোপন করেন। জঙ্গল ক্রমশঃ পরিষ্কার হল, গড়ে উঠল রাজপ্রাসাদ, মন্দির, বাজার, কাছারি। পত্তন হল গ্রামের। গ্রামের নামকরণ হল রাজকোল। ১১৭৬ সাল ভীষণ দুর্ভিক্ষে সারা বাংলায় হাহাকার। হা অন্ন, হা অন্ন করে ছুটে বেড়াচ্ছে বাংলার মানুষ বাড়ি ঘর ফেলে দিকে দিকে। সে সময় নানাদিক থেকে লোক এসে রাজকোল ও তার আসেপাশে বসতি স্থাপন করল। শোনা যায় রাজ অনুগ্রহই তার কারণ ছিল। বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এলেন বসতি করলেন কোদলার তীরে। আজও সেইসব ব্রাহ্মণদের ভিটে পড়ে আছে। তাঁদের বংশের আর কেউ ওখানে নেই। রুজি ও কর্মের তাগিদে একে একে সকলেই অন্যত্র চলে গেছেন। তাদের বংশধরেরা কোথায় সে সংবাদও কেহ জানে না। আসেপাশে গ্রাম কয়েকখানির মধ্যে কুলিয়া, রণঘাট, আউলডাঙ্গা ইত্যাদিতেও ঐরূপে জনবসতি হয়েছিল।

বর্তমানে রাজকোলের রাজবাড়ির ধ্বংসস্তূপ পড়ে আছে, পড়ে আছে রাজার কাছারির পোঁতা, দুর্গোৎসবের বোধনের বেল গাছটা আজও দাঁড়িয়ে আছে। রাজবাড়ির দক্ষিণ দিকে যে পুকুর ছিল সেখানে নিত্য পূজার বাসনকোসন, কোশা-কুশি ধোয়া হোত, যার নাম ছিল ঐজন্য কোষাগাড়ী, সে পুকুর আজও আছে। অতীতের নামটাও আজও বদলায়নি তবে মজে ডোবা সদৃশ হয়েছে। রাজার বাস্তুপূজা যে অশ্বত্থ গাছের তলায় হত সে গাছটা আজ আর দেখা যাবে না। গত ১৩১৬ সালে প্রচণ্ড ঝড়ে সকল ব্যথার কাঁটা বুকে নিয়ে চির বিদায় নিয়েছে। রাজার পুষ্পোদ্যান আজ ফুল বাগানের মাঠ নামে অতীত দিনের স্মৃতি বহন করছে। রাজবাড়ির ধ্বংস-স্তূপের চারধারে জঙ্গল আর বাঁশ বাগান; দূর থেকে তার অস্তিত্ব সহজে চোখে পড়ে না। এখন বাঁশ বাগানের মধ্যে পাহাড়ের ন্যায় দুটি উঁচু স্তূপ জঙ্গলে ঢাকা। সেই বাঁশ বাগানের মধ্য দিয়েই গ্রামের লোক জনের যাতায়াতের পথ।

মাথাভাঙ্গার মাঠ :

অতীত দিনের ভীতি সঞ্চারকারী মাঠ এই মাথাভাঙ্গা। এই মাঠের উত্তর সীমা দিয়ে প্রবাহিত কোদলা নদী, বাঁশবেড়ে; সমস্তা গ্রাম (এখন পূর্ব পাকিস্তানে)। পূর্বে কুলিয়া ও রণঘাট। দক্ষিণে ভবানীপুর, বেয়াড়া ও হরিনাথপুর। পশ্চিমে সিন্দ্রানী ও বগুলা। এই মাঠের দৈর্ঘ্য আট মাইল এবং প্রস্থ ছয় মাইল।

পথিক পথ চলতে চলতে এই মাঠের কাছে এসে থমকে দাঁড়াত, তার পর অদৃষ্ট ভরসা করে গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হত। কত অজ্ঞাতকুলশীলের দেহাবশেষ মিশে আছে এই মাঠের মৃত্তিকাকণায়, কত পথহারা পথিক সর্বস্ব হারিয়েছে এই মাঠের মাঝে, তার অনেক কাহিনী আজ রূপকথায় রূপান্তরিত হয়েছে। হয়ত সে কাহিনীও লুপ্ত হবে একদিন অনন্ত কালের মসীচিহ্নের তলে। যে মাথাভাঙ্গার মাঠে শত শত লোকের মাথা চূর্ণ হয়েছে দস্যুর লগুড়ের আঘাতে, সেই মাথাভাঙ্গার মাঠ আজ জনবসতিপূর্ণ হয়েছে। অতীতের ভীষণতার আর কোন চিহ্নই নেই। একদিন মাথাভাঙ্গার মাঠ ছিল গভীর জঙ্গল ও উলুখড়ে ভরা, শ্বাপদসঙ্কুল আর বিষধর সর্পের আবাস-স্থল, বন্য মহিষ আর ব্যাঘ্রকুলের লীলা নিকেতন। এই মাঠের মাঝে ছিল বিস্তীর্ণ বিল আর মাঝে মাঝে উঁচু প্রশস্ত ঢিবি। এই ঢিবিই তখনকার মনুষ্য বসতির স্মৃতি বহন করছে আজও। কিন্তু হায়! সে মানুষরাও ছিল শ্বাপদ অপেক্ষা হিংস্র। দস্যুবৃত্তিই ছিল তাদের জীবন ধারণের পন্থা। এই উঁচু স্থানগুলিকে বর্তমানে লোকে "আটু" বলে। মাথাভাঙ্গার আট খুঁড়লে আজও ইট পাওয়া যায়। কোঁচের পোতায় ছিল ঐ ডাকাত বা দস্যুদের প্রতিষ্ঠিত কালী-মন্দির। সেই দেবতার পূজার জন্য পুরোহিতও নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর বাসস্থান ছিল উহার সংলগ্ন। আজও মজা পুকুর আর তার বাঁধানো ঘাট ঐ আটে বর্তমান। মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজ পড়ে আছে সেই দস্যুকুলের দেবতার স্মৃতিচিহ্ন বহন কোরে। টেকেচুড়া বলে আর একটা আট আছে। সেখানেও ঐ দস্যুদের বসতি ছিল। ১৩১১ সালে জেয়ারত নামে একজন কৃষক মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে টেকেচুড়ার আটে একটা মোহর পায়। ১৩১০ সালে নদীয়া জেলা থেকে কয়েকঘর মুসলমান মাথাভাঙ্গায় এসে বসতি স্থাপন করে। জেয়ারত তাদেরই একজন। কুলিয়া গ্রামের পশ্চিমে পাটকেলপোঁতার আট, সেখানে অনেক বাড়ির ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান। এই আটের সংলগ্ন সুবৃহৎ দীঘি ছিল, বাঁধানো ঘাটও ছিল তার। এখন ঐ মজা পঙ্কিল দীঘিকে এই অঞ্চলের লোক দীঘড়ি বলে। প্রাচীন দলিলে পাটকেলপোঁতা বলে ঐ গ্রামের নাম পাওয়া যায়, এখন সে নাম লুপ্ত। রণঘাটের পশ্চিমেও এরূপ আটের অস্তিত্ব আজও দেখা যায়, দেখা যায় সেখানে পুরাতন ইটের স্তূপ আর কয়েকটি পাকা ইন্দারা। এখানেও একটি সুবৃহৎ দীঘির অস্তিত্ব বর্তমান। বর্তমানে দীঘড়ি নাম নিয়ে পঙ্কিল জল বুকে করে অতীতকালের মৌন সাক্ষী হয়ে রয়েছে। রণঘাটের কিয়দংশ এখন বাংলাদেশের কবলে। তার সীমা রেখায় প্রাচীন বটগাছটা আজও

এতদ্অঞ্চলের আকর্ষণ। বাংলাদেশ বটগাছটার বর্তমান মালিক হলেও বহু স্মৃতি বিজড়িত ঐ বটগাছের নাম আজও কুলিয়া রণঘাটের লোকেরা ভুলতে পারেনি। এই গাছটার নাম "গলদাব গাছ"। গলদার গাছের উত্তরে গলদার পুকুর। এই পুকুর পাড়েই ছিল ভগবান দাস পাটনির বাসস্থান। একদিন কালনা থেকে ষোল বছব বয়সে ভগবান দাস এসে পাটনির কাজে বহাল হয়েছিল। প্রশস্ত কোদলা নদীর বুকে খেয়ার পাড়ি জমানো ছিল তার কাজ। কত লোক ভগবান দাসের বাড়ির পাশের আস্তানার বট গাছের সুশীতল ছায়ায় অপেক্ষা করেছে ভগবান দাসের খেয়ায় পার হবে বলে। শোনা যায় ভগবান দাস তিনশত বছর জীবিত ছিলেন। দীর্ঘ শেষ জীবন নিজের দেশ কালনায় ফিরে গিয়ে অতিবাহিত করেন। যে ভগবান দাস গলদার খেয়াঘাট থেকে মহেশপুর পর্যন্ত পাড়ি জমানোর কাণ্ডারী হয়ে তিন শতাব্দীর ইতিহাস রচনা করে গেছেন বীচি-বিক্ষুব্ধ কোদলার কাল জলে, সেই ভগবান দাস মহাপ্রভুব আকর্ষণে ছুটলেন নিজগ্রাম কালনায়। অদ্বৈত মহাপ্রভু তাঁকে দীক্ষা দেন। শেষ জীবন তাঁর কালনায় অতিবাহিত হয়। এতদ্অঞ্চলের লোক দেখা কবতে যেত ভগবান দাসের সঙ্গে সেও ১২৭০-৭২ সালের কথা। শোনা যায় তার বয়স তিনশ বছর ছিল। সদা ধ্যানমগ্ন পরম যোগী বর্ষীয়ান বৈষ্ণব।

কোদলা নদীর পরপারে মাটলে গ্রাম। নদীর তীরে দুর্গম অরণ্য ১২৭৮ সালে বিহালচাঁদ নামে এক পরম বৈষ্ণব যোগী এসে সে গভীর অরণ্যের মাঝে তাঁর আশ্রম স্থাপন করলেন। বিহালচাঁদ এর পূর্বে ছিলেন পুলিশ ইনস্পেক্টর। "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি" বোধ হয় সে মুক্তির সন্ধানে তিনি সংসার, স্ত্রী, পুত্র সকল আকর্ষণ ত্যাগ কবে বাণপ্রস্থ নিয়েছিলেন কোদলার তীরে এই গভীর জঙ্গলে। ক্রমে তিনি সাধন ভজনে হলেন পরম-যোগী পুরুষ। বহু শিষ্য তাঁর জুটল। জঙ্গল ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হল। গড়ে উঠল বৈষ্ণবের সাধন ক্ষেত্র। বিহালচাঁদ সিদ্ধপুরুষ। তাঁর সমাধি আজও বর্তমান। এখনও এতদ্অঞ্চলের লোক সেই মহান সিদ্ধ পুরুষের আশীর্বাণী পাওয়ার আশায় তাঁর নামে মানসিক করে। অভীষ্ট সিদ্ধ হলে দেয় বেহালচাঁদের উদ্দেশ্যে পূজা।

১২১০ সালে রণঘাটে এক সিদ্ধ পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁর নাম আহ্লাদ দাওয়ান। অবাঙ্গালী মুসলমান ফকির পশ্চিম অঞ্চল থেকে তিনি এখানে আসেন। বর্তমানে কালীচরণ সাহার বাটির অনতিদূরে তাঁর সমাধি আজও বর্তমান। যোগসাধনায় দিনরাত নিমগ্ন থাকতেন। ১২৩০ সালে

প্রবল বন্যার সময় তিনি সে আশ্রম ত্যাগ করে কুলিয়া ও রাজকোলের মধ্যবর্তী স্থান কোদলা নদীর তীরে আশ্রম স্থাপন করেন। আশ্রমের চতুর্দিকের সংলগ্ন জমিতে বিবিধ ফলের বাগান বসান তার মধ্যে আমগাছের সংখ্যাই অধিক। এখনও সেই আমবাগানের অস্তিত্ব বর্তমান যদিও পার্শ্ববর্তী জমির মালিকগণ এই আমবাগানের কিয়দংশ গ্রাস করেছেন।

আহ্লাদ দাওয়ান যোগী পুরুষ ছিলেন। তাঁর অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে এতদঞ্চলে অনেক কাহিনী শোনা যায়। তিনি খড়ম পায়ে দিয়ে যোগ বলে নদী পার হতেন। হিন্দু মুসলমান শিষ্য ছিল তাঁর বহু। মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে তারাচাঁদ মণ্ডলের পিতামহ তাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন।

কুলিয়া গ্রামের দক্ষিণে পদ্মবিল নামে একটি বিল আছে। পূর্বে সে বিলের শোভা অতি মনোরম ছিল। সরোবরসদৃশ বিলের স্বচ্ছ জলে অগণিত নানা প্রকারের পদ্মফুল সদা প্রস্ফুটিত থাকত। বিলের জলে অসংখ্য জলচর পাখী বিচরণ করে বেড়াত। একটা খালের সাহায্যে কোদলা নদীর সঙ্গে বিলের সংযোগ ছিল। এখন এই বিলের কিয়দংশ চাষ হচ্ছে। পূর্বে এই বিলে নানা দেশ থেকে আসত বাণিজ্য তরণী।

এই বিলের তীরে আহ্লাদ দাওয়ান একবার তাঁর প্রিয় শিষ্য তারাচাঁদ মণ্ডলের পিতামহকে তাঁর অলৌকিক শক্তি দেখান। ধনসম্পদপূর্ণ তরণী এনে দেবেন বলে শিষ্যকে চোখ বুঁজতে বলেন, শিষ্য দীর্ঘ সময় তদবস্থায় থেকে স্বাভাবিক কৌতূহলবশতঃ চোখ খোলেন গুরুর অলক্ষ্যে। দেখেন অপরূপ সাজে সজ্জিত দু'খানি নৌকা ভেসে আসছে বিলের জলে। কিন্তু অধিকক্ষণ এদৃশ্য তিনি দেখতে পেলেন না। তাঁরই চোখের সামনে নৌকা দু'খানি ডুবে গেল বিলের গভীর জলে।

১৩০৪ সালে এই বিলের কিছু অংশ শুষ্ক হয়ে যায়। কৃষকেরা এই শুষ্ক অংশে চাষ শুরু করে। সেই সময় অনেক বড় বড় নৌকার ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। মনে হয় বিল এক সময়ে কোদলা নদীর অংশ ছিল।

আহ্লাদ দাওয়ানের আশ্রমের সম্পত্তি এখন সরকারের খাস জমির অন্তর্গত। আমবাগানের কিছু অংশ ও বটগাছটা এই জমির সঙ্গে সরকারের সম্পত্তি। আহ্লাদ দাওয়ান দেহরক্ষা করার পর তাঁকে তাঁর প্রথম আশ্রমস্থল রণঘাটে সমাধি দেওয়া হয়। সমাধিস্থল একটি অশ্বত্থ গাছের নিকট। গাছের তলায় ইটে গাঁথা থানও আছে।

কুলিয়ার রাজ রাজেশ্বরী দেবী আজও গ্রাম্য দেবতার আসন অধিকার

করে আছেন। শোনা যায় এই দেবীর প্রতিষ্ঠাতা রাজা শিবচন্দ্রদেব। মূর্তিটি পীত বর্ণের অথচ কালী মূর্তির ন্যায় শিবের শব মূর্তিতে আরূঢ়া মুণ্ডমালিনী। গত ১৩৬০ সালে এই মূর্তি অপহৃত হয়েছে অথবা সীমান্ত এলাকার দুষ্কৃতকারীরা নষ্ট করেছে তার সঠিক বিবরণ না মিললেও দেবীর আসন শূন্য, ঘট স্থাপনা করে এখন পূজা দেওয়া হয়। গ্রামের লোকদের অপহরণ সম্বন্ধে কোন কৌতূহল নেই। দেবীর মন্দির বছর ত্রিশ পূর্বে পড়ে যায়। সেই খানেই ইটের দেওয়াল আর টিনের চাল দিয়ে নূতন মন্দির তৈরী করা হয়। অনেকে বলেন এই দেবী মূর্তি মাথাভাঙ্গা মাঠ থেকে আনা হয়েছিল। কিন্তু তা অনুমান মাত্র, কোন প্রমাণ মেলেনা। পূর্বে নিত্য খুব ধুমধামের সঙ্গে পূজা হত। এখনও পূজা হয়, মনে হয় কোন রকমে প্রথা রক্ষা করা হয়। এই দেবী পূজার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য পঞ্চাশ বিঘা জমি ছিল। তার কিছু অংশ প্রজা বিলি ও কিছু অংশ দেবীর খাস সম্পত্তি এখনও দেবত্র আছে।

রাজরাজেশ্বরী দেবীর মন্দিরের অনতিদূরেই হরিতলা। একটি বেল গাছের নীচেয় বাঁধানো চত্বর। এখন ভগ্নদশা ও জঙ্গলাকীর্ণ। কেহ আর সেই স্থানে সংকীর্ত্তন করতে আসে না।

মাথাভাঙ্গা প্রান্তরের দক্ষিণ দিয়ে বর্তমানে চলে গেছে বনগ্রাম সিন্দ্রানীর পিচ বাঁধানো পাকা সড়ক। লোক জনের সদাই আনাগোনা, যান্ত্রিক যানের গতায়াত। ভুলিয়ে দিয়েছে মানুষকে সেই অতীত দিনের ভীষণতা, সেই মৃত্যুপথযাত্রী পথিকের অসহায় ভীতিবিহ্বল ক্রন্দনের ধ্বনিও মিশে গেছে মাথাভাঙ্গার আকাশে বাতাসে। আজও যে স্মৃতিচিহ্ন অবশিষ্ট আছে, কালক্রমে তাও লুপ্ত হয়ে যাবে গতিশীল পরিবর্তনশীল জগতের আবর্তনের মাঝে। এখন যাঁরা নবাগত তাঁদের কেহই মাঠের মাঝে ইট আর বাঁধানো পুকুর কোথা থেকে এল তার খোঁজ করেন না, প্রয়োজনও নেই। যাঁরা অতীতের পুরুষানুক্রমে বসবাস করে আসছেন তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে গেছেন শৈশব থেকে ঐ মাঠের ভাঙ্গা ইট দেখে।

কত রাখাল পঁচিশ ত্রিশ বছর আগেও মাথাভাঙ্গার মাঠে গরু চরিয়ে বেড়িয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রের কোন চিহ্নই ছিল না মাথাভাঙ্গার বুকে। বিশাল প্রান্তর পড়ে ছিল চারণক্ষেত্র হয়ে। আজ সেই মাথাভাঙ্গা জন বসতিতে পূর্ণ। ব্যক্তিগত মালিকানার সীমারেখা টানা হয়েছে আল দিয়ে। চাষ-বাস হচ্ছে। অতীতের সকল স্মৃতি মুছে যাচ্ছে কৃষির তাগিদে লাঙ্গলের ফলার নির্মম আঘাতে। সে আঘাতে মৃত্তিকা গুঞ্জন তোলে না, দস্যুও বিকট

শাণিত অস্ত্র লোলুপ হিংস্র দৃষ্টি মেলে ছুটে আসে না। পাষাণ দেবতার মন্দির থেকে শঙ্খ ঘণ্টার গম্ভীর আওয়াজ ভেসে আসে না আজ সমস্ত প্রান্তরের বায়ুস্তর মোহিত করে।

এরূপ কিংবদন্তি শোনা যায় দস্যুও তাদের বংশাবলী লুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর মাতৃমন্দিরের পূজারীর শেষ বংশধর ছিলেন মন্দির আঁকড়ে। মায়ের পূজা ও ধ্যান ধারণাই ছিল তাঁর সম্বল। পরম তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ। একদিন তিনি ধ্যানস্থ। মাঠে রাখালেরা গরু চরাচ্ছে দূরে। এমন সময় বিলের জলাজমি থেকে এক বিষধর শঙ্খচূড় সাপ সেই ধ্যানরত ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করে ছুটেছে ফণা বিস্তার করে। সে ঢেলে দিতে চায় তার উগ্র বিষ ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম রন্ধ্রে। কিন্তু বিস্ময়াবিষ্ট ভীত বিহ্বল রাখালেরা দেখল সহসা এক সর্পভূক 'হাড়গিলে' পাখী ছোঁ মেরে সাপটাকে নিয়ে উড়ে গিয়ে বসল গাছের ডালে।

অবশ্য এ কাহিনীর সত্যতার কোন প্রমাণ নেই। মানুষের বিশ্বাসই আজও এই কাহিনী মুখে মুখে পুরুষ পরম্পরায় বহন করে আসছে কালচক্রের আবর্তন ভেদ করে। বিজ্ঞান এ কাহিনীর সত্যতা বিচার করতে চাইলেও ধর্মপ্রাণ বঙ্গের পল্লীবাসী বিশ্বাস করে এ কাহিনী। যেমন করে বিশ্বাস করে শোনে দেবী মনসার ভাষাণ। ঁধবার ধরণীতলে লুকিয়ে আছে কত গোপন কথা কত ইতিহাস কোথাও প্রমাণ মেলে কোথাও মেলে না। কুলিয়া বণঘাটের কত গোপন কথাই হয়তো আত্মগোপন করে আছে মাটির তলায়। উপরের ইষ্টকস্তূপ পুকুর দীঘি তার আপাত সাক্ষ্য দিলেও যা জেনেছি যা দেখেছি তা হয়ত সম্যক্ নয়। কত সুখ দুঃখ ভরা জীবন কত মহাত্মার পদধূলি আবার কত দস্যু তস্করের জিঘাংসার চিহ্ন মিশে গেছে মাটির ধূলায় আর আকাশে বাতাসে। শব্দে ব্রহ্মে হয়ত কত কাতর আর্তনাদ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে সে সন্ধান মেলেনি। মিলবেও না হয়ত কোন দিন তার সম্যক্ বারতা।

মাথাভাঙ্গা মাঠের ঐ সকল আটের ইদারা, পুকুর ও ইটের স্তূপ বহু প্রাচীন। রাজা শিবচন্দ্রদেব যখন রাজকোলে এসে গ্রাম পত্তন করেন, তখনও মাথাভাঙ্গা মাঠে জনবসতি ছিল, তবে তারা পেশাগতভাবে সুসভ্য মানুষ নয়। জীবনের বৃত্তি ছিল দস্যুবৃত্তি। মনে হয় এই সকল দস্যুদের অত্যাচারেই ঐ সকল গ্রামের লোকজন যাঁরা ঐ ইদারা, পুকুর, বাড়িঘরের মালিক ছিলেন তাঁরা স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তারপর ঐ সকল স্থান দস্যু ও ডাকাতদের পরিপূর্ণ আবাসস্থল হয়। বৃটিশ শাসনকালের প্রথম দিকে দস্যু ও ডাকাতদের অত্যাচার এতদ্ অঞ্চলে প্রবল ছিল। তারপর ক্রমশ

শাসন শৃঙ্খলা রক্ষায় তদানীন্তন সরকারের কঠোরতা অবলম্বনের ফলেই ঐ সকল দস্যু ও ডাকাতের দল স্থান ত্যাগ করে। পড়ে থাকে তাদের ঘরবাড়ি, ইঁদারা আর পুকুর। প্রকৃতি ক্রমশঃ ওগুলি গ্রাস করতে থাকে ফলে ভগ্নস্তূপ বাড়িঘর, মজা পুকুর আর জঙ্গলের সৃষ্টি হয়। আবার প্রয়োজনের তাগিদে মাথাভাঙ্গার মাঠে জনসমাগম হয়। রণঘাট কুলিয়া, রাজকোল, গ্রাম পত্তন হওয়ার বহু পূর্বে কোদলার অপর পারে সামন্তা, বাঁশবেড়ে ইত্যাদি বর্দ্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম ছিল। এখন ঐ সকল গ্রাম পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত।

কুলিয়ার কয়েকজন কৃতী সন্তানের কথাও জানা যায়। তন্মধ্যে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ও তদীয় ভ্রাতা হৃষিবর মুখোপাধ্যায়-এর নাম সমধিক খ্যাত। পিতা দেবনাথ মুখোপাধ্যায় সামান্য বেতনে কলিকাতায় চাকুরী করতেন। পুত্রদ্বয় স্বীয় প্রতিভাবলে এম, এ, পাশ করেন ও উভয়েই কাশ্মীর রাজের দরবারে চাকুরী পান। নীলাম্বর কার্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে রাজার প্রধান সচিব হন, হৃষিবর হন প্রধান বিচারপতি। ১৩১৭ সালে উভয় ভ্রাতা কলিকাতায় আসেন ও বসবাস করতে থাকেন। নীলাম্বর কলিকাতা কর্পো-রেশনের ভাইস চেয়ারম্যান পদ পান। দেশের সহিত তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৩১৯ সালে নীলাম্বর কুলিয়া গ্রামে একটি সুগভীর পাকা ইঁদারা খনন করান। ইঁদারা মজে এখন নষ্ট হয়ে গেছে। তার উপর লেখা আছে ১৯৬৯ সংবৎ এ স্থাপিত। ১৩০৫ সালে হৃষিবর কয়েকটি নলকূপ স্থাপন করেন। হৃষিবর খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং গ্রাম্য টান ছেড়ে শেষ জীবন কলিকাতায় অতিবাহিত করেন। এখনও নীলাম্বরের পৈতৃকভিটা পড়ে আছে, অন্যান্য সম্পত্তি নীলাম্বরের পুত্র দেবীবর মুখোপাধ্যায় বিক্রয় করে যান। তিনি এখন বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী।

অতীতের কুলিয়ার সমাজ জীবনের যা পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তখন ঐসকল গ্রামে বাস করতেন। তাঁরা শুধু জ্ঞান গরিমায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখতেন তা নয় তাঁরা অত্যধিক গোঁড়া ছিলেন। ব্রাহ্মণেতর জাতিরা তাঁদের দেখত দেবতার মত। তাঁরা নিজেদের প্রতি-পত্তি বজায় রাখতে বহু অত্যাচারও করেছেন সমাজের উপর। বোধ হয় তাঁদের গোঁড়ামিই তাদের সমাজ ধ্বংস করে দিয়েছে। আজ আর তাঁদের বংশধরদের কেউই গ্রামে নেই। ভিটে পড়ে আছে।

তখনকার দিনে কোদলা নদী প্রবল ছিল। এই সকল জনপদের ব্যবসায় বাণিজ্যের পথ ছিল কোদলা। নৌকা পথে কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল নদী পথে। আজ কোদলা নদী মজা

খাল বিশেষ, কচুরি ও দামে ভর্তি। যাতায়াতের যানবাহন চলার এখন যে পথ আছে অতীত দিনে সে পথের অস্তিত্বও ছিল না। নৌকাযোগেই যাতায়াত চলত দূর দূরান্তরে। আজ পথ দিয়ে মানব ও যন্ত্রদানব ছুটে চলেছে স্বল্প সময়ে অধিক ব্যয়ে। কিন্তু দেশের প্রাণময়ী পয়ঃ পীযূষদাত্রী নদীমাতৃক দেশের নদীগুলি হারিয়েছে তাদের ক্ষীর ধারা, রূপান্তরিত হয়েছে পঙ্কিল ও শীর্ণ জলধারায়। দেশ অনুর্বরা দেশে পরিণত হতে চলেছে। কৃত্রিম সার কৃত্রিম মনোবৃত্তি মানুষকে ঠেলে নিয়ে চলেছে কৃত্রিম জীবন যাত্রার পঙ্কিল আবর্তের মাঝে। সেখানে কামনা, বাসনা, লালসার উগ্রতায় শান্ত, স্থির, সৌম্য ও সরল শান্তির পথ রুদ্ধ হতে চলেছে। রাজার রাজত্ব আর নেই, সামাজিক অনুশাসন এখন কুসংস্কার। বর্ণ বৈষম্যের উত্তাপ আজ স্তিমিত। আজ তার পরিবর্তে দেখা দিয়েছে নূতন জীবন ধারা, শোষক ও শোষিতের সমাজ জীবন। যেখানে ন্যায় নীতির কোন প্রশ্ন নেই। ধর্ম ও আচার স্বার্থান্ধকে তোষণ করে, সত্য ও সরলতা দুর্বলের সম্বল বলে কথিত হয়। একদিকে অফুরন্ত ভোগ বিলাসী প্রাণের উচ্ছ্বাস ও কলরোল আর অন্য দিকে অনাহারে কদাহার ব্যাভিচারের আত্মগ্লানিতে জর জর মানবের জীবন যুদ্ধের মাঝে হা-হা কার ধ্বনি। প্রতিবেশীর সুখ দুঃখের বার্তা কেহ রাখে না। জানলেও তারা অসহায়। দাতার বদান্যতা আজ হৃদয়াবেগে নয় আত্মতুষ্টি ও প্রতি-পত্তির নিষ্ঠুর অস্ত্র বিশেষ। বিগত দিনের গ্রাম্য সমাজের সহজ সরল অনাবিল জীবনধারা আজ আর ঐ সুদূর গ্রাম্য অঞ্চলে মেলে না। বেতারযন্ত্র আওয়াজ তোলে চাষীর গৃহে খোল কত্তালের পরিবর্তে। আনন্দ পেতে চায় কিন্তু আনন্দের অংশভাগী হতে চায় না। বিলাস ব্যসনের স্রোতে আজ সকলেরই অভাব অসন্তুষ্টি। শান্ত, স্নিগ্ধ গ্রাম্য জীবনের গতি আজ ভিন্ন পথে। গ্রামের সাধারণ লোকের জীবন বাঁধা গ্রামীণ মহাজনের হাতে। কোন কোন গ্রামে একাধিক মহাজনও আছেন। প্রতিবেশীকে শোষণের মাধ্যমে তাঁরা লগ্নি করেন সর্বক্ষেত্রেই! বিলাস ব্যসনেও লগ্নি করেন তাঁদের টাকা; আবার জন্মমৃত্যু, বিবাহ সর্বক্ষেত্রেই তাঁদের লগ্নি চড়া সুদে। চাষের জন্য ত' তাঁরা দেনই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল মহাজনরাই পঞ্চায়েৎ রূপ মহৎ কার্যের কর্ণধার হয়েছেন। এরাই সমাজসেবার তকমা পরে উপর মহলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। শ্রেণীহীন সমাজজীবনের বুনিয়াদের এক একখানি দৃঢ় প্রস্তরখণ্ড হয়ে উঠেছেন এই মহামানবেরা। জানিনা ভবিষ্যৎ জীবনধারা কোন্ পথে যাবে! গ্রাম্য জীবনের বাহিরে চাকচিক্য বেড়েছে। বিলাসব্যাসন বেড়েছে কিন্তু দুঃখ দৈন্য আরও মর্মান্তিক। এখন

সহানুভূতি বা সাহায্য নেই, সারল্যে পূর্ণ সে স্নেহের প্রাচুর্য নেই। এ এক বিচিত্র সমাজ যার কোন ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় বর্তমানে। সারা বছরের হিসাব-নিকাশের শেষে দেখা যায় চাষীর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি খালাস করতে সকল ফসলই নিঃশেষ হয়ে যায়। আবার পরের বছর নিত্য ঋণের আশায় ভবিষ্যৎ চাষবাস পড়ে থাকে। সমস্যার সমাধান কোন্ পথে? বাহিরের দৃশ্য দেখলে অন্তঃসারহীন গ্রাম্যজীবনের প্রকৃত চিত্র ধরা পড়ে না। কারণ পোষাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি এখন পূর্বের থেকে উন্নত, কিন্তু মানুষের মনপ্রাণ, নৈতিক জীবনের ধারা, সমাজ-শৃঙ্খলা কতদূর তা অনুমান করা সহজসাধ্য নয়। কৃত্রিমতার আবরণে তা ঢাকা পড়ে গেছে।

২৬

বাগদা

বনগ্রাম মহাকুমা শহর থেকে চৌদ্দ মাইল উত্তর সীমান্তে বাগদহ গ্রাম। বর্তমানে বাগদহ একটি থানা, যদিও সেই থানার কার্যালয় নবজন-বসতিপূর্ণ হেলেঞ্চায় স্থানান্তরিত হয়েছে। বাগদহ বহু প্রাচীন গ্রাম। আজ যান্ত্রিক যুগে প্রয়োজনের তাগিদে বাগদহ গ্রাম নব রূপ ধারণ করেছে। এখন এই গ্রামকে একটা গঞ্জ বলা চলে। পথের পাশে অনেক দোকান বসেছে। আড়ৎ গড়ে উঠেছে, সকাল বিকাল সব সময় লোকের ও গাড়ীর, বাস ও লরীর আনাগোনা, মাল বিকিকিনি হচ্ছে। পূর্বে বেত্রবতীর ঘাটে আসত বাণিজ্য তরণী পণ্য নিয়ে আর দূর-দূরান্তে পাড়ি দিত পণ্য সম্ভার নিয়ে—সেও এই বেত্রবতীর নীল জলের ওপর দিয়ে"। বেত্রবতী বা বেতনা নদীই একদিন এই গ্রামকে সমৃদ্ধিশালী করেছিল। আবার বেতনার ক্ষীয়মান স্রোতধারার সঙ্গে সঙ্গে বাগদহের সমৃদ্ধি কমতে থাকে। বেত্রবতীর স্রোতধারা রুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাগদহের কলকলরোল স্তব্ধ হয়ে পরিত্যক্ত গ্রামে পরিণত হয়। কয়েক-ঘর হিন্দু মুসলমান কোন রকমে পৈতৃক ভিটে আঁকড়ে পড়ে ছিল হয়ত ভবিষ্যতে বাগদহে নবশ্রী আরা প্রত্যক্ষ করবে বলে। এখন বাগদহে আঞ্চলিক উন্নতিকরণের কার্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় সকলই গড়ে উঠেছে বাগদহের নবরূপের সাথে সাথে। বঙ্গভঙ্গের পর বহু বাস্তুত্যাগী এসে বাসা বেঁধেছেন বাগদহ গ্রামে।

যাঁরা এসেছেন তাঁরা নূতনের সাথেই পরিচয় ঘটাতে চান। তাঁদের প্রয়োজনের তাগিদে বিদ্যালয়, তাঁদের প্রয়োজনের তাগিদেই হয়তো ছুটছে যন্ত্রদানব নিস্তব্ধ পল্লীর ঘুম ভাঙ্গিয়ে সচকিত করে। প্রাচীন গ্রাম্য জীবনে অভ্যস্ত যাঁরা তাঁরা প্রত্যক্ষ করছেন গ্রামীণ উন্নতি; ধীরে ধীরে বাগদহের আধুনিক অগ্রগতি। কিন্তু নূতন যাঁরা তাঁদের দেখাবার বা দেবারও তো বাগদহ গ্রামের যথেষ্ট ছিল। বেত্রবতী আজ শুষ্কস্রোতা—তার জলধারা এখন পরিবহনের সাহায্য করে না। কিন্তু অতীত দিনের পরিবহনের সাক্ষ্য দেয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে জানায় বাগদহ পল্লীজীবনের প্রাণপ্রাচুর্যের স্মৃতির চিহ্ন। তাদের মধ্যে একটি পরিচয় এখনও পাওয়া যায়।

রাধাগোবিন্দের মন্দির বাগদহ বনগ্রাম পথের পশ্চিম ধারে হাট পার হলেই দেখা যাবে। এখন মন্দিরে উচ্চ চূড়া দেবতার বার্তা জানায়না দূর থেকে। গত ১৩২৯ সালে বহু প্রাচীন মন্দির প্রবল বর্ষণে ভূমিসাৎ হ'য়ে পড়ে যায়—তার স্থলে গড়ে উঠেছে কাঠের কড়ি বরগা দেওয়া ছাদযুক্ত চতুষ্কোণ কোঠাঘর। সেই কোঠা ঘরই এখন রাধাগোবিন্দের আবাসস্থল। এই রাধাগোবিন্দের বর্তমান সেবায়েত শ্রীবৈদ্যনাথ গোস্বামী পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকারত্ব পেয়ে কোন প্রকারে রাধাগোবিন্দের সেবা করে চলেছেন। মন্দিরের পাশ্চিমেই তার কুটির। মন্দিরের সম্মুখে একটি প্রাচীন কদম্ব গাছ আর একটি বয়োকনিষ্ঠ বেলগাছ। পূর্বের আড়ম্বরের স্মৃতিচিহ্নও যথেষ্ট আছে মন্দিরের ভিতর। বিগ্রহ ও সিংহাসন ছাড়াও আছে নানা আকৃতির মাটির পুতুল। এখনও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে যেমন রাস, দোল, ঝুলন, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি। তবে শ্রাবণ মাসে ঝুলনের সময় জাঁকজমক হয় যথেষ্ট। মেলা বসে, বহু লোকসমাগম এখনও হয়ে থাকে। এই রাধাগোবিন্দের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস কেউ সঠিক না জানলেও গ্রামের কেউ কেউ বলেন কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সে অনুমান যে ভুল তার প্রমাণ দেন বর্তমান সেবায়েত। জমির প্রজাস্বত্ব সরকার যখন নেন, সে সময় তিনি কৃষ্ণনগর রাজ সরকারে পত্র দেন। কিন্তু তার উত্তরের কাগজ পত্রে ঐ বিগ্রহের কোন প্রমাণ নেই সুতরাং কৃষ্ণনগরের রাজসরকারের করণীয় কিছুই নেই। এ থেকে জানা যায়—এই বিগ্রহ আরও প্রচীন কালের।

এই মূর্তি বর্তমানে যা আছে তা প্রকৃত আদি মূর্তি নয়। ১২২০-২১ সালে এই দারুময় মূর্তি নির্মাণ করা হয়। সে সম্বন্ধে একটা কাহিনীও

প্রচলিত আছে। বৌডাঙ্গার গোঁসাইরা মর্মর পাথরের রাধাগোবিন্দ মূর্তির প্রতি আকৃষ্ট হন। সুতরাং লোকচক্ষুর অজ্ঞাতে সেই মূর্তি অপহরণ করেন। প্রভাতে প্রভাতী করতে গিয়ে বর্তমান সেবায়তের প্রপিতামহ মূর্তি না দেখে পাগলের মত অস্থির হয়ে পড়েন। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে মন্দিরের দ্বারে পড়ে থাকেন। ক্লান্ত অবসন্ন রাধাগোবিন্দের বৃদ্ধ ভক্ত নিদ্রাভিভূত হন। এই সময় গোবিন্দ স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন—"ওরে কাঁদিস কেন? আমি'ত যাইনি, বৌডাঙ্গার গোঁসাইরা আমার মূর্তিটাকে নিয়ে গেছে। তারা আমার ঐ মূর্তিটার বড ভক্ত। তাই ওটা তাদের দিলাম। তুই নতুন করে আমার মূর্তি গড়িয়ে দে আমি তাতেই থাকব। দেহালদাহে নিমগাছ আছে, মিস্ত্রী কাল তোর সঙ্গে দেখা করবে। যা করতে হয় ঐ মিস্ত্রী দিয়েই করে নিস।" প্রভাত হওযার সঙ্গে সঙ্গে হীরালাল মিস্ত্রী এসে উপস্থিত হল গোঁসাই-এর কাছে। কোথায় তার বাড়ি, কে তাকে পাঠাল কেউ জানে না। সে কাজের খোঁজেই ঘুরতে ঘুরতে এসে-ছিল। নিমগাছও পাওয়া গেল নির্দিষ্ট স্থানে। দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল মহাধুমধামে। সেই থেকে এই মূর্তির নিয়মিত পূজা হয়ে আসছে। অবশ্য ধুমধাম নিভে গেছে। ২৫-২৬ বিঘা জমি বর্তমানে সেবায়তের খাস আছে তাই দিযে তাঁর নিজের সংসার আর ঠাকুরসেবা হয় না। দেবত্তর সম্পত্তি যা প্রজাবিলি ছিল, তা এখন সরকার স্বহস্তে নিয়েছেন তার বিনিময়ে কিছুই আজও পাওয়া যায়নি। ঠাকুরের সেবায়তকে এখন গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে হয়।

পূর্বের মন্দির পড়ে যাওয়ার পর বর্তমান গৃহ নির্মাণের সময় এক অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়। প্রাচীন মন্দিরের ইষ্টক স্তূপ সরাবার সময় ভীষণ দর্শন দুই বিষধর গোক্ষুরা সাপ বের হয়। সকলের নিষেধ সত্বেও মিস্ত্রীর যোগাড়দার দরবারী সরদার কালশত্রু সাপ দুটিকে হত্যা করে। তার ফলে সে সেই দিনেই অসুস্থ হয় আর সাতদিনের মধ্যেই মারা যায়। আঁধারকোটা গ্রামের নিথুর রায় এই রাধাগোবিন্দের জমি ও সম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে নিতে চায়। তার ফলে তার মৃত্যু ঘটে ঠিক রেজেষ্ট্রী করবার পূর্ব রাত্রে। আহারের পর রাত্রে শয্যা গ্রহণ করেন, কিন্তু তার নিদ্রা আর ভাঙ্গেনি।

রাধাগোবিন্দের মন্দির আর তাঁকে কেন্দ্র করে এতদ্ অঞ্চলের হিন্দুদের উৎসব আনন্দ হত। আর সেই সঙ্গে ফুলবেড়ে গ্রামে রাজা খোদা দরগায় চলত মুসলমান-হিন্দুর মিলিত উৎসব। বেতনা নদীর তীরে আশ্বিন মাসের

সংক্রান্তির দিন সারা দিন ধরে দরগায় পূজা দিত হিন্দু মুসলমান সকলেই, বিরাট মেলাও বসত। এখন সে দরগার উৎসব সম্পূর্ণ বন্ধ।

রাধাগোবিন্দ উৎসবের প্রতিটি দিন শত শত ভক্ত, অতিথি অভ্যাগত প্রসাদ পেত, আর ভুরিভোজে আপ্যায়িত করা হত যাঁরাই উপস্থিত হয়ে অংশ গ্রহণ করতেন এই উৎসবে। আজ গোবিন্দের প্রসাদ বিতরণ করা কল্পনায় পরিণত হয়েছে। কোথায় সেই ভোগরাগের প্রাচুর্য কোথায় সেই ভক্তি গদগদ চিত্ত বঙ্গবাসীর নাম কীর্ত্তনের মধুর ধ্বনি! যে ধ্বনি একদিন আকাশ বাতাস মুখর করে শব্দ ব্রহ্মে মানুষের আকুল প্রার্থনা আর ভক্তিপূর্ণ প্রাণের আকুলতার বার্ত্তা পৌছে দিয়েছে। সে প্রাণ মাতান আকুলতা আজ স্তব্ধ। এখন অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু তাতে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের উচ্ছলতা নেই, নেই সেখানে দিয়তাং ভুজ্যতাং। সর্বকিছু সঙ্কোচনের ফলে মানুষের হৃদয় বেগও সঙ্কুচিত হ'য়ে এসেছে। আছে সেখানে সন্দেহ, আছে সেখানে অবিশ্বাস, আছে সেখানে অহমিকা। তাই হয়ত ঠাকুর আত্মগ্লানিতে নিজেকেই ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। যিনি একদিন যেচে ঐশ্বযময় মর্মর কলেবর ত্যাগ করে দীনের ঠাকুর হয়েছিলেন দারুময় মূর্তিতে অবস্থান করে। যিনি একদিন ভক্তবৎসল হয়ে ভক্তজনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন তিনিই আবার অনাচার, অত্যাচার দ্বেষ, হিংসা, গ্লানির থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য সেই দারুময় মূর্তিকে দগ্ধ করে অন্তর্ধান হয়েছেন। কোন অজ্ঞাত কারণে অথবা সেবায়তের অবহেলায় গত ১৩৭৫ সালে রাধাগোবিন্দের দারুময় মূর্তিতে আগুন ধরে যায়। কোন অজ্ঞাত কারণে, কেমন ভাবে, কখন ঠাকুর ঘরে আগুন ধরে তা কেউ জানে না, তবে প্রভাতে দগ্ধ মন্দির আর দারুমূর্তির ভস্ম স্তূপ দেখা গিয়েছিল। দগ্ধ হয়েছিল ঠাকুরের ব্যবহৃত অন্যান্য দ্রব্যাদি যা কিছু সেই ঠাকুর ঘরে ছিল।

পুনরায় দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে; কিন্তু সেই বিশ্বাস, সেই ভক্তি, মানবহৃদয়ের সেই নির্ভরতা কি ফিরে এসেছে? দেশ বিভাগের পর বাগদার শ্রী ফিরেছে। কিন্তু পূর্বের সেই শ্রী ফিরে আসেনি;-আর আসবেওনা কোনদিন। এখন যান্ত্রিক যুগের যন্ত্রণা মানুষের অন্তরে, তাই যেন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে, "এই করেছ ভাল প্রভু এই করেছ ভাল।"

বাগদহ থেকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত বয়রা পর্যন্ত পিচের সড়ক চলে গেছে। পূর্বে এইখান থেকে বর্তমানের পূর্ব পাকিস্তানে কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর যাওয়া যেত। সেই কাঁচা রাস্তা দুটো লুপ্ত হয়ে আসছে। যন্ত্রদানব ছুটে চলে বনগ্রাম থেকে বাগদহের বুকের উপর দিয়ে বয়রা পর্যন্ত। খেয়া তরীর জন্য আর কারও অপেক্ষা করতে হয় না বেতনার ঘাটে। দূর আজ নিকট

হয়েছে ; কিন্তু যা নিকট ছিল সেই মানুষের সরল সুস্থ মনের হাসি তা আজ দূরে চলে গেছে। প্রবল ম্যালেরিয়ার প্রকোপ একদিন যে হাসি যে আনন্দ দূর করে দিয়ে সারা অঞ্চল বন জঙ্গলে পূর্ণ করে দিয়েছিল সেই ম্যালেরিয়া দূর হয়েছে। বন জঙ্গল পরিষ্কার হয়েছে। গ্রাম্য জীবনে শহরের রঙ ধরেছে ; কিন্তু তবুও আজ সব অনিশ্চিত সবই অসহায় অবস্থা। অনাগত অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ প্রহেলিকায় মানুষ সদাই সন্দিহান ; এরপর তাদের ভাগ্যে আরও কি আছে ! তাই ভাবে ! পল্লীতে বাস করেও পথের দিকে তাকাতে হয় বার বার। কবে কখন আসবে রেশনের চিনি, গম, আটা, কেরোসিন। আর কখন আসবে যে ঘরের লক্ষ্মী যাকে দূরে পাঠাতে বাধ্য হয়েছে রূপ বদলে চাল হয়ে আসতে। বর্তমানে মরশুমের সময় গুড়ের নাগরি, সরিষার বস্তা, ডালের বস্তা লরী বোঝাই হয়ে সুদূরের পথে যাত্রার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে, আর স্থানীয় মুদীর দোকানে বিক্রি হয় ভেলিগুড়, বাদাম তেল, বনস্পতি, বিহারী ডাল চড়া দামে। একি নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাত ? না নব সভ্যতার নূতন অবদানের বৈশিষ্ট্য ? মানুষ হতবাক ; এর জবাব খুঁজে পায় না। শোষণে নিঃস্ব ছিন্নমূল গ্রাম্যসমাজ আজ দিশেহারা। একদিকে প্রলোভন অন্য দিকে নিত্যবঞ্চনা দিনের পর দিন সহ্য করতে করতে মানুষ ভাল মন্দের মানুষের অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে। মুষ্টিমেয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে শতশত মানুষের আত্মবলি চলছে কৃত্রিম অর্থনীতির যূপকাষ্ঠে। বর্তমান বাংলার গ্রামের চিত্রই এই বাগদহের চিত্র। পল্লী শহর সর্বত্রই সাধারণ মানুষ ভুগছে জীবনযন্ত্রনায় মনিব বাড়িকে নিজের বাড়ি বলে গৌরববোধ করার মত শোষক মহাজনের দেশকেই মাতৃভূমি বলে দ্বারে দ্বারে মাথা কুটতে হচ্ছে মেকী গণতন্ত্রের মহিমা প্রচার করতে। এর থেকে আত্মপ্রবঞ্চনা আর কি হ'তে পারে।

বাগদহর রূপ এখন অনেক পাল্টে গেছে। ধীরে ধীরে বাগদহ শহর জীবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সরকারী অফিস কয়েকটির কার্যালয়ের অংশ বাগদহতে স্থাপিত হয়েছে। কলের জল সরবরাহের কাজ চলছে, বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে। বাগদা অঞ্চলে প্রাথমিক মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন গ্রামে। নিত্য বাজার বসছে দু'বেলা। ধীরে ধীরে দোকান বাজারের প্রসার ঘটছে। লুপ্ত হয়ে গিয়েছে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা। আজ যাঁরা এসে নূতন বসতি স্থাপন করেছেন তাঁদের সমাজ ব্যবস্থা আজ রাজনীতিকে কেন্দ্র করে। রাজনৈতিক দল ও মতাদর্শই তাঁদের সমাজ ব্যবস্থার মূল কাঠামো হয়েছে। এই ব্যবস্থার তাপ উত্তাপের মাপ কাঠিতেই

সমাজ সচলতা বজায় রাখতে ব্যস্ত। দীন দরিদ্র যাঁরা তাঁরা দলীয় রাজনীতির শিকার। তাঁদের দুঃখ ঘোচাবার বাণী আছে, আশ্বাস আছে কিন্তু ধুরন্ধরদের অতিক্রম করে সরকারের আনুকূল্য সেখানে সম্পূর্ণ পৌঁছায় না। আজও গ্রামের অবস্থা সব ক্ষেত্রেই এক। শ্রেণী ও নীতি বৈষম্যের শিকার এইসব অসহায় মানুষ চিরদিন যে দুর্গতি ভোগ করেছে এখনও তাই করছে তবে তার পদ্ধতির রকমফের হয়েছে। জাতি বা বর্ণের বৈষম্য ঘুচেছে কিন্তু নীতি বা অর্থসম্পদের বৈষম্য সেখানে প্রকট হয়ে উঠেছে। এই বৈষম্য যে দিন ঘুচবে সেই দিনই তারা পাবে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ছোঁয়া। বালক কিশোর পল্লীর কৃষক বাড়ি গরু চরায়, ক্ষেত খামারে স্বল্প মজুরীতে কাজ করে। শহর পল্লীর পথে বাদাম, আইসক্রীম ফিরি করে। প্রয়োজনের তাগিদে পরিবেশের প্রভাবে বয়স বাড়লে অনেকেই হয় সমাজবিরোধী। তাদের চিন্তা কেউ করার নেই। অথচ ঘটা করে বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সেটা ভাল হলেও অগ্রাধিকারের-ভিত্তিতে বালক কিশোরদের শিক্ষার সুযোগ করার প্রয়োজন কি এখন আসেনি?

২৭

সুন্দরপুর-পাটশিমুলিয়া

বনগ্রাম থেকে গাঁড়াপোতা সাত মাইল। বাস স্টপে নামলেই ডান হাতে একটা পিচঢালা রাস্তা সোজা পূর্বদিকে গিয়েছে। গ্রাম ছাড়ালেই দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠের বুক চিরে চলে গিয়েছে এইপথ। পথের উভয় পার্শ্বে কথন সবুজ কথন সোনালী ধান দোল খায় আর তার মাঝে মাঝে দেখা যাবে পাট ও আখের ক্ষেত। পথের পাশেই বসানো হবে গভীর নলকূপ তার জন্য সরকার গৃহ নির্মাণ করেছেন। দূর থেকে ছায়াবীথি ঘেরা গ্রাম সুন্দরপুরকে দেখা যায়। দু'মাইল পথ অতিক্রম করলে গ্রামে প্রবেশ করা যায়। গ্রামের কেন্দ্রস্থল ছুঁয়ে গ্রামের পূর্বপ্রান্তে খালের ধারে পথের শেষ।

গ্রামের কেন্দ্রস্থলে প্রবেশদ্বারেই পড়বে মিত্রদের ভাঙা পোড়ো বাড়ি। বাইরের দিকটা মনুষ্য বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে। ভিতরের দিকে কয়েকখানি জীর্ণ কক্ষে মিত্রপরিবারের কয়েকজন বাস করেন। নারায়ণ মিত্র তাঁদের অন্যতম, অঞ্চল পঞ্চায়েতের সেক্রেটারী। বড় বাড়ি তার শরিকও এখন অনেক। কে মেরামত করে। অনেক শরিকই এখন প্রবাসে। তাঁদের অনেকেই তাঁদের কর্মস্থলে বসতবাড়ি করে বাস করছেন। রুজির তাগিদে আত্মোন্নতির চেষ্টায় গ্রামের গণ্ডি পেরিয়ে শহর ও নগরবাসী হতে বাধ্য হয়েছেন।

যোড়শ শতকের শেষের দিকে যখন দেশ বর্গীদের প্রবল অত্যাচারে দিশেহারা; সেই সময় বর্গীর অত্যাচারের ভয়ে বাস্তুত্যাগ করে বেহালার

থেকে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বের হন এই মিত্র পরিবারের পূর্বপুরুষ। তখন বেহালার সঙ্গে অন্য কোন পল্লীগ্রামের পার্থক্য ছিলনা। কলিকাতার পত্তন হলেও তখন কলিকাতা গ্রাম ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বহু অনুসন্ধানের পর বনগ্রাম শহর উৎপত্তির শত বৎসর পূর্বে রমণীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে বসতি স্থাপনের জন্য নির্বাচন করলেন মিত্র মহাশয় এই স্থান। সুদীর্ঘ স্বচ্ছতোয়া বাঁওড়ের ধারে গড়ে উঠল গ্রাম। উর্বর ভূমিতে ফসল ফলাতে এলেন মাহিষ্য সম্প্রদায়। রমনীয় পরিবেশ, উর্বরজমি, স্বচ্ছ বাঁওড় এই সকলের মিলন ক্ষেত্রের নামকরণ করা হ'ল সুন্দরপুর।

মিত্র মহাশয় পরবর্তীকালে পত্তনি নিলেন দীঘাপতি রাজার অধীন এই অঞ্চলের বিবাট গাঁতি। ক্ষত্রচিত মযাদায় প্রতিষ্ঠা করলেন সুবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা। প্রতিবর্ষে দুর্গোৎসব হ'তে থাকল। লোক-জন, ধন-মানে পরিপূর্ণ সংসার। সম্ভবত দেড়শত বর্ষপূর্বে সহসা একদিন প্রচণ্ড ভূমিকম্পে দ্বিতল অট্টালিকা এমন অবস্থা প্রাপ্ত হ'ল যে দ্বিতলের কক্ষগুলির অবলুপ্তিব প্রয়োজন দেখা দিল। অট্টালিকা আর দ্বিতল হলনা

বৃটিশ আমল, চলছে তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবাহ। সেই প্রবাহ মিত্র পরিবার উপেক্ষা করেননি। শহর অঞ্চল থেকে বহুদূরে থেকেও তাঁরা কলিকাতা কৃষ্ণনগরে সন্তানদের থাকার ব্যবস্থা করে তাঁদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁরই ফলে দেখা দিল রুজি রোজগারের পরিবর্তন এবং তার প্রয়োজনও ছিল। তখন বহু শরিকে বিভক্ত গাঁতি কারও প্রয়োজন মেটাতে পারে না। তাই কেউ হলেন উকিল, কেউ শিক্ষক আবার কেউবা সরকারের বেতনভূক কর্মচারী। ফলে অনেকে প্রবাসে জীবন যাপন করতে থাকলেন বনগ্রাম, কলিকাতা প্রভৃতি শহর ও নগরে।

মিত্র বংশের কয়েকজন কৃতী সন্তানের নাম উল্লেখ করছি। রসিকলাল মিত্র তিনি গাঁড়াপোতা আর, কে, মিত্র ইনসটিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সেই বিদ্যালয়ই গাঁড়াপোতা উচ্চ বিদ্যালয়। রসিকলাল মিত্র মহাশয়ের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বনগ্রামের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন একথাই তাঁর যথেষ্ট পরিচয় নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বিশেষ করে মিঃ এলিসন্ যখন যশোহর জেলার পুলিশ সাহেব ছিলেন; তখন তিনি তদানীন্তন বনগ্রাম মহকুমা কংগ্রেসের কাজকর্মে এবং আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। শিখিন্দ্র বিহারী মিত্র বনগ্রাম কোর্টের উকিল ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হয়ে সরকারী চাকুরি পরিত্যাগ করে কিছুকাল বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার পর বারে যোগদান করেন। পরে

শিয়ালদহ কোর্টে ওকালতি করতে যান। শিখীন্দ্র বিহারীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খগেন্দ্র বিহারী মিত্র বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে আজীবন শিক্ষকতা করেন। ১৯০৪ খৃঃ যখন তদানীন্তন রিপন কলেজের চতুর্থ বার্ষিক ছাত্র সেই সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ঝাঁপ দেন। স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মিত্র পরিবারের এই সন্তান সারাজীবন দারিদ্র্য বরণ করে নেন। এমন সরল, নিরহঙ্কার রসিক, ধার্মিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি কদাচিৎ দেখা যায়। শিখীন্দ্রবিহারী মিত্রমহাশয়ের তৃতীয় পুত্র বর্তমানে জনতা পার্টির একজন খ্যাতিমান নেতা বিমান বিহারী মিত্র। সুরেন্দ্রনাথের পুত্রেরা এখন কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা। তাঁর ছয় পুত্র সকলেই শিক্ষিত।

স্বাধীনতা লাভের পর মিত্র পরিবারে আবার এক পরিবর্তন দেখা দেয়। জমিদারি থাকল না। যা কিছু খাস জমি তাতে চাষ আবাদ করে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করা সম্ভব নয় সে কারণে কয়েকজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা আরম্ভ করলেন।

মিত্র পরিবারের দৌহিত্র সন্তান বসু পরিবার। তাঁদের মধ্যে বর্তমানে যাঁরা গ্রামে আছেন তাঁদেরও কিছু জমিজমা চাষ আবাদ করতে হয়। এছাড়া কাশীনাথ বসু গাঁড়াপোতা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।

স্বাধীনতা লাভের পর গ্রামের জনসংখ্যা বিশেষ বাড়েনি। বর্তমানে লোক সংখ্যা চারিশত জনের মত। কায়স্থ চারঘর, মিত্র-বসু-দাস-দে এছাড়া মাহিষ্য আটঘর, পরামাণিক চারঘর, নমঃশূদ্র পূর্বে ছিল একঘর বর্তমানে বারঘর, তাঁতী নয়ঘর, আদিবাসী পনের ষোল ঘর এবং মালো পাঁচঘর।

জামদার বাঁওড়ের উভয় তীরের গ্রাম গুলির অধিবাসীরা এই বাঁওড়ের জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করতেন। এই বাঁওড় ছিল মিত্র পরিবারের অন্যতম আয়ের উৎস। বর্তমানে বাঁওড় মৎস্য শূন্য বলা চলে। এ বাঁওড়ে মৎস্য চাষ কেউই করেননা। ল্যাটা-উসকো-শোল-গজাল মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি যা জাল দিয়ে ধরার নয় তাই ধীবররা ধরেন। সেজন্য বর্তমানে নৌকা পিছু মাসিক পঁচিশ টাকা খাজনা ধার্য আছে। জাল দিয়ে, পুটি-মায়া-খয়রা ইত্যাদি ধরলে তার খাজনা চল্লিশ টাকা দিতে হয়। পাশের ট্যাংরা গ্রামের মালোরাও এই বাঁওড়ের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় মালোদের এবং বহুবিভক্ত মালিকদের অবস্থা শোচনীয়।

বাঁওড় দেখাশুনা করার জন্য মিত্র পরিবারেরই সন্তানদের নিয়ে গঠিত একটি সমিতি আছে, তার প্রধান নারায়ণ মিত্র। মাছের চাষ করলে প্রচুর মাছ জন্মাত। জেলেরা বলেন এ বাঁওড়ে মাছের বাড় হয় খুব দ্রুত।

কলিকাতার এক ভদ্রলোক লিজ নিয়েছিলেন। তিনি প্রচুর লাভবান হন কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় বাঁওড় আবার মিত্রদের অধীনে আসে, কিন্তু ভাগের মা গঙ্গা পাচ্ছে না।

সুন্দরপুরের মাহিষ্যদের অবস্থা ভাল একথা বলা চলে না। সকলেরই কিছু কিছু জমিজমা আছে কিন্তু তাতে অবশ্য কারও চলেনা; সে কারণে ভাগ চাষ, লাঙ্গল বেচা, কৃষিশ্রমিক ইত্যাদি নানাভাবে কাজকর্ম করে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করছেন। এর কারণ ক্রমশ জমিজমা বহুভাগে বিভক্ত হয়েছে এবং দায়ে পড়ে অনেকে জমি হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়েছেন।

সরদার উপাধিধারী আদিবাসীরা সকলেই ক্ষেত মজুর। দু'তিন ঘর সরদারে দু'-এক বিঘা করে জমি আছে। তাদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং নিজস্ব সংস্কৃতি বলতে কিছুই আর নেই। দিন গুজরানের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত। নমঃশূদ্র সকলেই কৃষিজীবী সামান্য কিছু কিছু জমিজমা আছে। অভাব মেটাতে ক্ষেত মজুরীও করেন।

তাঁতীরা এখন আর পেশায় তাঁতী নয় বর্ণে তাঁতী। পেশা বর্তমানে চাষবাস, আর সামান্য কিছু কিছু ব্যবসায়।

বর্তমান গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে সরকারী আনুকূল্যে। মাটির দেওয়াল টালির চাল যুক্ত একটি ঘরে আশিজন ছাত্রকে দু'জন শিক্ষক নিয়ে বসেন। প্রধান শিক্ষক মিত্র পরিবারের শান্তি মিত্র। গাঁড়াপোতার বাড়ি থেকে আসেন।

পূজা পার্বণ বলতে গেলে ছিল মিত্র বাড়ির দুর্গাপূজা। আজ ত্রিশ বৎসর তা বন্ধ হয়ে গেছে। এই পূজায় আসপাশের গ্রামের লোক ও অংশ গ্রহণ করতেন। পূজা উপলক্ষে নাচ, গান, যাত্রা ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। আজ ত্রিশ বছর সবই বন্ধ। সাজার পূজা এখন কে করে? যাঁরা ভিটেয় আছেন তাঁদের সঙ্গতি কোথায়?

রক্ষাকালী পূজা ও হরিপূজা এখনও হচ্ছে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাস। হরিপূজায় একটা পাঁঠা, রক্ষাকালী পূজায় পাঁচটা পাঁঠা এখনও বলি দেওয়া হয়ে থাকে। অনেকের এতে আপত্তি থাকলেও গ্রামবাসীদের অনেকেই এই বলিদান পূজার আবশ্যিক অঙ্গ বলে মনে করেন। সে কারণে বলি বন্ধ করা সম্ভব আজও হয়ে ওঠেনি।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে গ্রামের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। বৃহৎ আমবাগানে ছিল ঝোপ-ঝাড়, ছিল তাতে বাঘ বুনো শূয়োর। দিনের বেলায়ও পথে চলাফেরা সাবধানে করতে হত। যাঁদের গ্রাম ছাড়ার উপায় নেই

তারাই কোন রকমে পৈতৃক ভিটে আঁকড়ে ছিলেন। এখন আর সে আমবাগান দেখা যাবে না, ঝোপ-ঝাড়ও অবলুপ্ত। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় থেকেই ঐ সব আমবাগান একে একে অপসৃত হতে থাকে। এখন সেখানে চাষবাস হচ্ছে ; ফলছে ধান, পাট। গভীর সরকারী নলকূপ এখনও বসেনি, তাই অনেকে নিজস্ব অগভীর নলকূপের সাহায্য নিচ্ছেন। যাঁদের তা নেই. তাঁরা যাঁদের আছে তাঁদের কাছ থেকে জল কিনছেন।

সুন্দরপুর পর্যন্তই পিচের রাস্তা। জিতেন্দ্রনাথ মিত্রের চেষ্টায় এই রাস্তা নির্মাণ হয়। খাল পার হওয়ার জন্য বাঁশের সেতু আছে। ওপারে ট্যাংরা গ্রাম। মালো, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য ইত্যাদির বসবাস। সকলেই কৃষিজীবী। মালোরা জামদার বাঁওড়ের উপর নির্ভরশীল। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে শিক্ষার প্রচেষ্টা হয়েছে। দুর্গাপদ সরদার রণঘাট অঞ্চল উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ট্যাংরার দক্ষিণ অংশে ট্যাংরা কলোনী। অধিবাসী সকলেই নমঃশূদ্র। একটা উচ্চ বিদ্যালয়ও আছে এই ট্যাংরা কলোনিতে। জামদার বাঁওড়ের অপরপারে

উদয়পুরকে একটা নাতিদীর্ঘ কাঁচা রাস্তা পাট শিমুলিয়ার সঙ্গে যুক্ত করেছে। ছোট্ট মাঠের মাঝ দিয়ে দেখা যায় সামনেই সেগুন বাগানের আড়ালে জীর্ণ মসজিদ। অবহেলায় রক্ষিত। একদিন এই মসজিদ ঘিরে ছিল মুসলমান বসতি। তাঁদের অনেকেই বিনিময় সূত্রে দেশান্তরী। দু' এক ঘর যাঁরা আছেন তাঁদের বাড়িঘর স্বচ্ছলতার পরিচয় দেয়না। এই পথটি বনগ্রাম বয়রা সড়ক থেকে যে কাঁচা রাস্তাটি বার হয়ে পাটশিমুলিয়ার মধ্য দিয়ে গুটিয়া পর্যন্ত গিয়েছে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। পাটশিমুলিয়ার এই পথ প্রশস্ত হলেও বর্ষায় হয় গভীর কাদা আর অন্য সময় ধূলায় ধূসর। সেগুন বাগানের পাশেই প্রাচীন কালের নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় এতদ অঞ্চলের গ্রামগুলির মধ্যে একমাত্র বিদ্যালয় ছিল। শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত যাঁরা এই গ্রামের তাঁরা সকলেই এই বিদ্যালয়ে প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছেন।

পতিতপাবন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঐ বিদ্যালয়টির গৃহ নির্মাণ এবং প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের এখন আর গ্রামে কেউ নেই। তাঁর বংশধরদের কেউ গৈপুর কেউ কলকাতায় বসবাস করছেন। মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০ খৃঃ। তার পাশেই সেগুন গাছে ঘেরা পুকুর। পাটশিমুলিয়ার এই পথটি এখন পাকারাস্তার মর্যাদা লাভ করতে চলেছে। বনগ্রাম বয়রা রোড থেকে গ্রামে আসতে গেলে এই পথ ধরেই আসতে হত। সংকীর্ণ ভাগাড় গো-যান ছাড়া অন্য কোন যানবাহন চলত না এই পথে। উভয় পার্শ্বে ছিল

বড় বড় আম কাঁঠালের বাগান। ঝোপে ঝাড়ে পূর্ণ এই বাগান গুলিই ছিল বাঘ বুনো শূযোরের আড্ডা। দিনের বেলাতেও লোকে ঐ পথে যেতে ভয় পেত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সহসা কাঠের মূল্য বৃদ্ধিতে ঐ সকল প্রাচীন গাছ বিক্রী হতে থাকে ফলে আমবাগানের পরিবর্তে এখন পথের উভয় পার্শ্বে আবাদী জমি ধান, পাট, গম, সবিষা, ছোলা ফলছে সেচের সাহায্যে। এই পথ ধবে গ্রামে প্রবেশ করলে এখন দেখা যাবে অনেক নূতন গৃহস্থের বসতি। বঙ্গ বিভাগের পর তাঁরা এখানে ঘর বেঁধেছেন। এই পথ থেকে আব একটা কাঁচা বাস্তা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেছে। সেই পথের উপরে দেখা যাবে একটা বৃহৎ দোলমঞ্চ। এখন তাতে ফাটল দেখা দিযেছে। প্রকৃতিও তাকে সাজাতে আরম্ভ কবেছেন। এই দোলমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হযেছিল তিনশত বৎসব পূর্বে। ব্রজবাম মণ্ডল এই দোলমঞ্চ প্রতিষ্ঠা কবেন। ব্রজরামের জীবন কথা অনেক শোনা যায় গ্রামবাসীদেব মুখে মুখে। তিনি জলকষ্ট নিবারণের জন্য এক বিশাল দীঘি খনন কবেন। বার বিঘা স্থান জুড়ে এই দীঘি আজও বর্তমান। তিনি যেমন ছিলেন পরম বৈষ্ণব তেমনই ছিলেন বদান্য। তার চাষবাস ছিল বিবাট আকাবেব। তার গোলা বাড়ি ছিল একটা পাড়া জুড়ে। একদিন একটা কাক একটি জ্বলন্ত প্রদীপেব পলিতা মুখে নিযে গোলা বাড়িব চালে ফেলে তাতেই পুড়ে যায় তার গোলা এবং এত ধান তাতে পুড়েছিল যে আজও সেই স্থান খুঁডলে ধানেব ছাই পাওযা যায়। সেই স্থানেব নাম এখন পোড়াপোঁতা। ব্রজরামেব বদান্যতাব কাহিনী ও অনেক শোনা যায়। ব্রজবামেব মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধেব দিন তাঁব গুরুদেব তাঁব বাড়িতে আসছিলেন। তিনি তাঁব মৃত্যু সংবাদ পাননি। পথে তাঁর ব্রজরামের সঙ্গে দেখা হয। ব্রজরাম দণ্ডবৎ হযে গুরুদেবকে প্রণাম জানান এবং বলেন যে তিনি তীর্থ যাত্রা করেছেন সুতবাং আর বাড়ি ফিবেবেন না। গুরুদেব যেন তাব বাড়ি গিয়ে তিনি একটা ঘটিতে গুরু প্রণামী বেখে এসেছেন তা যেন গ্রহণ কবেন। গৃহ প্রাঙ্গণে একটা বৃক্ষ নিম্নে ঘটীটি পোঁতা আছে। গুরুদেব যথা রীতি তাঁর বাড়ি উপস্থিত হয়ে দেখেন শ্রাদ্ধ কার্য চলছে। জিজ্ঞাসা কবায জানলেন এই শ্রাদ্ধ ব্রজরামেবই তখন তিনি ব্রজবামে সঙ্গে পথে তার সাক্ষাৎকাবেব কথা ও প্রণামীর টাকার কথাবলেন। সেই স্থান খুঁড়ে সেই ঘটী উদ্ধার হয় এবং গুরুদেবকে যথারীতি প্রণামীও দেওয়া হয়। ব্রজরামের বংশের এখন একটি মাত্র কন্যা বর্তমান আছেন।

পাটশিমুলিয়া গ্রামে আর একটি প্রতিষ্ঠিত দেবতা আছেন। পাঁচশত

বৎসর পূর্বে এই দেবতার প্রতিষ্ঠা। রায় বংশের প্রতিষ্ঠিত এই দেবতা। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বাঁশ বাগানে দেবীর ঘট পাওয়া যায়। সেইখানেই সেই ঘটের পূজা হয় এক খড়ের চালা ঘরে। আজ পাঁচশত বৎসর ধরে এই পূজা হয় আসছে। কার্তিক মাসে শ্যামাপূজার দিন মায়ের মৃন্ময় মূর্তি গড়ে পূজা, হয় সে সময়ের এক অদ্ভুত দৃশ্য আজও প্রত্যক্ষ করা যায়। ঐ চালা ঘরের চারি পাশে বাঁশের শুকনো ঢিবি করে বেষ্টন করা হয় এবং তাতে আগুন লাগান হয়। সারারাত এই ধুনী জ্বলে তাতে ঐ চালা ঘর'ত পোড়েই না উপরন্তু আস পাশের কোন গৃহস্থের চালা ঘরেরও কোন ক্ষতি হয়না। এই কালী নিত্য পূজা হয়ে থাকে আজও। রায় বংশের দৌহিত্র সন্তান শিবপদ মুখোপাধ্যায় এখন রায় বংশের উত্তরাধিকারিক। তার পিতামহ গুপ্তি পাড়া নিবাসী সীতানাথ মুখোপাধ্যায় শ্বশুরের সম্পত্তি লাভ করে এই গ্রামে আসেন।

পাটশিমুলিয়াব আব একজন কৃতি সন্তানের কথা না বললে পাটশিমুলিয়ার পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কৃষ্ণনগরের সুবিখ্যাত নেতা ও বিপ্লবী দেশপ্রেমিক তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রামেই জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রামের পাঠশালায় প্রথম পাঠ শেষ করে কৃষ্ণনগরে এক জ্ঞাতি খুড়োর বাড়ি শিক্ষা লাভের জন্য যান। সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পর কলেজে ভর্তি হন; কিন্তুতিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হযে পড়েন। লেখাপড়া আর করা সম্ভব হয়নি। তিনি একজন কংগ্রেস কর্মী ছিলেন। ১৯৪০ সালে বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদকও হয়েছিলেন। তিনি নেতাজীর অনুগামী ছিলেন। বহু জন হিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে নদীয়ার জেলা কংগ্রেসের, জেলা বোর্ডের এবং জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতিব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ কবে বহুবার কারা বরণ করেন। অন্তরীণ হয়েও থাকতে হয় তাঁকে অনেক বার। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে অশেষভাবে লাঞ্ছিত করে ও নির্যাতন করে। বঙ্গ বিভাগের পর দলে দলে পূর্ববঙ্গেব উদ্বাস্তু যখন আসতে থাকে তখন তারকনাথ সেই ছিন্নমূল বাঙ্গালীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থার জন্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় নদীয়ার এক তৃতীয়াংশ উদ্বাস্তু অধ্যুষিত। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য রূপে থেকে তিনি নদীয়ার উন্নতি বিধানে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। আজ তারক দাসের ভিটে আঁকড়ে আছেন তার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র।

পাটশিমুলিয়া গ্রামে ছেলে মেয়েরা এখন শিক্ষা লাভ করতে দুমাইল

মাটির রাস্তা অতিক্রম করে অধ্যয়ন করতে যায় বাসে গাঁড়াপোতা ও হেলে-ঞ্চায়। উচ্চতর শিক্ষার জন্য যায় বনগ্রামে। যে গ্রাম থেকে বিদায় না নিয়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ ছিলনা আর তাইবা কজনের জুটত! আর আজ ছেলে মেয়েরা নিত্য যাত্রী বাসের। শিক্ষা লাভ করে নিত্য বাড়ি ফিরছে যা একদিন ছিল গ্রাম বাসিদের কাছে স্বপ্ন।

পাটশিমুলিয়া গ্রামে এখন একটি হেলথ সেণ্টারও হয়েছে তাতে অনেকেই উপকৃত। ডাক্তার ও নার্সদের কোয়ার্টারও আছে। পাটশিমুলিয়া পোষ্ট অফিস স্বাধীনতা লাভের পর হয়েছে। তারক দাসের বাড়িতেই। জন জীবনে আধুনিকতার ছোঁয়া যেমন লেগেছে তেমনি আছে প্রচীন সংস্কার। রাজনৈতিক উত্তাপও আছে।, নানা বর্ণ নানা শ্রেণী এখন ও আছে তবে সেটা রাজনৈতিক মত ও আদর্শের উপর ভিত্তি করে। গ্রামবাংলার বর্তমান চিত্র যা তা থেকে পাটশিমুলিয়া দূবে নয়। স্বাধীনতা লাভে যাদের পৌষ-মাস চলছে তারা অপরের সর্বনাশের দিকে দৃষ্টিপাত করার অবসর পান না। সুখ সুবিধা তাঁদের নিজস্ব সম্পদ। যাবা ক্ষেতমজুর, যারা ভূমি হীন, যে সকল মধ্যবিত্তের বেকার ছেলে শিক্ষা লাভ কবে কাজ পাচ্ছে না তাদের হাঁড়ি চডল কি না চড়ল তার খবর'কে রাখে।

হরিদাসপুর খলিতপুর জয়ন্তীপুর

বনগ্রামের বর্তমান সীমারেখার সীমান্তে যে কয়টি গ্রাম অতীতের স্মৃতি, দেশের পরিবর্তন, অধিবাসীদের সুখ-দুঃখের ইতিহাস বহন করছে তাদের মধ্যে কয়েকটি গ্রামের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। যুগচক্রের পরিক্রমায় রাষ্ট্র, দেশ, জাতি, ধর্ম ও সংস্কার সব কিছুরই পরিবর্তন হয়। মৌন অস্থাবর ধরিত্রী তার সাক্ষী হয়ে বহন করেন অতীতের ইতিহাস। কোথাও এই ইতিহাসের প্রামাণ্য নিদর্শন মেলে আবার কোথাও মেলে না। লোক মুখের অনেক কিংবদন্তীই গঠন করে চলে ইতিহাসের সম্পদ। এরকম গ্রামের কত কাহিনী লুপ্ত হয়ে গেছে; মানুষের বিবর্তনের মাঝে হারিয়ে গেছে তার হিসাব মেলে না।

সীমান্তের একটি গ্রাম হরিদাসপুর। এককালে ছিল মুসলমানপ্রধান গ্রাম। কয়েক ঘর ব্রতক্ষত্রিয় (বাগদী) ছাড়া হিন্দু বসতি এ গ্রামে ছিলনা বললেই হয়। বর্তমানে অধিবাসীদের রূপ পালটেছে। হরিদাসপুর এখন সীমান্তের প্রহরী হয়ে নাওভাঙ্গা নদীর তীরে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দ্বাররক্ষক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হরিদাসপুর গ্রামের অতীত ইতিহাস তাহার নামই বহন করে আসছে। এই নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক মহাপুরুষের স্মৃতিকথা। যার পদধূলিপূত এই গ্রাম আজ আমরা দেখছি তাঁর সম্বন্ধেও কিছু বলার প্রয়োজন। ইতিহাসের পাতায় তাঁর অনেক পরিচয় আছে সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখা নতুনত্ব না হলেও হরিদাসপুর সম্বন্ধে লিখতে হলে তাঁর সম্বন্ধে কিছু না লিখলে সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়।

পাঠান শাসনকালে দেশের লোক সব কুপথগামী। জাতিভেদ প্রথায়

বাংলাদেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বহু হিন্দু নির্যাতনের ফলে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করছে। সেই সময় বাংলায় জন্মগ্রহণ করলেন নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর সময় আর একজন জন্মগ্রহণ করেছিলেন যশোহর জেলায়। এই মহাপুরুষের পদধূলি বনগ্রামের মাটিতে আজও মিশে আছে। তিনি কিছুদিন এই বনগ্রামে বাসও করেছিলেন। যে মহাপুরুষের কথা বলতে চাচ্ছি তার নাম যবন হরিদাস। হরিদাস ব্রাহ্মণ কুলেই জন্মগ্রহণ করেন। ১৪৫০ খৃঃ যশোহর জেলার ভাটকলাগাছি গ্রামে। তাঁর বাপ মা মুসলমান হন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁদের মৃত্যু হয়। হরিদাসও মুসলমান (যবন)। হাকিমপুরের কাজীরা তাঁকে মানুষ করে। তিনি মুসলমান বাড়ি থেকে ভাগবৎ পাঠ করতেন। হরিনাম করতেন। তাঁর বাপ মায়ের ধর্মান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও মুসলমান বলে গণ্য হয়েছেন। তাঁর এই হিন্দু ধর্মের প্রতি অনুরক্তির ফলে কাজীরা তাঁর উপর গেল ভীষণ চটে। চলতে লাগল তাঁর উপর নানারূপ অত্যাচার। হরিদাস অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলেন বেনাপোলের জঙ্গলে। সেখানে এক কুঁড়ে ঘর আর তুলসীমঞ্চ করে দিনরাত কেবল হরিনাম করেন। বেনাপোল ভারত বিভাগের পূর্ব বনগ্রামের অন্তর্গতই ছিল। এখন বেনাপোল বাংলাদেশে। বনগ্রাম থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত।

সে সময় বেনাপোলে এক রাজা ছিলেন তাঁর নাম ছিল রামচন্দ্র খাঁ। তাঁর ছিল মুসলমান প্রীতি কারণ তদানীন্তন গৌড়ের নবাব হুসেন শাহের প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। হরিদাস যবনের হরিনামে অনুরক্তিতে রামচন্দ্র খাঁ তাঁর উপর অত্যাচার আরম্ভ করলেন। হরিদাস বাধ্য হয়ে বেনাপোল ত্যাগ করে পথে বের হলেন। যশোহর চাকদহ রাস্তা ধরে আসতে আসতে নাওভাঙ্গা নদী পার হয়েই একস্থানে তিনি বিশ্রাম করেন কয়েকদিন। সঙ্গে সঙ্গে তার হরিনামের মধুর সুরে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসতে লাগল দলে দলে লোক। মহাপুরুষের পাদস্পর্শে ধন্য হল বনগ্রাম আর বনগ্রামবাসী। হরিদাস যে স্থানে কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন সেই স্থানের নাম বর্তমানে হরিদাসপুর।

হরিদাস ঠাকুর যে স্থানে ছিলেন সেই স্থান দীর্ঘকাল বাঁশের বেড়া দিয়েই ঘেরা থাকত। একটা তুলসী মঞ্চ ছিল তার মধ্যে। ১৩৩৭ সালে খলিতপুর পল্লীর একজন দীনভক্ত প্রহ্লাদ চন্দ্র সূত্রধর সেখানে একটি মন্দির নির্মাণ করান। তাঁর মন্দির নির্মাণ করার কোন সঙ্গতি ছিল না। কিন্তু হয়ত ঠাকুরের দয়ায় তাঁর মত নিঃস্ব ব্যক্তির পক্ষে ঐ মন্দির নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করা

সম্ভব হয়েছিল। ঐ বৎসর ফাল্গুন মাসের দোলের দিন খুব ধুমধামের সঙ্গে মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়। শত শত ভক্ত আজও ঐ মন্দির দ্বারে সমবেত হচ্ছে, যবন মহাপুরুষকে স্মরণ করছে আর প্রণতি জানাচ্ছে প্রাণের ঠাকুর গোবিন্দ দেবকে। হরিদাসপুর গ্রাম অতীত ঐতিহ্যের মৌন সাক্ষী। অধুনা ছয়ঘরিয়ায় স্থাপিত হয়েছে হরিদাস ঠাকুরের পূতস্মৃতি রক্ষার্থে ঠাকুর হরিদাস বালিকা বিদ্যালয়। এখন হরিদাসপুরে আমেরিকার বৈষ্ণব সাধুদের সমাগম ঘটেছে। তাঁরা এখানে নাম যজ্ঞ করেন। তাঁরা সকল ভোগ বিসর্জন দিয়ে বৈরাগ্য নিয়ে জীবন কাটাচ্ছেন।

হীরার গাছতলা :

যশোহর রোডের ধারে বনগ্রাম ও ছয়ঘরিয়ার পথের মাঝে রাখালদাস উচ্চ বিদ্যালয়ের নিকট একটা বটগাছ ছিল। এখন সে গাছটা নেই। কয়েক বছর পূর্বে মানবের মহান স্বার্থে গাছটি তার সকল স্মৃতির কাঁটা বুকে নিয়ে আত্মদান করেছে। এখনও ঐ স্থানকে প্রাচীন লোকেরা হীরার গাছতলা বলে থাকেন। ক্রমে হয়ত সকলে ভুলেই যাবে ঐ নাম, তার স্মৃতিও লুপ্ত হয়ে যাবে মানুষের কাছে, ইতিহাসও হারিয়ে যাবে কালচক্রের আবর্তে।

ঐ গাছতলায় ছিল ডাকাত বা দস্যুর আড্ডা। পথ চলা তখনকার দিনে ছিল বিপদসঙ্কুল। বেনাপোলের রাজা রামচন্দ্র খাঁ ঠাকুর হরিদাসকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁর বিখ্যাত প্রিয় নটী হীরাকে পাঠান ঠাকুর হরিদাসের নিকট। হরিদাসের মধুর নাম গানে হীরার হৃদয় হল পবিত্র। হীরা দীক্ষা নিল ঠাকুর হরিদাসের কাছে। সব ছেড়ে সে রওনা হল জগন্নাথ-দেবের উদ্দেশ্যে। পথে ঐ গাছতলায় ধরল ডাকাতের দল। কিন্তু হরি-নামের মাধুর্যে, হীরার সুমধুর নাম গানে ডাকাতের দলের পরিবর্তন ঘটল। তারা লুটিয়ে পড়ল হীরার পায়ে, ছুটল হীরার পিছন পিছন জগন্নাথ তীর্থের পথে। সেই থেকে ঐ জায়গাটার নাম হীরার গাছতলা। অনেকের নিকট একথাও শোনা যায় যে হীরা নামে এক ডাকাত থাকত ঐ গাছ-তলায় তার নামেই ঐ গাছের নামকরণ হয়েছিল। হীরা নটীর নাম অনুসারে গাছটির নামকরণের কথাই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়।

তেরের মেলা ও নরহরিপুর :

হরিদাসপুরের পরপারে নাওভাঙ্গা নদীর তীরে বিরাট এক আমবাগান ছিল। কয়েক বছর পূর্বে বৃক্ষকুল আত্মদান করেছে নরের কল্যাণে। বাগানের পূর্বপাশে কয়েক ঘর ব্রতক্ষত্রিয় (বাগদী) জাতির বাস। ঠাকুর

হরিদাসের কৃপাদৃষ্টি বোধ হয় এই অবহেলিত দরিদ্র কয়েকঘর হিন্দু জাতির উপর পড়েছিল।

একদিন ভোরের আলো তখনও স্পষ্ট দেখা দেয়নি। আম বাগানের মধ্যে দীর্ঘাকৃতি এক সৌম্য মূর্তির চলাফেরা দেখল এক বাগদী রমণী। রমণী বিধবা, ছেলের নাম বুধুরাম বিশ্বাস। সহসা এ রকম একজন লোককে দেখে তার কৌতুহল হল। ধীরে ধীরে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে সাহসে ভর করে জিজ্ঞাসা করল, "কে আপনি?" সেই সৌম্য মূর্তি উত্তর দিলেন, আমাকে তুমি চিনবে না মা, আমি একজন বিদেশী এখানে একটু বেড়াতে এসেছি। তোমাদের এই গ্রামটা খুব ভাল লেগেছে আমার, সে জন্য এখানে একটু বেড়াচ্ছি।"

এ সব কথার ফাঁকেও কিন্তু তাঁর মুখে হরির গুণগান। রমণী মহামানবের সংস্পর্শে অভিভূত হয়ে পড়ল, বাহ্যজ্ঞান হারাল, সে ধীরে ধীরে ঠাকুরের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ল, ঠাকুর আশীর্বাদ করে বললেন, "মা এখানে যাকে দেখবি তাকেই পূজা করবি আজ।" সেই থেকেই এই গ্রামের নাম রাখা হয় নরহরিপুর — নরহরি হরিদাসের নামানুসারে। যখন সম্বিৎ ফিরল তখন রমণী চেয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই। অদূরে অশ্বত্থ গাছের তলায় এক গোখরো সাপ ফণা বিস্তার করে দুলছে।

সেদিন শ্রাবণ মাসের তের তারিখ। সেই দিন থেকে ঠাকুরের আদেশে ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষের তলাতে হয়ে আসছে মা মনসার পূজা। সেই উপলক্ষ্যে মেলাও। ঘটা করে পূজা হয়। পূজা করেন পুরোহিত। কিন্তু তার উদ্যোক্তা নারীরাই। পূজার পূর্বদিন সন্ধ্যা থেকে মেয়েরা জাতগান গায় পরদিন সকাল পর্যন্ত। তারপর পূজা আরম্ভ হয়। পূজার সময়ও চলে জাতগান। জাতগান হল মা মনসার স্তবস্তুতিপূর্ণ গান। মেলায় আসে নানা পণ্য দ্রব্য। বিকিকিনি সব সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে সেই বৃক্ষতলে ঐ অনুষ্ঠান। প্রতি বৎসর ১৩ই শ্রাবণ মনসার পুজা হয়ে আসছে ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষতলে। স্থানীয় লোকেরা বলে ওকে "তেরের মেলা"। তেরো তারিখে হয় বলে নামকরণ ঐরূপ করা হয়েছে।

আজ আর সে আমবাগান নেই। ঐ স্থানের জমিদার ঘোষেরা, গাছগুলি তাঁদের কোন বংশধরের প্রয়োজনের তাগিদ সহ্য করতে না পেরে দধীচির ন্যায় আত্মদান করেছে। তবে আমবাগানের জমি দেড় বিঘা দেবত্র জমি বলে রেকর্ড করা আছে। সুতরাং আজও জমিদারের প্রয়োজনে

হস্তান্তর হতে পারেনি। বর্তমানে কয়েকঘর উদ্বাস্তু কারও অনুমতি না নিয়েই ঘর বেঁধে বাস করছে ঐ জমিতে। মাটির দেওয়াল টালির চাল। শোনা যায় জমিদারের জনৈক উত্তরাধিকারী চেষ্টা করছেন ঐ বসতি কয়েক ঘরের কাছ থেকে বন্দোবস্ত করে নেওয়ার ও দেওয়ার। অশ্বত্থ গাছের তলায় ইট দিয়ে গাঁথা ঠাকুরের পিঁড়ি পাশে একটা মনসা সেজির গাছ। বর্তমানে ঐ পূজার অনুষ্ঠান করে থাকেন ফণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস বুধুরাম বিশ্বাসের পৌত্র। প্রতি বছরে মেলাও বসে তবে তা স্তিমিত হয়ে আসছে উৎসব আনন্দে ভাঁটা পড়েছে।

নরহরিপুরে যশোহর রাস্তার ধারে আর একটা পীঠস্থান গড়ে উঠেছে। দোলমঞ্চ আর তৎসংলগ্ন একটি মন্দির। বেনাপোলের পাটবাড়ি যাওয়ার পাট মিটে গেল পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে। ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ যারা বেনাপোলে যেতেন দোল উৎসবে যোগ দিতে, তাঁরা প্রতিষ্ঠা করলেন দোলমঞ্চ আর ঠাকুরের বেদী। এই স্থানে তাঁদের ভক্তির টানে ঠাকুর ঐ পীঠস্থানেই এসেছেন তাঁর দীন ভক্তদের আশীর্বাদ করতে। প্রতি বৎসর দোল পূর্ণিমা উৎসব হয় ঘটা করে।

খলিতপুর :

নরহরিপুরের পাশেই আর একটি বহু প্রাচীন গ্রাম, নাম খলিতপুর। এই খলিতপুরে নাওভাঙ্গা নদীর তীরে তান্ত্রিক সাধকদের সাধন ক্ষেত্র ছিল এক বটগাছের তলায়। আজ বছর কুড়ি হল বটগাছ ঝড়ে গত হয়েছে। কিন্তু পিঁড়ি আছে, আর আছে কয়েক খানি প্রস্তরখণ্ড। পঞ্চ-মুণ্ডির আসন ছিল ঐ গাছ তলায়। তন্ত্রসাধনার অনেক চিহ্নই বর্তমান ছিল। গ্রাম পত্তন হওয়ার পর থেকেই ঐ স্থানটিকে পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। প্রতি বৎসর মাঘমাসের শুক্লপক্ষের শনিবার বা মঙ্গলবার ৺কালী-মাতার পূজা হয়। বিস্ময়ের বিষয় ঐ কৃষ্ণবর্ণের বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডগুলি। দীর্ঘকাল গত হয়ে গেছে, সেগুলি কিভাবে এল, কেমন করে এল তার কোন প্রমাণ নেই। অক্ষয় প্রস্তরখণ্ড পড়ে আছে মৌন সাক্ষী হয়ে। মহাকালের প্রতিটি স্পন্দন ওগুলির পাষাণ হৃদয়ে প্রতিধ্বনি তুলে মায়ের পূতস্মৃতি রোমন্থন করে চলেছে নির্বাক সাক্ষী হয়ে। খলিতপুর বহু প্রাচীন গ্রাম। অতি বর্ষীয়ান যাঁরা তাঁরাও জানেননা বা শোনেননি যে ঐপ্রস্তরখণ্ড গুলির ঐতিহ্য কি? তবে তাঁরা পবিত্র ঐ প্রস্তরখণ্ডগুলি নষ্ট হতে দেন নি। সযত্নে সাজিয়ে রেখেছেন মায়ের বেদীর পাশে।

জয়ন্তীপুর :

খলিতপুর থেকে প্রায় দুইমাইল পূর্বে যশোহর রোডের পার্শ্বে আর এক গ্রাম জয়ন্তীপুর। হাঁকোর নদীর ধারে এই গ্রাম। হাঁকোর নদী এখন মজাখাল বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই জয়ন্তীপুর একদিন বৃটিশ কোম্পানীর শাসন কালে ছিল জমজমাট। কোম্পানীর বিচারালয় ছিল জয়ন্তীপুরেই হাঁকোরের ধারে। বনগ্রামে আদালত প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জয়ন্তীপুরই ছিল এতদ্ অঞ্চলের প্রাণ কেন্দ্র। প্রচুর জয়ন্তী ফুলের গাছ এই গ্রামে জন্মে থাকে। এই গ্রামের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই গ্রামের নাম জয়ন্তীপুর। এখন জয়ন্তীপুব পেটরাপোল সীমান্ত ষ্টেশনের পাশে কোম্পানীর কত অত্যাচার কত বিচার, প্রহসন হয়েছে এই খানে। নীল-কুঠির কুঠিয়াল সাহেবদের মিথ্যা মামলায় সবল নিরীহ কৃষক সর্বস্বান্ত হয়েছে এই জয়ন্তীপুর রুদ্ধদ্বারে। সে কাহিনী রচনা হয়নি কোন দিন আজও মুখে মুখে দু একটা কাহিনী শোনা যায়। কালে হয়ত তাও হারিয়ে যাবে। শীর্ণ হাঁকোর নদী কত সন্তাপ ধৌত করে নিয়ে গেছে। আজ সর্বহারা নদীর পঙ্কিল দেহে ডুবে আছে অতীতের দুঃখ, দৈন্য সুখ, শান্তির মর্মকথা, কে তা উদ্ধার করবে। যুগ যুগান্তের আবর্তে লীন হয়ে যাবে সবই। রুদ্ধগতি নদীর আপন মর্মস্থলে সকল বেদনা সঞ্চিত হয়ে থাকবে।

২৯

শিমুলতলা

বর্তমানে আর স্বাধীনতা লাভের পূর্বের বনগ্রামের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য এখন খুঁজে পাওয়া যাবেনা। তখনকার পল্লী গুলির সঙ্গে এখনকার পল্লী গুলির কোন সাদৃশ্যও কোথাও নেই। তিনশত বৎসর ধরে এই বনগ্রাম যে তিল তিল করে তিলোত্তমা হচ্ছে একথা বলারও দুঃসাহস করা যাবে না। নানা সমস্যা জর জর পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত শহর বনগ্রাম ও তার অন্তর্ভুক্ত গ্রামে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে; সে কারণে পূর্বের সমস্যার থেকে এখনকার সমস্যার বেশ কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয় এ কথা বলা যায়। সুতরাং তিলোত্তমা স্বর্গরাজ্য থেকে ইন্দ্রের রাজসভা ত্যাগ করে আসতে সাহস পাচ্ছেন না।

বঙ্গদেশের রূপই হোক আর জাতীয় মানসই হোক তার কিছু প্রতিফলন ঘটানো যেতে পারে বিংশ শতকের প্রথমে প্রতিষ্ঠিত একটি গ্রামের ক্রম বিকাশের মধ্য দিয়ে। যে পল্লী এখন বনগ্রাম পৌরপ্রতিষ্ঠানের অধীন শিমুলতলা নামে খ্যাত।

প্রবল ম্যালেরিয়া আর কলেরায় বনগ্রাম শহরের আশেপাশের গ্রামগুলি প্রায় জনহীন হওয়ার উপক্রম হয়। জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামের মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা অনেকেই পৈতৃক বিষয়-আশায় ত্যাগ করে স্থানান্তরে যাওয়ার সঙ্কল্প করেন। মতিগঞ্জের পূর্ব-দক্ষিণ দিকে যশোহর রোডের পাশে ইছামতী নদীর ধারে এক বিস্তীর্ণ এলাকা জয়পুর মৌজার অন্তর্গত জনমানব হীন প্রান্তরের একাধিক হিন্দুজমিদার থাকলেও দখলদার মধ্যস্বত্বভোগী মালিক ছিলেন জয়পুরের মুসলমানেরা। তাঁরা কেউ কেউ কিছু অংশ চাষ করতেন, অবশিষ্ট জমির

কোথাও ঝোপঝাড়, কোথাও বাচড়া আবার কোথাও কোথাও বা জোল, ডোবা, গর্ত। এই অঞ্চলে শিমুল গাছের সংখ্যা অধিক ছিল বলেই যাঁরা প্রথম গ্রাম পত্তন করেন তাঁরা নামকরণ করেন শিমুলতলা।

যশোহর রোড থেকে শিমুলতলায় বর্তমানে প্রবেশ পথ পাঁচটি। কিন্তু গ্রাম পত্তনের সময় মাত্র দুটি পথ ছিল মতিগঞ্জ কালিয়ানী এবং মতিগঞ্জ খেদাপাড়া। সঙ্কীর্ণ ভাগাড়, দু'ধারে ঝোপঝাড়। কদাচিৎ দু'একখানা গরুর গাড়ী চলত। হাটবারে দু'একজন লোক দেখা যেত ঐ পথে। পথের ধারেও কোন জন বসতি ছিলনা।

১৯২৪ খৃঃ ছয়ঘরিয়ার চট্টোপাধ্যায় বংশের ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়-এর প্রচেষ্টায় খলিতপুর, জয়ন্তীপুর, সুখপুকুর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামের কিছু নিম্ন-মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবার ম্যালেরিয়ার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য বনরাজ্য ছেড়ে ফাঁকা বাচড়া জমিতে বসবাস আরম্ভ করেন। ক্রমশ নানা বর্ণের হিন্দু এসে বসতি বিস্তার করতে থাকেন। এখন নদীর ধার ঘেঁসে বোটের পুলের মুখ থেকে যে পথটি আছে, যাতায়াতের ফলে ঐটিই পথ বলে গণ্য হতে থাকে। প্রবেশ পথে এখন যেখানে ক্লাবঘর, খেলার মাঠ ও গৃহস্থের আবাস ঐখানে ছিল নানাবিধ ফলের বাগান। আমগাছের সংখ্যাই অধিক ছিল। এই বাগানের চারিধার কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা ছিল। মালিক ছিলেন গাঁড়া-পোতার মাখনলাল নন্দী। হস্তান্তরিত হয়ে মালিক হন ঘাটপাতিলার আলিকদর মিঞা। বাংলা বিভাগের পর উদ্বাস্তুরা এসে জবরদখল করে। এখন কয়েকটা নারিকেল গাছ অতীত বাগানের স্বাক্ষর। এই আমবাগান-কে ডান হাতে রেখে শিমুলতলায় নূতন প্রবেশ পথ হল। পথের বাঁ-ধারে এগারটা বিশাল বিশাল তেঁতুল গাছ ছিল। যাদের শাখা প্রশাখায় আচ্ছন্ন এই পথ দিনেরবেলায়ও অন্ধকার হয়ে থাকত। বর্ষার জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যেত নদীর ধারের এই পথ। যে দু নম্বর পথটি এখন দেখা যাচ্ছে ওখানে উভয় দিকে খড়ের আট চালার মাঝ দিয়ে কোন রকমে বর্ষায় যাতায়াত করা চলত মজা পুকুরের পাড় দিয়ে।

দিন যায়, ধীরে ধীরে মানুষের বসতি বাড়তে লাগল আর সমস্যাও সৃষ্টি হতে থাকল। প্রথমেই দেখা দিল যাতায়াতের পথের সমস্যা। অধিবাসী যারা তাঁরা সকলেই নিম্ন মধ্যবিত্ত, দিন আনেন দিন খান। কিছু বুদ্ধিজীবী আর কিছু পুঁজিহীন ব্যবসায়ী। তখন ইংরাজ রাজত্ব। স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার বলতে ইউনিয়ন বোর্ড। সুতরাং জনবসতির প্রয়োজন মেটানোর প্রশ্নই ওঠে না। রাস্তাঘাট নেই এ সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব তখন পল্লী

বাসিদেরই বহন করতে হবে, তাছাড়া উপায় কি ?

১৯২৬ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হল পল্লী হিতকারী সমিতি। এই সমিতির সভ্যবৃন্দ নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে ১৯৩২ খ্রীঃ প্রথম সচেষ্ট হন যে গলি পথটি বর্ষায় ব্যবহার করা হত সেটি প্রশস্ত করার, গাড়ি ঘোড়া যাতায়াতের মত করে তোলার। কিন্তু প্রথমেই বাধার সৃষ্টি হল উভয় পার্শ্বের জমির মালিক কোন-প্রকারেই জমি ছাড়তে রাজী নন। শেষ পর্যন্ত উচ্চমূল্য দামের প্রস্তাবে তাঁরা রাজী হলেন। মূল্য ধার্য হল চারিশত টাকা। তখনকার দিনে চারিশত টাকা যোগাড় করা সহজসাধ্য ছিল না। সমিতির সভ্যদের সঙ্গতি কিছুই ছিলনা। একশত টাকা চাঁদা উঠল অতি কষ্টে। বাকী টাকা সমিতির অন্যতম সদস্য বামন দাস চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর নব নির্মিত ইমারৎ বন্ধক দিয়ে দিলেন। পথের জন্য জমি মিলল। তার কয়েক বৎসর পরে দুর্গাপুজার বিজয়া দশমীর দিন ১৯৩৭ খ্রীঃ বামনদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় সহসা ইহলোক ত্যাগ করলেন। নাবালক দুই ভাই এবং তাঁর শিশু সন্তানেরা সে বাড়ি আর ফেরৎ নিতে পারলেন না। দেনার দায়ে ইমারৎ বিক্রী হয়ে গেল। নাবালক উত্তরাধিকারীদের শিক্ষা দীক্ষাও বন্ধ হয়ে গেল।

গলিপথ প্রশস্ত হলেও তার পরই মজাপুকুর। ১৯৩৩ সালে এই পুকুর ভরাটের দায়িত্ব নিলেন পল্লীর তরুণ ছাত্রেরা। তাঁরা তাঁদের পৈতৃক হিতকারী সমিতির নাম আধুনিক করে পল্লী উন্নয়ণ সমিতি রাখলেন। নিজেদের কায়িকশ্রম দিয়ে পুকুরের অর্ধাংশ ভরাট করলেন। শিমুলতলায় প্রবেশের সোজা পথ হল। এখন সেই গলি পথের দুধারে ইমারৎ আর দোকানপসার।

পল্লীহিতকারী সমিতির সদস্যেরা ১৯২৬ থেকে শিমুলতলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব আরম্ভ করেন। তখন বনগ্রাম মহকুমায় কোথাও সার্বজনীন পুজা হতনা। ফলে বনগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলের কেউ কেউ এবং পাশের গ্রাম ভবানীপুর কালিয়ানী গ্রামের অধিবাসীরা পরিপূর্ণভাবে সহযোগিতা করতেন। বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে খড়ের দুচালা ঠাকুরঘর হল। পূজার সময় সম্মুখের প্রাঙ্গণে পাল, সামিয়ানা খাটিয়ে আচ্ছাদন দেওয়া হত। সেই বিরাট যজ্ঞে বহু ভক্তের সমাগম হত। ভোগবিতরণের ব্যবস্থাও হত প্রচুর পরিমাণে। বর্ণ বা জাতির কোন গোঁড়ামির সেখানে স্থান ছিলনা। এই দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হত। রামায়ণ গান, মনসার ভাসান, কৃষ্ণযাত্রা ইত্যাদি। এ সকল অনুষ্ঠান যারা করতেন তার শিল্পী সকলেই শিমুলতলা ভবানীপুরের অধিবাসী। ভবানীপুরকে তখন শিমুলতলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হতনা। শিমুলতলার কিশোরদের প্রচেষ্টায় যেমন পল্লী

উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়ে পল্লীর পথ ঘাটের উন্নয়ন করতে থাকল; তেমনি তাদের সাংস্কৃতিক চেতনা বোধের স্বাক্ষর স্বরূপ তাঁরা মঞ্চস্থ করলেন প্রথম পৌরাণিক নাটক "প্রহ্লাদ চরিত্র" ১৯৩৩ খ্রীঃ শিমুলতলার ঐ সার্বজনীন পূজা প্রাঙ্গণে সরস্বতী পূজার সময়। এই অভিনয়ে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করেন বনগ্রামের বাণীনাট্য সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাদ্বয় সতীশচন্দ্র রায় এবং নিশাপতি চট্টোপাধ্যায়।

গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের অংশীদার হিসাবে শিমুলতলার জনগণ যেমন সার্বজনীন পূজার প্রচলন ক'রে প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলনের তাৎপর্য সর্বজনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন তেমনই কয়েকজন তরুণ এই সময় বনগ্রাম কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থেকে কর্মরত অবস্থায় কয়েকবার কারাবরণ করেন। তদানীন্তন যশোহরের পুলিশ সুপার মিঃ এলিসনের রোষবহ্নিতে পড়ে অশেষভাবে নির্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন এই পল্লীরই কয়েক জন তরুণ।

দিন এগিয়ে চলে, নূতন নূতন গৃহস্থ আসেন শিমুলতলায় বসবাস করতে। জমির মালিক ছয়ঘরিয়ার একাধিক জমিদার, রাণাঘাটের পালচৌধুরী এবং তাঁদের প্রজাবৃন্দ জয়পুরস্থ মুসলমান মধ্যস্বত্বভোগী। জন বসতি হয় এলো মেলো ভাবে। তাই প্রবল সমস্যা দেখা দিল এসব নূতন অধিবাসীদের পথের সমস্যা। সে সমস্যার সমাধান করে চলেছেন পল্লী উন্নয়ন সমিতির সদস্যাবৃন্দ তাঁদের কায়িক শ্রমদান করে। সহসা এই সমিতির এক নূতন সমস্যা দেখা দিল সদস্যদের অনেকেই উচ্চশিক্ষা লোভের উদ্দেশ্যে অথবা চাকুরি প্রাপ্তিতে পল্লীছেড়ে প্রবাসে থাকতে বাধ্য হলেন।

১৯৩৬ খৃঃ দেখাদিল ইছামতী নদীতে বন্যা। অনেকের ঘর বাড়ি ডুবল। পল্লীর কিছু সংখ্যক অধিবাসী সাময়িক ভাবে নিরাপদ আশ্রয়ে গেলেন। সার্বজনীন পূজারস্থান জলের তলায়। যাঁরা বন্যার সময় পল্লীতে ছিলেন তাঁরা অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থান বর্তমানে কালীমন্দিরের সামনে যে চাতালের অস্তিত্ব এখন ও আছে সেখানে পূজা করলেন। বন্যার জল সরে-গেল, কিন্তু পর বৎসর সার্বজনীন পুজার স্থানে আর ফিরে যাওয়া গেল না। সেস্থান হস্তান্তরিত। সেখানে গৃহস্থের বাড়ি উঠেছে। ফলে সার্বজনীন পূজা কালীবাড়ীর সামনের বারান্দায় পূজা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। দেখা দিল সেবারের পূজায় গৃহস্থের প্রভাব, সুতরাং পূজার উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে থাকল সংরক্ষণশীলতার সংস্কার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। পরপর তিনবৎসর নানা বাদ প্রতিবাদ অশান্তি চলতে থাকল পূজাকে কেন্দ্র করে। তিন

বৎসর এরূপ অশান্তিতে কাটার পর ফণী দাস মহাশয়ের বাড়ির বহিঃপ্রাঙ্গণে পূজার ব্যবস্থা করা হল। নিঃসন্তান ফণী দাস মহাশয় দুচালা খড়ের ঘর তুললেন এবং ঐ ঘরসহ তিনকাঠা স্থান সার্বজনীন পূজার জন্য দানপত্র লিখে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিন বৎসর ঐ স্থানে পূজা করা হল কিন্তু সহসা ফণী দাস মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করলেন। তার উত্তরাধিকার যারা হ'লেন তাঁরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে অস্বীকার করলেন। ফলে পুনরায় সেই কালী বাড়ির বারান্দায় পূজা আরম্ভ হল এবং পল্লীর অধিবাসীদের মধ্যে দু'দলের অস্তিত্ব দেখা দিল। বর্ণগত বিভেদ সামনে রেখে রাজনৈতিক দল গঠনে উভয়-পক্ষ সচেষ্ট হলেন। ফলে শিমুলতলায় পূর্বপাড়ায় আর এক সার্বজনীন পূজার সৃষ্টি হল। সেখানে পূজার জন্য পাকাঘরও তৈরী হয়ে গেল। রক্ষাকালী পূজা যেখানে হয়ে আসছে গ্রাম পত্তনের পর থেকে তারই পাশে জমির নয়া মালিক যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য শিমুলতলায় এসেছিলেন, তিনি ঘর নির্মাণ করেছিলেন সর্বসাধারণের জন্য, কিন্তু লিখিত ব্যবস্থা কিছু হলনা। কয়েক বছর এই ভাবে চলার পর মালিক স্বয়ং সে ঘর প্রাথমিক বিদ্যালয় আরম্ভ করার জন্য সাময়িকভাবে উন্নয়ন সমিতি ও বিদ্যালয়ের তদানীন্তন পরিচালন সমিতিকে দিলেন। সার্বজনীন পূজাও সেখানে দু'বছর হল। তখন বিদ্যালয় বন্ধ থাকে। কিন্তু দেখা গেল উপর মহলে যোগাযোগ করে মালিক বিদ্যালয় গৃহরূপে ঐ গৃহের ভাড়া সরকারের কাছ থেকে আদায়ের ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। এই ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হওয়ার পর পরিচালক সমিতি বিদ্যালয় স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করেন। ডাঃ শশীভূষণ সরকার মহাশয় বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের জন্য জমি দান কর-লেন এবং সেখানেই সরকারের ব্যয়ে গৃহ-নির্মাণ হল। এখনও সেখানেই বিদ্যালয় চলছে। পূর্বের বিদ্যালয় গৃহে মালিক ভাড়াটে বসালেন। সার্বজনীন পূজা সেখানে বন্ধ হয়ে গেল। কলিকাতার ধনাঢ্য ব্যক্তি পল্লীগ্রামে নেতৃত্বের সহজ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন এটাই তখন প্রকাশ পেল। ঐ পাকা ঘর ও তৎসংলগ্ন জমি সর্বসাধারণের এইভাবে প্রথম সেটেলমেণ্টে রেকর্ড হয়ে আছে।

এদিকে মূল সার্বজনীন পূজা যথারীতি কালীবাড়ির বারান্দায় এক বৎসর পুনরায় হওয়ার পর পূজার কর্তৃপক্ষ বুঝলেন গৃহস্থের মতের প্রাধান্য দিয়ে সার্বজনীন উদ্দেশ্য খর্ব হয়। সে কারণে পূজা কমিটি পল্লী উন্নয়ন সমিতির সভ্যেরা বর্তমানে যেখানে পূজা হয়ে থাকে সেখানে মালিক জ্যোতিশচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের অনুমতি না নিয়েই সেখানে পূজা আরম্ভ করলেন। পরে পল্লী উন্নয়ন সমিতির সভ্যেরা কলিকাতায়

তাঁর গৃহে গিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে পাকাপাকিভাবে বারোয়ারী স্থান বলে ঘোষণা করলেন। জ্যোতীশ রায়চৌধুরী মহাশয় নিজে এসে পাঁচ কাঠা বারোয়ারী স্থান হিসাবে দান করে অবশিষ্ট জমি বিক্রয় করে দেন। এখন ঐ স্থানই বারোয়ারীতলা। সরস্বতী পূজা, কালীপূজা এবং চড়কপূজার মেলাও ঐ স্থানে হয়ে আসছে। সেটেলমেন্টের সময় বারোয়ারী স্থান বলে রেকর্ডও হয়েছে।

শিমূলতলা কালীবাড়ি সকলের পরিচিত। ১৯৩২ সালে কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিজ আবাসে প্রস্তরময় কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠার পিছনে কিছু অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা এবং সে কাহিনী সম্বলিত তারাচরণ মৈত্র প্রণীত কাব্যপুস্তক প্রকাশিত হলেও পারিবারিক বিগ্রহ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে গৃহস্থের তত্ত্বাবধানে ঐ বিগ্রহ নিত্য পূজিত হয়ে আসছেন। একটা ছাদযুক্ত কোঠা ঘরই মন্দির আখ্যা লাভ করেছে।

১৯৩৮ খ্রীঃ ইছামতীতে সর্বনাশা বন্যা দেখা দিল। পল্লীর প্রতিটি বাড়ি জলপ্লাবিত হল। বোটের পুলের পাশে যশোর রোডের উভয় পাশের একতলা বাড়ির ছাদ পর্যন্ত জলের তলায় গেল। এখন সে সকল বাড়ি দ্বিতল, ত্রিতল হয়েছে। জল সরে গেলে ক্রমশ পল্লীর লোকজন নিজ নিজ আবাসে ফিরে আসতে লাগলেন। পল্লী উন্নয়ন সমিতির তখন গ্রাম গঠনের সমস্যা দেখা দিল, কর্মীসংখ্যা খুব কমে গেল। সে সময় ঐ সমিতি সদস্য এক তরুণ শিক্ষকও নূতন করে সমিতিকে সংগঠিত করলেন। সদস্য সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পেল। সমিতির সদস্য যাঁরা তখন হলেন তাঁদের বেশীর ভাগই দিনে রুজির তাগিদে কর্মব্যস্ত থাকেন। ফলে সমিতির কাজ চলতে থাকল রাত্রে হ্যাজাগ লাইট জ্বেলে। নূতন নূতন রাস্তা বার করা, রাস্তায় মাটি ফেলা ইত্যাদি রাত্রেই করা হত। এই সমিতির ব্যয়ভার বহন করা হত সদস্যদের চাঁদা এবং পল্লীবাসিদের ঘর বাঁধা, বেড়া দেওয়া, পোতা গাঁথা ইত্যাদিতে সুলভ কায়িক শ্রম দিয়ে মজুরী নিয়ে। সে কাজও রাত্রে করা হত। সমিতির তখন কোন ঘর ছিল না। ঐ তরুণ শিক্ষক যিনি তখন সমিতির পরিচালক, তাঁর বাড়িতেই পল্লী উন্নয়ন সমিতির কার্যালয় ছিল। ঝুড়ি, কোদাল, বেলচা ইত্যাদি ঐ বাড়িতেই থাকত। রবিবার সারা দিনই কাজের দিন। পল্লী উন্নয়ন সমিতির সদস্য তখন কেউ দোকানের কর্মচারী কেউ বাজারের সব্জিবিক্রেতা, কেউ হাটে কাপড়ের ব্যবসায়ী, কেউবা সূত্রধরের কাজ করতেন এই সকল নিম্নবিত্তের যুবসম্প্রদায় এবং

কিছু ছাত্র।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল। বাংলার সেই দুর্দিনে এই পল্লীর অধিবাসীরা নানা সমস্যায় ভুগতে লাগলেন। মাত্র চার ঘর মুসলমান ছাড়া এই পল্লীর সকল অধিবাসীই হিন্দু। আর মুসলমান যাঁরা তাঁরা হিন্দুদের সঙ্গে মিলেমিশেই ছিলেন এত কাল। নামও তাঁদের কৃষ্ণপদ, বিষ্ণুপদ, সুশীল ইত্যাদি। মুসলিমলীগের কর্মিদের দৃষ্টি পড়ল তাঁদের উপর। তাঁদের নাম পরিবর্তন হয়ে গেল। কৃষ্ণপদ হল কামাল, ক্ষুদিরাম হল খোদাবকস, শুধু তাই নয়, তারা লীগের বড় বড় নেতা বনে গেল। বহিরাগত লীগ কর্মিদের ঘাটি হল তাদের গৃহ। তারা নানাভাবে সাম্প্রদায়িক উসকানি দিতে লাগল। কংগ্রেস কর্মী পল্লী উন্নয়ন সমিতির পরিচালক তরুণ শিক্ষক। তাঁর প্রাণনাশের জন্যও উঠে পড়ে লাগল তারা। একদিন তাঁর গৃহের সম্মুখে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টাও হয়। দূর প্রবাসে পালিয়ে যেতে তিনি বাধ্য হন। ১৯৪৭ খ্রীঃ স্বাধীনতা লাভের পূর্বে গুজব উঠল বনগ্রাম পাকিস্থানে হবে। দুষ্কৃতকারী মুসলিমলীগের কর্মিরা শিমুলতলার বাড়ি, নারী দখল করার হুমকি দিত পথে পথে। কিন্তু জয়পুর, মতিগঞ্জ, হরিদাসপুর গ্রামের মুসলিম নেতৃবৃন্দের উদারতা ও সহযোগিতায় শিমুলতলার হিন্দু অধিবাসীরা আত্মরক্ষা করে চললেন।

দেশ স্বাধীন হল, পল্লীর অনেক নাবালক সাবালক হয়েছেন। ইতিমধ্যে পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে তাঁরা যোগদান করায় সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি হল। এবং পরিচালনার দায়িত্বও নবাগত তরুণ সদস্যেরা গ্রহণ করলেন। সমিতির নামের পূর্বে "পল্লী" শব্দ লুপ্ত হয়ে শুধু উন্নয়ন সমিতি নামকরণ করা হল। কিন্তু সমিতির সদস্যদের মধ্যে রাজনৈতিক মত পার্থক্য নিয়ে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব চলতে থাকল, শেষ পর্যন্ত প্রগতিপন্থীদের জয় হল। যাঁরা কংগ্রেস সমর্থক তাঁরা সমিতি ত্যাগ করে চলে গেলেন। সমিতির প্রাচীন সদস্যরা প্রগতিপন্থীদের দলেই থেকে গেলেন। আবার সমিতি সাংগঠনিক কাজে হাত লাগাল। সাংস্কৃতিক বিভাগে পর পর নাটক মঞ্চস্থ করতে থাকলেন। পাঠাগার প্রতিষ্ঠা হল। প্রাথমিক বিদ্যালয় ডাঃ শশীভূষণ সরকার প্রদত্ত জমিতে সরকারের ব্যয়ে নির্মিত গৃহে স্থানান্তরিত হল। উন্নয়ন সমিতির সভ্যেরা পল্লীবাসীদের হৃদয় গভীরে স্থান পেলেন। ১৯৫২ সালে নির্বাচনে অজিত গাঙ্গুলী প্যারলে মুক্তি লাভ করে উন্নয়ন সমিতির ঘরে এসে উঠলেন। কংগ্রেসের জীবনরতন ধরের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল। জীবনবাবু মাত্র তেরটি ভোট শিমুলতলা থেকে সংগ্রহ

করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শিমুলতলাকে লোকে মস্কো নামে চিহ্নিত করেন।

ক্রমশ শিমুলতলার অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল এমনভাবে যে নিচু জায়গা যেখানে বর্ষায় জল জমে সে সকল স্থানেও লোক ঘর বাঁধল। জল নিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। বর্ষায় বৃষ্টির জলে এখন প্রতি বৎসর অনেকের বাড়িই ডুবে যায়। শিমুলতলার এক অংশে দেশ বিভাগের পর বহু খৃষ্টান এসে বসতি স্থাপন করেছেন। তাঁদের একটি গীর্জাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৎসরের খ্রীষ্টীয় উৎসব অনুষ্ঠানগুলি সেই পল্লীতে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে হয়ে থাকে।

আবার সমিতির দুদিন দেখা দিল। রাজনৈতিক মতপার্থক্য দেখা দিল উন্নয়ন সমিতির সদস্যদের মধ্যে। সমিতির দখল নিয়ে দু'দলে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলল। শেষ পর্যন্ত সমিতির সদস্যেরা সি,পি,আই (এম) এবং সি,পি,আই এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ সংগঠনে তৎপর হলেন। উন্নয়ন সমিতি অতলে তলিয়ে গেল।

শিমুলতলার জমির মূল্য বৃদ্ধির মূলে পল্লী উন্নয়ন সমিতি। নূতন নূতন রাস্তা বার করার ফলে অনেক সঙ্গতিশালী গৃহস্থ পথের ধারে ইমারত তুললেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে পথের দু'ধারের নয়নজুলিও তাঁরা প্রাচীর দিয়ে ঘিরে নিলেন। পূর্বে ছিল গুণের আদর, তখন দেখা দিল ধনের কদর। লোকে সেই অর্থকুলীনদের মুখের জোরেই তাঁদের নেতা বানাতে লাগল। রাস্তাও সঙ্কীর্ণ হতে থাকল। দ্বিধাবিভক্ত সমিতির সভ্যেরা সেক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চললেন।

ইতিমধ্যে প্রগতিপন্থীদের বিরোধী দল খাড়া হয়েছে। সেটা রাজনৈতিক ভাবে। তাঁরা প্রগতি পন্থীদের বিরুদ্ধে দল গঠন করতে পল্লীর কিছু তরুণকে অপসংস্কৃতির আকর্ষণে জোটবদ্ধ করে অসামাজিক এবং অশ্লীল নাটক মঞ্চস্থ করার মদৎ যোগাতে লাগলেন। পল্লী উন্নয়ন সমিতির সংগঠক ও অন্যতম সদস্য একজন শিক্ষক প্রবল বাধা দিতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত অভিনয়ের দিন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তিনি সেই অভিনয় আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ করতে সক্ষম হন। সমাগত দর্শকেরা তাঁর কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করে স্থান ত্যাগ করেন। তার পর থেকে দীর্ঘকাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল।

আজ পল্লী হতশ্রী, দোতলা—তিনতলা বাড়ি হয়েছে, পথে বিজলি-বাতির পোষ্ট, তাতে লোডশেডিং না থাকলেও গড়ে সপ্তাহে দুদিন তিনদিন আলো জ্বলে। অনেক গৃহস্থ দেওয়াল টিপে আলো জ্বালছেন। কল কারখানায়

শব্দও শোনা যায়। কিন্তু হায়! সে সখ্যতা, সে একাত্মবোধ, সে পল্লী-প্রীতি কর্পূরের মত কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে। পথ দুর্গম, ঘাট অদৃশ্য সংস্কৃতি বিস্মৃতির অতল তলে। খেলার মাঠ তাকে পূর্বে যা ছিল, তা এখন কৃষিক্ষেত্র। শিমুলতলার প্রবেশমুখে যে মাঠ তাকে ঠিক মাঠ বলা চলেনা। তবুও তরুণেরা কোন প্রকারে দুধের তেষ্টা ঘোলে মিটাচ্ছে। এখন কেউ যেন কাউকে চিনছে না। পাঠাগার, সমবায় সমিতি কোথায় ছিল সে সংবাদও আর কেউ বলতে পারেন না।

বার্ষিক দুর্গোৎসব এখন হয় তিনটি। যে সার্বজনীন দুর্গোৎসব সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সেটি এখন নিয়মরক্ষা করে তরুণের দল। পরবৎসর আর তাদের দেখা যায় না। অন্য তরুণেরদল সেই স্থানে অনুষ্ঠান করে অনভিজ্ঞতার বোঝা মাথায় নিয়ে। সে বিপুল আয়োজন, সে প্রাণমাতানো উচ্ছ্বাস আর নেই। আছে শুধু শব্দযন্ত্রের বিকট চিৎকার। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপচে পড়া ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে আজও টিকে আছে বোধ হয় কয়েকজন অভাবক্লিষ্ট শিক্ষকের চাকুরির তাগিদে। অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তান পাঠান বিদ্যালয়ে পড়তে; কিন্তু বিদ্যালযের সঙ্গে তাঁরা কোন যোগা-যোগ রাখেন না। এখন প্রশ্ন সকলেই কি অন্নচিন্তায় সময় কাটান? এখন অন্তঃসলিলা রাজনীতি সেখানে লড়াই চালাচ্ছে। বিকল্প বিদ্যালয় সৃষ্টি হয়েছে, অনুমোদন না থাকলেও কর্তৃত্ব করার মোহে গাঁটের কড়ি অনেক অভিভা-বকের যাচ্ছে। কাজের জন্য কাজ নয় নামের জন্য কাজ, সুতরাং কাজ যেটি সেটি আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রেখে। তাই সে কাজ হয়ে উঠেছে আত্মকেন্দ্রিক। যে পল্লীর তরুণেরা ও যুবকেরা নিজ পল্লীর উন্নয়নের জন্য রক্ত জল করে স্বেচ্ছা শ্রমদান করেছে, সর্বস্বান্ত হয়েছে, পল্লী উন্নয়ন করতে গিয়ে আসামী হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে। সেই পল্লীর তরুণেরা পথে পথে ঘোরে, বৃথা আড্ডা দেয়। আবার কেউবা আত্মগোপন করে থাকে প্রাণের দায়ে, কুসঙ্গের খেসারৎ দেওয়ার ভয়ে। এই পল্লীই একদিন অনেক গঠনমূলক কাজে, প্রগতির ক্ষেত্রে সমগ্র মহকুমার নেতৃত্ব দেওয়ার সামর্থ অর্জ্জন করেছিল; আর আজ তারা কোথায়! কোন পঙ্কিল আবর্তে পাক খাচ্ছে। আজ পল্লী বিভিন্ন পাড়ায় ভাগ হয়েছে, কিন্তু উন্নয়নের প্রচেষ্টার ছিটে ফোঁটাও কারও অন্তরে নেই। যাঁরা এখন বৃদ্ধ হয়েছেন তাঁরা অতীতের কথা চিন্তা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। যাঁরা আজ সম্পন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের সে প্রতিষ্ঠার পিছনে অন্ধকার ছিল; সুতরাং সাধা-রণ—মানুষের মনে দোলা লাগে সে সব প্রতিষ্ঠাবানের নেতৃত্বে চালিত হতে।

বর্তমান সরকার শাসনক্ষমতায় আসার পর শিমুলতলাপল্লীর পথের কিয়দংশ সংস্কার হয়েছে। পল্লীর শিশুদের সংগঠিত করে তাদের নিয়মিত ব্যায়াম, ব্রতচারী খেলাধূলা ইত্যাদি করানোর চেষ্টা করছেন কিছু প্রগতিশীল যুবক। এটা পল্লীর অনেকের মনে আশার সঞ্চার করেছে।

একটা দিক থেকে শিমুলতলা কিছুটা ভাল পরিচয় ধরে রাখতে পেরেছে। সেটি সাহিত্য ক্ষেত্রে। এই পল্লী থেকে কয়েকখানি পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে আসছে। কয়েকজন কবি ও লেখকের একাধিক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। বনগ্রাম সাহিত্য ভাণ্ডারে এই সকল কবি ও সাহিত্যিকদের অবদান কম নয়। এই পল্লীর অনেক সন্তান কৃতী এবং উচ্চ সরকারী পদে নিযুক্ত আছেন। অনেক কৃতী সন্তান প্রবাসে আছেন। ঋষি বঙ্কিমের উক্তিতে 'যাহারা কাষ্ঠ আহরণ করিতে আসিয়াছে তাহারা কাষ্ঠ আহরণ করিবে' সে রকম কাষ্ঠ আহরণকারী এখনও দু' একজন আছেন এই পল্লীতে। তাঁরা কাজের জন্য কাজ করতে চান; কিন্তু রাজনৈতিক বাধা তাঁদের সকল প্রচেষ্টায় বাধার সৃষ্টি করে। তারা রাজনৈতিক ঈর্ষার শিকার হন। অবশ্য এ রোগ প্রায় সব অঞ্চলেই এখন দেখা যায়। যাকে বলে "গ্রাম্য কোন্দোল।' দরিদ্র নিম্ন মধ্যবিত্তের সংখ্যাই শিমুলতলায় অধিক। সেকারণে অনেক গৃহস্থের সন্তান শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়না। দারিদ্র্যের দায়ে শৈশবেই নানা ভাবে উপার্জনের ধান্ধায় বার হতে বাধ্য হচ্ছে। তারা শেষ পর্যন্ত সমাজ বিরোধীদের শিকার হচ্ছে। সেটা এখন আর কারও বিস্ময় সৃষ্টি করেনা। সুযোগসন্ধানীরা নির্যাতিত দেশকর্মী সেজে সরকারী ভাতাও আদায় করছেন। অবশ্য এটা সারা ভারতের ক্ষেত্রেই প্রসারিত; আর এটা সৃষ্টি করা সমস্যা। তাঁরা কর্মিতকর্মা ব্যক্তি ও ভোটার। সুতরাং গণতন্ত্র রক্ষা করতে এসকল নির্যাতিত দেশকর্মী প্রয়োজন আছে।

বনগ্রামের জনসমাজ

বনগ্রাম কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এখানকার লোকবসতি ঘন ছিলনা। ম্যালেরিয়া ও মহামারীতে অধিকাংশ গ্রামের লোকসংখ্যা কমে যায় এবং জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে। হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান জনসংখ্যা কিছু অধিক ছিল এবং তাদের মধ্যে কৃষিজীবীর সংখ্যাই অধিক। কৃষিজীবীদের অনেকেরই নিজস্ব জমিজমা ছিল। আবার কেউ কেউ "ওট বন্দী" জমি চাষ করতেন। বিঘা প্রতি দু'তিন টাকা খাজনা দিতে হত। তখন লোকাভাবে অধিকাংশ জমিই অনাবাদী পড়ে থাকত। অনেকের আবার লাঙ্গল গরুর সংস্থান না থাকায় চাষের জমি সুলভ হলেও চাষ করার ক্ষমতা ছিল না।

এ ছাড়া গ্রামের লোকেরা অনেকে বিভিন্ন বৃত্তিতে জীবিকা অর্জন করতেন। যেমন: ১] নীল গাজনকারী কারিকর ২] লাক্ষাজীবী, ৩] স্থপতি, ৪] করাতী ৫] শকট নির্মাণকারী মিস্ত্রী ৬] নৌকা গঠনকারী মিস্ত্রী ৭] টিন শিল্পী ৮] জহুরী ৯] ঝুড়িচুবড়ি, চাঁচ নির্মাণকারী মিস্ত্রী, ১০] মালী বা মালাকার ১১] শাঁখারী ১২] ঝালাইকর ১৫] ছাতা নির্মাণকারী কারিকর ১৪] চিনি প্রস্তুতকারী ১৫] ছুতার মিস্ত্রী ১৬] চিত্রকর ১৭] পটুয়া ১৮] পালকী প্রস্তুতকারী মিস্ত্রী ১৯] কলাইকারী কারিকর ২০] ঘটিকা প্রস্তুতকারী কারিকর ২১] চাবুক বা ছড়ি প্রস্তুতকারী কারিকর ২২] হুঁকা ও হুঁকার নলিচা প্রস্তুতকারী কারিকর ২৩] শাল ও বনাত মেরামত ও পরিষ্কার কারক ২৪] দর্জি, ২৫] থলি প্রস্তুত

কারক ২৬] কম্বল প্রস্তুতকারী কারিকর ২৭] মাংস ব্যবসায়ী ২৮] ঘরামি ২৯] কূপখনক ৩০] স্বর্ণকার ৩১] পাখা প্রস্তুতকারী ৩২] গিল্টি কারক ৩৩] গালিচা প্রস্তুতকারী কারিকর ৩৪] চর্ম্মকার ৩৫] খেলনা প্রস্তুতকারী কারিকর ৩৬] জাল প্রস্তুতকারী ৩৭] রেশম পরিষ্কারক ৩৮] ময়রা ৩৯] কর্ম্মকার ৪০] কুম্ভকার ৪১] বেতের দ্রব্য প্রস্তুতকারী কারিকর ৪২] তন্তুবায় ইত্যাদি। সমান্য কিছু লোক বুদ্ধি জীবী ছিলেন ।

বনগ্রামের গ্রাম ও শহরের অভিজাত হিন্দু—মুসলমান মহিলারা পর্দানসীনা ছিলেন। কোন নারী একাকিনী পথে চলাফেরা করতেন না। স্থানান্তরে যাওয়ার সময় অভিজাত মুসলমান নারীরা বোরখা পরিধান করতেন। হিন্দু মহিলারাও ঘোড়ার গাড়ির কপাট বন্ধ করে যাতায়াত করতেন। মুসলমান মহিলারা গরুর গাড়ির সওয়ারী হলেও গাড়ির ছৈ এর সামনে ও পিছনে পর্দা টাঙাতেন। নারী শিক্ষার ব্যবস্থা বনগ্রামে ছিলনা বললে চলে। বিংশ শতকের দু'এর দশকের শেষের দিকে বনগ্রামে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সেটি এখন কুমুদিনী বালিকা বিদ্যালয়। গ্রামের পাঠশালায় কেউ কেউ কন্যা পাঠাতেন শিক্ষার জন্য। যাঁদের ইচ্ছা ও সামর্থ দুই ছিল তাঁরা বাড়িতে মেয়েদের শিক্ষা দিতেন। তখন কেবলমাত্র মহিলারাই প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পেতেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এখন নারী শিক্ষার শুধু প্রসার ঘটেছে তা নয়, তাঁরা বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্তা হচ্ছেন। স্বাধীনভাবে চলাফেরা হাট বাজার করা কোন ক্ষেত্রেই নারীদের সামাজিক বিঘ্ন ঘটছে না। নারীদের জুতা ও ছাতি ব্যবহারের রীতি ছিলনা। বর্তমানে জুতা ও ছাতি প্রয়োজনবোধে সকল মহিলাই ব্যবহার করেন এবং তা নানা রঙের নানা ঢং এর।

পূর্বে বনগ্রামে গ্রাম্য সমাজব্যবস্থায় বর্ণ বৈষম্য ছিল; কিন্তু বর্ণ বিদ্বেষ ছিল না। এমনকি হিন্দু মুসলমানের মধ্যেও কোন বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায় না। গ্রামীন উৎসব পূজাপার্বণ ইত্যাদি, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সামাজিক কাজে সকল বর্ণের লোকই একে অপরকে আহ্বান করতেন। তাতে খাওয়া দাওয়ার বিধিনিষেধ থাকলেও নিমন্ত্রন রক্ষায় আপত্তি ছিলনা। মুসলমানদের সামাজিক অনুষ্ঠানে হিন্দুরাও আহূত হতেন। খাদ্যগ্রহণ না করলেও উৎসবে যোগদানে বাধা ছিলনা। কিন্তু সমাজে নবশাক বহির্ভূত যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের যাঁরা তাঁদের ব্যবহার

আচার আচরণ উদার ছিল না। এছাড়া উচ্চবর্ণের যারা-তাঁরা নিম্নবর্ণের বাড়ি নিজেরা রন্ধন করে খেতেন অথবা ফলার বা লুচি মিষ্টান্ন গ্রহণ করতে আপত্তি করতেন না। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও বর্ণবৈষম্য ছিল। যাঁরা ব্রাহ্মণ ও নবশাক বহির্ভূত শ্রেণীর বাড়ি যাজকতা করতেন বা শ্রাদ্ধাদি কর্মে দান গ্রহণ করতেন তাঁরা ব্রাহ্মণদের মধ্যে অন্ত্যজ বলে গণ্য হতেন। তাঁদের পতিত ব্রাহ্মণ বলা হত। তাঁদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনও নিষিদ্ধ ছিল। যাঁরা পতিত হতেন তাঁরাও নিজেদের মনে করতেন একটি আলাদা গোষ্ঠীভুক্ত ব্রাহ্মণ, কিন্তু অন্য বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার ছিলেন। তবে এটা ঠিকই যে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই এই বর্ণ বৈষম্যের গোঁড়ামি কেবল মাত্র রান্না ঘরকে কেন্দ্র করেই বেশী ছিল বিধবা ব্রাহ্মণ মহিলাদের একবেলা নিরামিষ খেতে হত। নির্জলা একাদশী করতে হত। মুসলমান হিন্দুদের ছোঁয়া জল খেতেন না। হিন্দুরাও তদনুরূপ আচরণ করতেন। তবে যাঁরা সর্বহারা এবং যাঁরা ধনী তাঁদের জাত-ধর্ম কোন কালে ছিল বা আছে একথা বলা কঠিন। ধনী বা সকল রীতিনীতির উর্ধে আর সর্বহারাদের সামাজিক রীতিনীতি নাগালের বাহরে।

বনগ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর সকল বর্ণের সমাজই বিরাট এলাকা জুড়ে ছিল। তার সীমারেখা মহেশপুর (অধুনা বাংলাদেশ) গরীবপুব, খাঁটুরা এ ছাড়া ভুলোট, বাগআঁচড়া, সোনাবেড়ে; শঙ্করপুর, কোটা, মদনপুর ইত্যাদি গ্রাম (এখন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত) পযন্ত প্রসারিত ছিল। সামাজিক ক্রিয়া ধর্মে প্রসারিত এলাকা নিয়ে নিমন্ত্রণ করার সামর্থ অনেকেরই ছিলনা। মুষ্টিমেয় দুই এক জনের ছিল বা হত তাঁরা সমাজপতির নিকট তাঁদের বাসনা জ্ঞাপন করতেন। সমাজপতি এই বিরাট সমাজের নিমন্ত্রণের দায়িত্ব নিতেন এবং তাঁর অধীনে কয়েকজন গ্রামভিত্তিক উপসমাজপতি থাকতেন তাঁরা সমাজপতির নিকট থেকে সংবাদ পেলে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে স্বজাতি সকলকে নিমন্ত্রণ করতেন। এক বর্ণের সমাজে অন্যবর্ণের লোকেদেরও নিমন্ত্রণ হত, তবে সেটা গৃহস্থের সুবিধামত। যাঁরা গৃহস্থের সঙ্গে বাধ্যবাধকতায় জড়িত বা প্রতিবেশী তাঁরাই নিমন্ত্রিত হতেন। গৃহস্থ নিজেই সে নিমন্ত্রণ করতেন। সমাজস্থ দূরস্থ সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তির যাতায়াতের ব্যয় গৃহস্থকেই বহন করতে হত। তখন অবশ্য নৌকা আর গরুর গাড়ি ছাড়া অন্য কোন যানবাহন ছিল না। যাঁরা ছাতি মাথায় দিয়ে আসতেন তাঁদের ছাতি রাখার জন্য গৃহ-সংলগ্ন মাঠের ব্যবস্থাও থাকত কারণ তখন তালপাতার ছাতি মুড়ে রাখা যেত না। অবশ্য পরবর্তী কালে কলের ছাতির প্রচলন হওয়ার ফলে সে

সমস্যা আর ছিল না। এই সকল সামাজিক অনুষ্ঠানে যাঁরা অসামাজিক কাজের জন্য অপরাধী বলে অভিযুক্ত হতেন তাঁদের বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করা হত, ধোপা, নাপিত, হুঁকা বন্ধ হয়ে যেত। সেদিন থেকে তাঁদের এক পংক্তিতে বসে ভোজন করার অধিকার থাকত না। অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার পর তাঁরা অচ্ছুতের ন্যায় ব্যবহার পেতেন স্বজাতির কাছ থেকে। গোঁড়ামির ফলে বিচারের নামে হত বিচার প্রহসন। সত্য-মিথ্যার, ন্যায়-অন্যায় বিচার নিরপেক্ষ হত না—অভিযোগকারির প্রভাব প্রতিপত্তির উপর বিচারের রায় নির্ভর করত। সুতরাং গরীব এবং দুর্বল পীড়নাই হত।

পূর্বে সমাজে ধনীর প্রভাব থাকলেও জ্ঞানী-গুণীরাই সম্মান লাভ করতেন। উচ্চবর্ণ সম্ভূত ব্যক্তি মাত্রেই নিম্নবর্ণের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ভক্তি পেতেন। গরীব দুঃখী তখন যথেষ্টই ছিল, কিন্তু তখন এখনকারের মত কাউকে পথে বাস করতে হত না। নিজের আশ্রয় না থাকলেও আশ্রয় মিলিত। শহর অঞ্চলে ভাড়া বাড়ি পাওয়া যেত। ভাড়াও সামান্য ছিল। গ্রামাঞ্চলে ভাড়াবাড়ি কল্পনা করা যেত না।

ক্রিয়া কর্ম্মে এখনকার মত 'ডেকরেটার্সের' প্রয়োজন হত না আর সে ব্যবসা কারও ছিল না। পল্লীর গৃহস্থদের বাড়ি থেকে প্রয়োজনীয় তেজসপত্র মিলত। সামিয়ানা, নৌকার পাল, অভাবে নারিকেল পাতার আচ্ছাদন দিয়ে বড় বড় সামাজিক ক্রিয়া কর্ম্ম চলত। রান্না করার জন্য 'ঠাকুর' নামধেয় উৎকলবাসীর প্রয়োজন হতনা। গৃহবধূরা অথবা পুরুষেরাই রন্ধন করতেন। গৃহ বধুরা উপবাস থেকে রন্ধন করতেন। ব্রাহ্মণ-ভোজন হওয়ার পর জলগ্রহণ করতেন। ব্রাহ্মণ-ভোজনের পর ব্রাহ্মণেতর জাতির ভোজন চলত। তারপর মহিলাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা গোময় অনুলিপ্ত পরিচ্ছন্ন গৃহপ্রাঙ্গণে চলত। এখনকার মত টেবিল চেয়ার শহর বা গ্রাম সর্বত্রই অজ্ঞাত ছিল। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলেই টেবিল চেয়ার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ভোজবাড়ির সর্বপ্রকার কাজকর্ম প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন আনন্দের সঙ্গে করতেন এবং তাঁরা এতে গর্ববোধ করতেন। হিন্দুরাই মুর্গী পালন ও তার মাংস ভক্ষণ বা জবাই করা ছাগ মাংস ভক্ষণ করতেন না। এখন রুচি অনুযায়ী সকলে সবকিছু খেতে পারেন। শূকর মুরগী পালনে ও কোন বাধা নেই। এরসঙ্গে এখন জাতীয় অর্থনীতি জড়িত।

বনগ্রামের লোকেরা পূর্বে চা পান করতেন না। ১৯২৮/৩০ খ্রীঃ থেকে 'টিবোর্ড' কর্তৃক প্রচার উদ্দেশ্যে হাটে হাটে চা প্রস্তুত করে খাওয়ানো হত। সুদূর গ্রামাঞ্চলেও চা এখন প্রায় সকলেরই অবশ্য পালনীয়।

পূর্বে যেসকল পরিবারের যোগাযোগ ছিল কলিকাতার সঙ্গে তাঁদের কেউ-কেউ চা পান করতেন।

বনগ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল খুব, প্রতি বর্ষে শীতের প্রারম্ভ থেকে কলেরায় বহু লোক মারা যেতেন এখন এদুটি রোগ নেই বললে অত্যুক্তি হবেনা। নলকূপের ব্যবহার প্রচলন হওয়ার পর থেকে বনগ্রামের প্রায় সকলেরই আমশায় ও অম্ল এই দুইটি রোগ দেখা যাচ্ছে। পূর্বে লোকে কূপ, ইন্দারা অথবা নদী বাঁওড়ের বা পুকুরের জল পান করতেন।

পূর্বে হিন্দুদের কন্যার বিবাহ ছাড়া আর সকল অনুষ্ঠানের ভোজই দিনের বেলায় হত। দ্রব্য সামগ্রী যথেষ্ট সুলভ থাকলেও অনেকের ক্রয়-ক্ষমতা ছিলনা। এখন ক্রিয়া কর্মে লৌকিকতা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহুমূল্য উপঢৌকনের উপর মান-সম্মান এবং আত্মীয়তা অন্তরঙ্গতা নির্ভর করে। তখন বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ষোল আনা লৌকিকতা করলেই মান-সম্মান বজায় থাকত, আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বে ভাঁটা পড়ত না। উৎসবে জাঁকজমক তখনও ছিল এখনও আছে। কিন্তু এখনকার জাঁকজমকে জৌলুষের ঘটাটাই বেশী, আর তার উপকরণ ও সুপ্রতুল অবশ্যই অর্থের বিনিময়ে। পূর্বে উৎসবে ঢাক, ঢোল, কাঁশি, সানাই ইত্যাদি বাজত এখন মাইক না বাজালে উৎসব জমেনা। বনগ্রামে বিবাহ উৎসবে প্রথমে মাইক বাজে—১৯৪৬ খ্রীঃ শিমুলতলায়। তৎপূর্বে সভাসমিতিতে মাইক ব্যবহার করা হত ১৯৩১ খ্রীঃ থেকে। সুখপুখুরিয়ার বঙ্কুরাম দত্তের পুত্র অধুনা কামারপাড়া নিবাসী শৈলেন দত্ত প্রথম লাউডস্পীকার সৌজন্যমূলক ভাবে সভাসমিতিতে দিতেন। পরে ভাড়ায় খাটাতেন। রেডিও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চারুচন্দ্র দত্ত প্রথম বনগ্রামে আনেন ১৯২৮ খ্রীঃ।

পূর্বে বনগ্রামে সঙ্গতিশালী গৃহস্থ সংখ্যায় সীমিত ছিলেন। তখন অর্থ কৌলীন্যের গুরুত্ব দেওয়া হতনা। সহজ সরল জীবন যাপনেই সকলে অভ্যস্ত ছিলেন। সঙ্গতিশালী গৃহস্থের সন্তানেরা পোষাক আষাকে স্বাতন্ত্র রক্ষা করে চলার চেষ্টা করতেননা। অন্তত চালচলনে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান বেশী ছিল না। এখন বিভিন্ন রঙ্ ও চঙ্ এর পোষাক পরিচ্ছদ সুপ্রতুল হলেও মহার্ঘ, কিন্তু তার ব্যবহারের প্রতিযোগিতায় ধনী দরিদ্র সকলকেই দেখা যাচ্ছে। অস্বচ্ছল গৃহস্থেরা এই প্রগতির চাপে ভুগছেন। এখন ভদ্রতা জ্ঞানে গুণে বিদ্যায় সীমাবদ্ধ নয়, ভদ্রতা, বাহিরের আবরণের উপরও নির্ভরশীল। ব্যবহৃত বিদেশের পোষাক এখন বনগ্রামের যত্র তত্র বিক্রয় হচ্ছে। এবং তার মূল্য ও নূতন অপেক্ষা

কম। সুতরাং পোষাকী ভদ্রতা রক্ষার জন্য অনেকেই এখন ঐ পোষাক কিনে ধনীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছেন। অর্থ আজ অনর্থের মূল-স্বীকৃত নয়, অর্থ এখন প্রতিষ্ঠালাভের একমাত্র সোপান। বনগ্রাম ভারতের একটি সীমান্ত অঞ্চল সুতরাং সুযোগ সন্ধানীরা সে সুযোগের সাহায্য নিয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এবং এই হট্টমেলা সমাজের হাটে প্রতিভাবান সৎবংশ সম্ভূত বলে গণ্য হওয়ার সকল সুযোগ নিতে সচেষ্ট। সততা রক্ষা করতে কিংবা শান্ত জীবন যাপন করতে যাঁরা ইচ্ছা করেন তাঁরাই এখন সমাজে নির্বোধ ও নিম্নস্তরের জীব বলে চিহ্নিত। আর এই মহার্ঘ বাজারে অভাবের তাড়নায় শান্তিকে নির্বাসনে পাঠিয়ে সামাজিক উপেক্ষায় হতবাক্।

আজ বনগ্রামে সমাজব্যবস্থায় পূর্বের বর্ণ বৈষম্য দেখা যাচ্ছে না। সঙ্গতিশালী অন্ত্যজ গৃহেও উচ্চবর্ণের কন্যা সহজ মনেই ঘরণী হচ্ছেন, আবার উচ্চবর্ণের গৃহে অন্ত্যজ কন্যাও সাদরে গ্রহণ করা হচ্ছে। অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই অর্থ কৌলীন্য কাম্য। বঙ্গ বিভাগের পর পূর্ব পুরুষের পদবী কেউ কেউ পরিবর্তন করেছেন। বনগ্রামের অধিবাসী যাঁরা পূর্বে ছিলেন তাঁদেরও কেউ কেউ পদবী পরিবর্তন করেছেন। এখন কোর্টে এফিডেভিট করে নাম, পদবী ইত্যাদি পরিবর্তন করা সহজসাধ্য। অনেকে এখন মুখার্জী, ব্যানার্জী, চ্যাটার্জী, মৈত্র, বাগচী, মিত্র, বসু ইত্যাদি পদবী গ্রহণ করছেন। এখন ভোজবাড়ীতে ভোজ্য পরিবেশনে ব্রাহ্মণ সন্তান অপরিহার্য নয়। যে কোন বর্ণের সন্তানই ভোজ্য বস্তু পরিবেশন করতে পারেন। সে কারণে বলা যায় বনগ্রামের অধিবাসীরা পূর্বের সমাজ ব্যবস্থা দূরে ঠেলতে পেরেছেন। সংস্কারমুক্তির প্রবাহ সামাজিক ভাবে ক্রমশ গতিময়। এখন 'জাতবিচার' 'পাতপাড়া' জাতি-বর্ণগত নয়, অর্থগত।

যে দেশে সমাজ ব্যবস্থা বর্ণবৈষম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে দেশ সে আদর্শ যেন পরিত্যাগ করতে পারে না; তাই আজ নূতন নূতন বর্ণবৈষম্য এবং বর্ণ বিদ্বেষ দেখা দিয়েছে। প্রথমে হল গাত্রবর্ণ যা পাশ্চাত্য দেশে এতকাল চলে আসছে। সাদা কাল রূপে। এখানে সেটা অভাগা দুস্থ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা মাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে পিতামাতার গৌর বর্ণের সুশ্রী কন্যা, তাঁদের প্রজাপতির হাটে কন্যা বিকোতে অসবর্ণে আপত্য না থাকলে মাথায় সাপ বেঁধে ছুটোছুটি করতে হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর শিক্ষিতা কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা আপনা-থেকে হয়ে যাচ্ছে। বিবাহক্ষেত্রে শ্যাম বর্ণের অনাদর উত্তরোত্তর

বাড়ছে। পণ প্রথার বিরুদ্ধে সরকার কঠোর হচ্ছেন কিন্তু আঁটুনি বজ্র হলেও গেরো ফস্‌কা। এখন প্রজাপতির হাটে উচ্চ পণ ছাড়াও নানা উপঢৌকন দেওয়া নেওয়ার রেওয়াজ হয়েছে এবং তার দাবির মাত্রাও ক্রমশ বাড়ছে গতিশীল বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্বীকৃতি দিতে। পূর্বে উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা বরপণ দিতেন। অন্য বর্ণের কন্যা-পণ দিতে হত। অনেক দরিদ্রের পুত্র সন্তানের বিবাহ হত না। পণ দিয়ে কন্যা কিনতে পারতেন না বলে। এখন সকল বর্ণের হিন্দুকেই বরপণ দিতে হচ্ছে। পূর্বে পণ দেওয়া নেওয়া রেওয়াজ ছিল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সর্বসমক্ষে বিবাহ আসরে। এখন তার পূর্বে গোপনে পণ দেওয়া নেওয়া হয়। সুতরাং পণ প্রথা বিলোপের বাণী "নিভৃতে কাঁদে।"

দ্বিতীয় বর্ণ বৈষম্য আরও মারাত্মক। গণতান্ত্রিক দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকাটাই কাম্য। কিন্তু সেই বিভিন্ন মতাদর্শে বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হযেছে এতে একে অপরেব অস্পৃশ্য। সামাজিক নিমন্ত্রণ এখন ধীরে ধীরে অস্তে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে দখল করছে দলীয় নিমন্ত্রণ। ভাই ভাইকে পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করেন না যদি ভাই অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হন। করলেও ভাই অনেক ক্ষেত্রে যোগ দেন না এক বাড়িতে বাস করলে একে অপরের ক্ষেত্রে নির্লিপ্ত থাকেন।

বনগ্রামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছিল না। স্বাধীনতালাভের কিছু পূর্বে মুসলিম লীগের আমল থেকে বাইরের কিছু লীগকর্মী এসে এখানে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করতে থাকেন। তাঁরা মুসলমান সমাজে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করতে থাকেন, তার ফলে কিছুটা উত্তাপ সৃষ্টি হয়; কিন্তু তা ব্যাপক আকারে হতে পারেনি স্থানীয় মুসলমান ও হিন্দু-নেতৃস্থানীয় কয়েকজনের মিলিত প্রচেষ্টায়। বর্তমানে রাজনীতি আর অর্থ কৌলীন্য ক্রমশঃ এমন পর্যায়ে সমাজকে নিয়ে যাচ্ছে যে সাধারণ মানুষের সহজ সরল জীবন যাপন স্বপ্নরাজ্যের বিষয় বলে মনে হচ্ছে। পূর্বে গ্রামে শহরে বর্ণভিত্তিক পল্লী ছিল, সুতরাং মানুষ একরকম নিশ্চিন্তে সুখ দুঃখের শরিক হয়ে জীবন কাটাত। বিপদে কেউ না দেখলেও স্ববর্ণের লোকের কাছে আশ্রয় পেতেন। কিন্তু এখন অর্থ কৌলীন্যে মানুষের মধ্যে দুটি শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে ধনী ও দরিদ্র। আর তার ব্যবধান গগনচুম্বী। এখন দরিদ্ররা আর ধনী স্বজাতির আশ্রয় পাচ্ছে না। সুতরাং দরিদ্র হলে তাঁদের দেখার কেউ নেই ফলে তাঁদের সর্বহারার নীতি ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

তৃতীয় বর্ণ বৈষম্য রাজনৈতিক মত ও আদর্শের। এখানে কোন আপোষ

মীমাংসা নেই বাম-ডান, বাম-ডান করতে করতে সমাজ এগোচ্ছে না পিছিয়ে পড়ছে তা নির্ণয় করা কঠিন। সকল সময় বিদ্বেষ আর প্রতিযোগিতা। সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত ব্যক্তিরা রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রয়ে পুষ্ট হয়ে সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে। অবশ্য এটা শুধু বনগ্রামের সমস্যা নয় এ গোটা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতেও প্রসারিত। দরিদ্র যাঁরা তাঁরা কিছুটা আত্মসচেতন হয়েছেন বলা চলে। নিজেদের সংগঠনের মাধ্যমে দাবী আদায় করার চেষ্টাও তাঁরা করে থাকেন। আবার দারিদ্রের সীমা যখন চরম সেখানে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে হতাশায় জীবন যাপন করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

পল্লীর মানুষের জীবন যাপনের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁরা পেয়েছেন শহরের নৈকট্য যোগাযোগের সুবিধার মাধ্যমে। অনেক গ্রামে এসেছে এখন বিজলিবাতি। বেতারযন্ত্র এখন অনেক দরিদ্রের কুটিরেও স্থান পেয়েছে। নগর জীবনের যে আবিলতা গ্রাম থেকে দূরে ছিল আজ তাও অনুপ্রবেশ করছে দ্রুত।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে অনেক গ্রামেই শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কোন কোন গ্রাম ঐ সৌভাগ্যের ছিটেফোঁটা ভোগ করলেও, তা প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত। এখন অধিকাংশ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা ছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশ গ্রামাঞ্চলে বাড়ছে। তবুও গ্রামের সকল ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনেক ছেলেমেয়ে দারিদ্র্যের দায়ে গ্রামের কোন প্রতিবেশীর বাড়িতে শৈশবেই নানা কাজে নিযুক্ত হচ্ছে। অপরদিকে বনগ্রাম শহর ও তার গঞ্জ এবং গ্রামের পথে পথে যে দৃশ্য দেখা যায় তা অতীব বেদনাদায়ক ও ভয়াবহ বলে মনে হয়। পাঁচ সাত বছরের শিশুরাও পেটের দায়ে কাঠিভাজা, বাদাম ভাজা বিক্রি করে বেড়ায়। একটু বড় হলেই বিক্রি করে আইসক্যাণ্ডি, বিড়ি ইত্যাদি তারপর অধিক উপার্জনের লোভে সীমান্তে কারবার চালায় তারপর পাকা সমাজবিরোধী। প্লাটফর্মে, পথে-প্রান্তরে যারা জন্মাচ্ছে, তারা মার কোলে উঠে ভিক্ষায় বার হচ্ছে। ক্রমে শৈশবটা কাটে ভিক্ষাবৃত্তিতে। তারপর সীমান্তের সুযোগে ছোটে—তারাও ছিন্নমূল সমাজবিরোধী হয়ে ওঠে। বনগ্রামের সমাজব্যবস্থায় এখন এই দুষ্কৃত কিভাবে বিপর্যস্ত করছে তার বিবরণ তুলে ধরা সম্ভব নয়। যাঁরা নিত্য দেখে দেখে চোখ অভ্যস্ত করেছেন তাঁরা সম্পূর্ণ অবহিত আছেন।

বনগ্রামের পথঘাট এখন সর্বসময়ই বিপদসঙ্কুল। রুজির তাগিদে

দোকান পসারে দুইএর তৃতীয়াংশ পথ অবরুদ্ধ করে রেখেছেন রোজগার পিয়াসীরা। অবশিষ্ট অংশ যানবাহনে পথচারীর মরণফাঁদ পাতা। সুষ্ঠু নাগরিক জীবনের স্বাদ যে কি, তা বনগ্রামের অধিবাসী স্বাধীনতা লাভের পর আর পাননি। বনগ্রামের পৌর সভার প্রতিষ্ঠা হয়েছে স্বাধীনতার পর। সীমান্ত শহর আর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি এযাবৎকাল সর্বসময় সন্ত্রস্ত হয়ে এসেছে। বাংলাদেশের উৎপত্তির পূর্ব থেকে বনগ্রামে অধিবাসী সয়েছে অগণিত ছিন্নমূল মানুষের চাপ। তারপর বাংলাদেশের উৎপত্তি ও স্বাধীনতা লাভ আর বনগ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় ভীতিজনক অবস্থা একই সঙ্গে ঘটেছে। বে আইনী অস্ত্রসস্ত্র আর মদ বিক্রয়-এর আড্ডা যত্রতত্র এবং তা প্রকাশ্যে বললেও অত্যুক্তি হবে না। মদ্যপের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে।

শতশত শিশু কিশোর শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে সমাজের দুষ্কৃতে রূপান্তরিত হচ্ছে। বয়স্কদের শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা হয়েছে। অবশ্য সেটা ভাল হলেও তাঁদের চরিত্রের পরিবর্তন কতখানি হবে অক্ষরজ্ঞানের সঙ্গে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। এইসব অবহেলিত শিশু ও কিশোরদের শিক্ষার ব্যবস্থা দীর্ঘকাল ধরেই হচ্ছে না। এটা আমাদের জাতীয় ব্যর্থতা ও গ্লানি একথা বলাটা কি খুব অন্যায়! ভবিষ্যতের আশা ভরসা যারা, তারা অবহেলায় বয়স্ক হয়ে বিদ্যালয়ে যাবে শিক্ষালাভ করতে, এ ব্যবস্থা সমাজকে কতখানি উন্নত করবে সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। সুখের বিষয়, ভারতের বর্তমান সরকার শিশুদের মঙ্গলের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। মানুষের অর্থ নৈতিক উন্নতি ছাড়া কোন পরিকল্পনার সার্থক রূপ পাওয়া সম্ভব কি করে হয়।

বনগ্রামে বেকার সংখ্যা ভয়াবহ। শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা যে অনেকে বিপথে গিয়েছে এবং যাচ্ছেন এটা এখন কারও অজ্ঞাত নয়। দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যা জরজর অধিবাসী এখন নীরব ও উদাসীন। তাঁরা পরিবর্তন চান; কিন্তু সেটা যে কিভাবে আসবে তা তাঁদের বোধগম্য নয়। দীর্ঘকাল নানা যন্ত্রনা ভোগ করে এখন দিন গত পাপক্ষয় এই ভাবেই তাঁরা তাঁদের জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। অপসংস্কৃতির স্বাক্ষর—সর্বত্র ছড়ান। আর তার উৎসাহ স্বাধীনতালাভের পর থেকেই যারা পেয়ে আসছে তাদের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটান সহজসাধ্য নয়। বনগ্রামের খেলাধূলা পূর্বে উল্লেখযোগ্য ছিল এখন তা অস্তাচলে। প্রতিভাবান খেলোয়াড় আর বনগ্রামে সৃষ্টি হচ্ছে না। শরীর চর্চায় বনগ্রামের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। জন সংখ্যার দিক থেকে তা এখন নিতান্ত নগণ্য বলা চলে। সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠান যা হত তারও উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল। শহর ও গ্রামে যাত্রা থিয়েটারের ক্লাব ছিল। এখন তার পরিবর্তে হলে ফাংসন অথবা বিচিত্রানুষ্ঠান, তাও বহিরাগত শিল্পীরা অর্থের বিনিময়ে করে থাকেন। যাত্রার ব্যবস্থা যা হয় তাও সবই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কলিকাতার নামী-অনামী যাত্রা পার্টির দ্বারা। সভ্যতার অগ্রগতির অর্থ সাধারণ মানুষের অনুধাবন করার পক্ষে দুঃসাধ্য। শব্দযন্ত্রের বহুল ব্যবহার বর্তমানে একপ্রকার সামাজিক পীড়ন রূপে দেখা দিয়েছে।

ব্যতিক্রম সর্বক্ষেত্রেই আছে। যেটা ব্যাপক সেটাই অধিক পীড়াদায়ক। এর মধ্যেও অনেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিদগ্ধ ব্যক্তি ও তরুণ অবিরাম সচেষ্ট সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে এবং অপসংস্কৃতি দূর করতে। তাঁরা তাঁদের সুষ্ঠু চিন্তাধারার পরিচয় দিয়ে চলেছেন সঙ্গীতে, কবিতায় এবং সাহিত্যে। অনেক নাগরিক সমালোচনা করেন ঠিক, কিন্তু বিভিন্ন বর্ণবৈষম্যের চাপে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার অভাব দেখা দেয়। গণতন্ত্রের গণপতি শুঁড় নাড়ে কিন্তু বৃকোদর ফেঁসে যাওয়ার ফলে নির্বাক। তাই গণতন্ত্রের পবিত্রতা রক্ষার দায়ে এখন অনেকেই ছটফট করছেন। আবার কারো বা নাভিশ্বাস উঠেছে। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর স্বাধীনতা ভোগ করে এমন অনেক শিক্ষিত পরিবার আছেন যে কেবল মাত্র সনাতনী উচ্চবর্ণের দায়ে হয় আদর্শ রক্ষার জন্য ধ্বংসের পথের শেষ প্রান্তে এসে পৌছেছেন না হয় লাগাম হীন শিক্ষিত সন্তানদের খুশীমত কাজ করতে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। সেই সমাজবিরোধী তরুণদের ফিরিয়ে আনার জন্য কোন সংরক্ষণের শতকরা হারের হাত প্রসারিত হবে সমাজকে এই অপমৃত্যুর থেকে রক্ষা করতে?[১০]

সীমান্তের অর্থ কৌলীন্য যতই বাড়ছে ততই বনগ্রামের অধিবাসী ধর্মপ্রাণ হচ্ছেন এই কথাই বলতে হচ্ছে। ধর্মবেত্তার ভীড় জমছে বনগ্রামের মাটিতে। অমুক বাবা, অমুক স্বামিজী, অমুক ধার্মিক তমুক পাঠক ইত্যাদির সমাবেশ ঘটছে হামেশাই। তার উপর আছে মার্কিনী বৈরাগীদের সাধন ভজন। বিভিন্ন দেবদেবীর সার্বজনীন পূজার আয়োজনেরও সংখ্যা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। সকল ক্ষেত্রেই অর্থের প্রয়োজন, যাঁরা ভাগ্যবান তাঁদেরই ত' ভগবান। ভাগ্যহারা দীনদুঃখীদের কাছে ভগবান যাবেন কি করে। সেখানে গেলে ত' উপবাস। হতাশা ও জীবনযন্ত্রনা থেকে সাময়িক দূরে থাকার জন্য সেইসব ভাগ্যবানদের সাধন ভজনের অংশীদার হওয়ার জন্য ভীড় জমাচ্ছেন। দীন দুঃখীরা আবার ভাগ্যবানদের ভক্তির তারিফও করছেন। মধ্য-যুগীয় ইউরোপের সঙ্গেই এর তুলনা চলে। যাঁরা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন

তাঁদের সবাই অর্থে কুলীন। তাঁদের দ্বারা ভক্তিরস বিতরিত হচ্ছে বা হয়েছে এটাই ত চিরাচরিত নিয়ম, আর এটাই তাঁদের অমরত্ব লাভের একমাত্র পথ। ভারতের আদর্শও তাই। মন্দির, মসজিদ সমাধি এসব প্রতিষ্ঠাতার অমরত্ব এনেছে ; সুতরাং আজ যাঁরা অর্থ কৌলীন্যে অঘোষিত সম্রাট তাঁরা আধ্যাত্মিক হয়ে পড়ছেন এইভাবে। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পর পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে উন্নয়ন কার্য যেভাবে হয়েছে বনগ্রামে তার শত অংশের এক অংশও হয়নি। তবে তদানীন্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী জীবনরতন ধর মহাশয়ের প্রচেষ্টায় একটি বৃহদায়তনের হাসপাতাল হয়েছিল, যাকে এখন যমের দরবার বলে লোকে উপহাস করে।

দেশ সকলের। সুতরাং সকলের স্বার্থ সমানভাবে জড়িত। সকলের শুভবুদ্ধি ও প্রচেষ্টার দ্বারাই চালিত হওয়া প্রয়োজন। সরকার অবশ্য সচেষ্ট, কারণ যুবকল্যাণ দফতর তার প্রমাণ। কিন্তু কল্যাণকামির ক্ষেত্রে বৈষম্য আশঙ্কার কারণ কিনা সেটা ভাবার অবকাশ আছে। শিক্ষা ব্যবস্থার যে দোষ ত্রুটি আছে তা যদি ত্রিশ বৎসর শুধু পরীক্ষা নীরিক্ষা করেই কাটে তাহলে সেই সুযোগে যারা অপসংস্কৃতির শিকার হচ্ছে তার পরিমাণও ত কম নয়। সে কারণে ফুটো কলসিতে জল ভরাই হচ্ছে। বাক্‌সর্বস্ব নীতি নির্ধারণ করা ছাড়া সমাজে এর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।

বনগ্রামে স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন বা নির্যাতন ভোগ করেছিলেন তাঁদের অনেকে এখন গত, কয়েকজন এখনও জীবিত থাকলেও তাঁরা সরকারী ভাতা গ্রহণ করেন নি। কিছু সুযোগসন্ধানী লোক এই ভাতা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রকৃত দেশকর্মী যাঁরা বঙ্গ-বিভাগের পর এখানে এসেছেন তাঁরা অনেকেই সকলের পরিচিত। সুতরাং তাঁরা সরকারী ভাতা পাবেন এতে কোন কিছু বলার নেই। কিন্তু যাঁরা সুযোগসন্ধানী তাঁদের ব্যবস্থা কি? এটা এখন অনেকেরই প্রশ্ন। স্বাস্থ্য, সম্পদ, বয়স সবকিছু থাকা সত্ত্বেও এ সকল প্রতারক কিভাবে সমাজ, দেশ ও জাতিকে প্রতারণা করে সরকারকে ফাঁকি দিয়ে সমাজকে শোষণ করছে! এই আদর্শের প্রতিফলন কি ভবিষ্যৎ সমাজে পড়বে না! দস্যুতস্কর অপেক্ষাও এ সকল সমাজ বিরোধী আরও বেশী করে সমাজের ক্ষতি করছে। আর রাজনৈতিক মতপার্থক্যই এই সকল বিরোধীদের সুযোগ করে দিয়েছে। দলীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য নেতারা হয় নির্বিকার ছিলেন, না হয় সজ্ঞানে এ সকল দুষ্ট সুযোগ সন্ধানীদের সুযোগ করে দিতে সাহায্য করেছেন। সমাজকে বাঁচাতে গেলে এখন এরও প্রতিকার প্রয়োজন নচেৎ ভবিষ্যতে বনগ্রামের সমাজের ইতিহাসে এই মসী-চিহ্ন লুপ্ত হয়ে যাবে না বরং কলঙ্কিত করবে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভিন্ প্রদেশীয়র প্রভাব

স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারলাভের পর থেকেই (১৯০৪ খ্রীঃ) বনগ্রামে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হয়। তার অর্ধশতাব্দী পর বনগ্রামে পৌর প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা। ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন বনগ্রামের এলাকার আর বর্তমানে পৌর প্রতিষ্ঠানের এলাকার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য এখন নেই। তখন মতিগঞ্জে একটা স্বতন্ত্র ইউনিয়ন বোর্ড ছিল এবং তার নিজস্ব এলাকা ছিল। বর্তমান বনগ্রাম পৌরপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যেমন মতিগঞ্জ, জয়পুর, শিমুলতলা যুক্ত হয়েছে, সে রকম বনগ্রাম ইউনিয়ন বোর্ডভুক্ত অনেক অঞ্চল বনগ্রাম পৌর এলাকা থেকে বাদ পড়েছে। (১৯৪১ সালের আদমশুমারি অনুসারে হিসাব) বনগ্রাম এবং গাইঘাটা থানার লোক সংখ্যা ছিল ১, ৩৩, ১০৪। (বর্তমানে সেই আয়তনে ১৯৭১ সালের আদমশুমারি অনুসারে হিসাব)।

বনগ্রাম মহকুমার আয়তন ৮২৮'৩ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা—৪,৪৭,৬৬১ জন। জনসংখ্যার ৭০ ভাগ উদ্বাস্তু। কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ১,৫৯,১২৩ একর। ১৯৭১ খ্রীঃ আদমশুমারি ডিরেক্টরের রিপোর্ট অনুসারে মোট চাষীর সংখ্যা ৪৯,৫০২ জন ও ক্ষেত-মজুরের সংখ্যা ৩২,৯১৫ জন। চাষী অর্থাৎ যাঁরা জমির মালিক অথবা বর্গাচাষ করেন আর ক্ষেতমজুর অর্থে যাঁরা দৈনিক মজুরী হিসাবে কাজ করেন। মোট জন সংখ্যার তুলনায় চাষী ১১% ক্ষেতমজুর ৭% বেকার সংখ্যা ৩,৪০,২৯৯ জন অর্থাৎ বেকারের সংখ্যা জন সংখ্যার ৭০%।

বনগ্রাম পৌর এলাকায় ন্যূনাধিক ছাপ্পান্ন হাজার লোকের বাস। এসব অধিবাসীদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক অবাঙ্গালী। পূর্বে যে বনগ্রামে

অবাঙ্গালী বাস করতেন না তা নয, কিন্তু বর্তমানে অবাঙ্গালীর সংখ্যা ক্রম-বর্ধমান। আর তাঁদের বৃত্তিও এখন নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমিত নেই, বিভিন্ন দিকে প্রসারিত। বঙ্গ বিভাগেব পর বনগ্রামে যেমন পূর্ববঙ্গ থেকে বহুলোক এসেছেন তেমনি এসেছেন অবাঙ্গালী। তাঁদের সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাবে প্রযো জন নেই। তাঁদের জীবন্ ও জীবিকা সম্বন্ধে একটা সমীক্ষা তুলে ধবার প্রযাস পাচ্ছি। বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত লোক, যাঁরা আজ বনগ্রামের অধিবাসী তাঁদের মধ্যে ওডিয়াব আগমন সম্ভবত বনগ্রাম শহবের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে। তখন ওড়িযাদের উপজীবিকা ছিল সীমিত। যেমন: গৃহভৃত্য, রাঁধুনি, মালি এবং ভারি বা জল সরবরাহকারী। ক্রমশ বনগ্রাম ব্যবসায কেন্দ্ররূপে গডে উঠতে লাগল। সেই সঙ্গে ওডিযার সংখ্যা যেমন বাডতে লাগল, তাঁদের জীবিকার ক্ষেত্রও প্রসারিত হতে লাগল। বিভিন্ন আডত ও দোকানে ওডিযা মুটে অপরিহায হয়ে উঠল। এ ছাডা তাঁদের কেউ কেউ পান বিডিব দোকান দিলেন ও পান ফিরি করতে আরম্ভ করলেন। দু'একটা তেলেভাজা ও মিষ্টির দোকানও করলেন ওডিযারা। আবার ওডিযার হোটেলও হল শহরে। বঙ্গ বিভাগেব পূর্বে বনগ্রাম শহরে ওডিযা হোটেল ছিল তিনটি আর মিষ্টির দোকান ছিল দুইটি। এখন ওডিযার হোটেল থাকলেও মিষ্টির দোকান নেই। মিষ্টির দোকান এখন সংখ্যায় অনেক ও তা সবই বাঙ্গালীর। দুধ ছানার কারবারে ওডিযাদের তখন দেখা যেত, এখনও এ কারবার তাঁদের আছে। তাঁদের 'বাথানে' বলা হয। গরু পালন তাঁরা করেন না। গ্রামাঞ্চল থেকে দুধ এনে তার যোগান ও ছানা কেটে চালান দেন শহরে ও কলিকাতায। এরকম খটি বনগ্রাম মহকুমায তাঁদের অনেকগুলি আছে। এখন ওডিয়া পুরোহিতও দেখা যাচ্ছে। তাঁদের পৌরোহিত্য নিত্য গণেশ পূজায। প্রত্যহ দোকানে দোকানে বাসে বিক্রায় ভোর থেকে পূজা করে বেডান আর মালিকের ললাটে চন্দনের ফোঁটা দেন। এক এক জন পুরোহিতের এক এক পটি নির্দিষ্ট আছে। অবশ্য অন্য কোন পূজায় বাঙ্গালীরা এখনও ওডিযা পুরোহিত বরণ করেননি। ১৯৪৭ সালের পূর্বে ওডিয়ারা এখানে স্ত্রী-পুত্র পরিবারবর্গ নিয়ে বাস করতেন না। মুটিয়ারা পাটের মরসুমে অধিক সংখ্যায় আসতেন, মরসুম শেষ হলে দু'একজন করে থাকতেন বাকী সকলে দেশে চলে যেতেন। এখন দেখা দিয়েছে তাঁদের পরিবারবর্গ নিয়ে বাস করার ঝোঁক। যাঁরা রাঁধুনির কাজ করেন তাঁরা অবসর সময় বিড়ি বাঁধেন ও হাটে হাটে পান বিঁড়ি বিক্রয় করেন। তাঁরা সাধারণত ঠাকুর নামে কথিত হন। ক্রিয়াকর্মে ভোজের রান্নায় ওড়িয়া

ঠাকুর অপরিহার্য। স্টেশনের কুলির কাজও তাঁদেরই একচ্ছত্র অধিকারে।

বিহারী : ওড়িয়ার পরেই বিহারী, যাদের পশ্চিমা বলা হয়ে থাকে। তাঁদের আবির্ভাব বনগ্রাম শহর উৎপত্তির বহু পূর্ব থেকে। পূর্বে বাংলার জমিদাররা বাড়িতে পশ্চিমা দরোয়ান রাখতেন। তাঁদের কাছারিতেও পাইক বরকন্দাজ-এর কাজ এই পশ্চিমারাই করতেন। বিহার ও উত্তর প্রদেশ-এর যাঁরা তাঁরাই পশ্চিমা। এঁদের অনেকেই এখন বাঙ্গালী হয়ে গিয়েছেন। বর্তমান উপাধি তাঁদের অতীত পরিচয় জানিয়ে দেয়। যেমন পাঁড়ে (পাণ্ডে), প্রধান (প্রধানিয়া), মিশ্র (মিছির), উপাধ্যায়, দোবে, তেওয়ারী, চোবে ইত্যাদি। এঁদের অনেকে এখন রায়, রায়চৌধুরী ইত্যাদি উপাধিতেও ভূষিত হয়েছেন। এঁরা সকলেই ব্রাহ্মণ। বর্তমানে এদেশের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হচ্ছে। এখন তাঁরা পুরোপুরি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ।

বিহারীদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এসেছেন বনগ্রামের মাটিতে। বিহারীদের মধ্যে দু'এক জন গৃহভৃত্য থাকলেও বেশীর ভাগই বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত আছেন। দোকান ও আড়তে মোট বওয়া ছাড়া তেলেভাজা, চানাচুর, বাদাম ভাজা ইত্যাদি ফিরি করেন। আবার কারও কারও দোকানও আছে। মনোহারী ইত্যাদি, কাপড়, বাসন ইত্যাদি গ্রামে গ্রামে ফিরি করে বিক্রয় করেন। এ কাজে এখন বাঙ্গালী বালকেরা প্রতিযোগিতায় নেমেছে। বিহারীদের মুদীর দোকান ছিল কয়েকখানা, এখনও আছে। তবে সংখ্যা কম। পশ্চিমা মুদীর একজন দুর্গাপূজাও করেছেন কয়েকবার। এছাড়া বর্তমানে ঠেলাগাড়ির চালক প্রায় সবই পশ্চিমা হিন্দুর সংখ্যাই অধিক।

বিহারী মুসলমানরা পূর্বে ঘোড়ার গাড়ির মালিক ও কোচোয়ানের কাজে একচেটিয়া লিপ্ত ছিলেন। তখন ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়িই শহরের লোক পরিবহনে অপরিহার্য ছিল। এছাড়া কসাইবৃত্তি পুরোপুরি তাঁদের হাতেই ছিল। বঙ্গবিভাগের পর ঘোড়ার গাড়ির স্থান দখল করল রিক্সা। সেখানে মুসলমান বিহারীরা হটে গেলেন। হিন্দু বাঙ্গালীর প্রাধান্য ঘটলেও সে বৃত্তিতে কেউ কেউ এখনও টিকে আছেন কিন্তু ছ্যাকড়া গাড়ি শহর থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। বনগ্রাম পৌর এলাকার গরুর গাড়ির সংখ্যা ছিল সহস্রাধিক। তার মালিক ও চালক প্রায় সকলেই বাঙ্গালী মুসলমান। এখন সেই গরুর গাড়ির সংখ্যা দু'চার খানায় দাঁড়িয়েছে। মাঝে মাঝে শহরের পথে দেখা যায়। গরুর গাড়ির স্থান দখল করেছে ঠেলাগাড়ি যার চালক সবই বিহারী। আর ভ্যান রিক্সাগুলির চালক অধিকাংশই বাঙ্গালী

হিন্দু। বিহারী মুসলমানদের একচেটিয়া কারবার ছিল মাংস বিক্রয়ে। এখন তাদের সংখ্যা না কমলেও হিন্দু ঋষিদাসরা সে কারবারে সংখ্যা গরিষ্ঠ। বাঙ্গালী খৃষ্টানরাও ঐ ব্যবসায়ে লিপ্ত তবে তারা কাছিম ও শূকরের মাংস বিক্রয় করে থাকেন। তাঁদের বসতি বেশীর ভাগই শিমুলতলায়। চর্মকার বা জুতা তৈয়ারী ও মেরামতের কাজ যাঁরা করতেন তারা প্রায় সকলেই ছিলেন পশ্চিমা হিন্দু এবং তাদের বসতি মতিগঞ্জে কেন্দ্রীভূত ছিল। বর্তমানে তাঁরা থাকলেও সংখ্যায় কম, সে স্থান ও কাজ বাঙ্গালী ঋষিদাস সম্প্রদায় দখল করছেন দ্রুত। ছাতা মেরামতও বাঙ্গালী মুসলমানরা করতেন। এখন জুতা ও ছাতা বাঙ্গালী হিন্দুরা করছেন একই সঙ্গে। ধুনুরীর কাজে বাঙ্গালী মুসলমান কিছু থাকলেও এ কাজ একপ্রকার একচেটিয়া ছিল বিহারী মুসলমানদের। এখনও বিহারীদের দখলেই আছে। শীতের মরসুমে তাঁরা দলে দলে আসেন। কার্ত্তিক থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত থেকে তাঁদের অধিকাংশই দেশে চলে যান। দু একজন সারা বছরের জন্য থাকেন। এ ছাড়া বেশ কিছু সংখ্যক বিহারী মোটর পরিবহনের কাজে নিযুক্ত আছেন। ড্রাইভারের সংখ্যা তাদের কম। অন্যান্য কাজেই তাদের বেশী দেখা যায়। কিছু সংখ্যক বিহারী ছাতু, যাঁতাপেষা আটা, বড়ি, ভাজাডাল ইত্যাদি বিক্রয় করতেন এখন আটার কল হওয়ায় তারা বড়ি, ভাজাডাল বেচেন। সাহানি উপাধিধারী বিহারী তামাকের ব্যবসায় করতেন-এখনও করে থাকেন তারাও সঙ্গতিসম্পন্ন। অনেক বিহারী বিষয় সম্পত্তি করে স্থায়ীভাবেই বাস করছেন। অনেক বিহারী হিন্দু বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশে গেছেন। তাদের উপাধি সাউ, সিং, আহির ইত্যাদি। অনেক বিহারী বাঙ্গালীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করেছেন। বিহারীদের কিছু অংশ নিমের দাঁতন, ভাঙ্গা-চুরা তৈজসপত্র ইত্যাদি কলিকাতায় চালান দিয়ে থাকেন। এ ছাড়া রেলের ইঞ্জিন ঝাড়া কয়লাও কেউ কেউ বিক্রয় করতেন। এখন কয়লা বিক্রেতার সংখ্যা খুব কম ইলেকট্রিক ইঞ্জিন চালু হওয়ার পর থেকে।

পাঞ্জাবী : পাঞ্জাবীদের বনগ্রামে স্থায়ী বসবাস বঙ্গবিভাগের পর থেকে। তার পূর্বে বনগ্রামে পাঞ্জাবী দেখা যেত কলিকাতা-বনগ্রাম, বনগ্রাম-যশোহর-খুলনা লরী পরিবহন ক্ষেত্রে। যাতায়াতের পথে বনগ্রামে রেষ্টহাউসের মত পাঞ্জাবী হোটেল ছিল। এখন মোটর পরিবহন ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। বনগ্রাম থেকে কয়েকটি বাসরুট হয়েছে। এই সব বাস রুটে অনেক বাসের মালিক ও পরিবহন কর্মী পাঞ্জাবী। তাঁদের এখন সংখ্যা বেশ বেড়েছে এবং তারা পরিবারবর্গ নিয়ে বনগ্রামে বাস করছেন। পাঞ্জাবী হোটেল, চায়ের

দোকান, দরজির দোকানও হয়েছে বেশ কয়েকটি। পাঞ্জাবী কুসীদজীবীও দেখা যায় বনগ্রামে। মুসলমান কাবুলিরা ব্যবসায় গুটিয়ে নিয়েছেন স্বাধীনতা লাভের পর থেকে। বনগ্রামের অন্তর্গত ঠাকুরনগরে গুরুদ্বার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাঙ্গালী কিছু সংখ্যক শিখ ধর্মগ্রহণও করেছেন।

মাড়োয়ারী: বনগ্রামে মাড়োয়ারীর সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। পূর্বে মাড়োয়ারী সমাগম হত পাটের মরসুমে। মরসুম শেষ হলেই তাঁরা কারবার গুটিয়ে নিয়ে কলিকাতায় চলে যেতেন। এখন কৃষকদের মধ্যে অনেকেই রয়ে বসে পাট বেচতে আরম্ভ করেছেন। সে কারণে পাটের কারবার চলে সারা বছর ধরেই। মাড়োয়ারীদের অনেকেই স্থায়ীভাবে ঘর সংসার পেতেছেন বনগ্রামে। এখন মাড়োয়ারীদের কাপড়ের দোকানও হয়েছে দশ বারখানা এবং তা বেশ বড় আকারের। মাড়োয়ারীদের বেশীর ভাগ কাপড়ের দোকান মতিগঞ্জে। তাদের ছেলেমেয়েরা এখন এখানকার বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছেন। অনেকে ভূসম্পত্তিরও মালিক হয়েছেন। বঙ্গ বিভাগের পূর্বে বনগ্রামে মাড়োয়ারীর দোকান বলতে ছিল একটি মোনোহারী আর একটি মোজা গেঞ্জি ইত্যাদি বিক্রয়ের।

মাদ্রাজী: মাদ্রাজীর সংখ্যা বনগ্রামে সীমিত। তাঁরা কয়েকজন দরজির কাজ করেন। শীতের মরসুমে ইটের ভাটায় অনেক মাদ্রাজী আসেন কাজ করতে। তাদের নারী পুরুষ সকলেই শ্রমিক। ঘাড়ে বস্তা নিয়ে অনেক মাদ্রাজীদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় তারা পুরাণো কাগজ কুড়ান। নর্দমার পাঁক ও নদীর ঘাটের কাদা ধুয়ে সম্পদ আহরণ করতে দেখা যায় যাঁদের তারাও প্রধানত মাদ্রাজী ও তেলেগু দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাভাষী।

নেপালী: বঙ্গ বিভাগের পূর্বে বনগ্রামে দু একজন সঙ্গতিশালী গৃহস্থের বাড়ি নেপালী গৃহভৃত্য ছিলেন। বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়েও এক সময় কাঞ্ছা নামে একজন নেপালী দপ্তরী ছিলেন। নেপালী মাত্রেই বাহাদুর। বঙ্গ বিভাগের পর বনগ্রামে নেপালীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। তাদের অনেকে এখন স্থানীয় ব্যাংক এর কর্মী ও পাহারাদার। তাঁরা এখন ঘর সংসার পেতে বসবাস করেন।

সাঁওতাল: সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি আদিবাসীর আমদানি হয় নীলকর কুঠিয়ালদের সময়। তাঁরা এখন এই মহকুমার স্থায়ী বাসিন্দা। আবার শীতের মরসুমে সাঁওতালের আগমন ঘটে মাটি কাটার কাজে। ইটের ভাঁটায়, ঠিকাদারদের রাস্তার কাজে সাঁওতাল মজুর অপরিহার্য। বৎসরের অর্ধাংশ তাঁরা এখানে বাস করেন। নারী পুরুষ সকলেই শ্রমিক।

পার্শী ও ভাটিয়া: এঁদের আগমন হয় রবিশস্য ওঠার মুখে। সাময়িক-

ভাবে তারা বনগ্রামে আস্তানা গাড়েন। কলাই, ছোলা, মুসুর, সরিষা ইত্যাদি খরিদ করেন। মরসুম শেষ হলেই চলে যান।

কাবুলী: বঙ্গ বিভাগের পূর্বে বনগ্রামের অর্থনৈতিক জীবনে কাবুলীদের একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। শীতের মরসুমে শহর ও পল্লীর পথে পথে হিং, সালেমমিছরী, কম্বল, চাদর, কোট ইত্যাদি ফিরি করে বেড়াতেন কাবুলীরা। ধারে বিক্রয় করত চড়া সুদে। পরের বছর টাকা আদায় করতেন সুদসহ, নচেৎ শুধু সুদ নিয়েই চলে যেতেন। তারা নগদ টাকাও লগ্নি করতেন। মাসিক সুদ টাকায় একআনা থেকে দু আনা। কাবুলী হিং, কাপড় কিনে অনেক কৃষক পথে বসেছে। আর নগদ টাকায় কৃষক মধ্যবিত্ত সকলেই কাবুলীর দেনা শোধ করতে ভিটে ছাড়া হয়েছেন। বঙ্গ বিভাগের পর কাবুলীরা জাল গুটিয়ে নিয়েছে। সেইস্থান দখল করেছে পাঞ্জাবী, তবে সংখ্যা খুব কম। এখনও দু একজন কাবুলী বনগ্রামের পথে দেখা যায়। তাদের সে জৌলুস আর নেই। তাঁরা টাকা লগ্নি আর করেন না। আদায় করেন শেষ কানাকড়িও যাতে বনগ্রামের মাটিতে পড়ে না থাকে।

বেদে: বেদেরা যাযাবর জাতি। কোন রাজার নয়কো প্রজা দীন দুনিয়ার মালিক বিনে। পূর্বে বৎসরের সকল সময়ই গ্রামে গঞ্জে দেখা যেত বেদের। পল্লীর পথে হেঁকে চলত 'বাত ভালো, দাঁতের পোকা ভালো' বলে। নারী পুরুষ ঘাড়ে লাঠির মাথায় বাঁধা বোচকা। তাতে নানা গাছগাছড়ার শিকড়, পাতা, ফল আর পশুপক্ষীর হাড়। নানা রকম ঔষধ। এরা অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকদের শোষণ করত ভেল্কি দেখিয়ে। এখনও তা করে চলেছে। তারা শহর উপকণ্ঠে আস্তানা গাড়ত। তাদের পশুপাল ছিল। হোগলার চালা, তৈজসপত্র পশুর ঘাড়ে চাপিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়— আস্তানা গাড়ত। এখন তাদের পশুপাল নেই। বোধ হয় চারণক্ষেত্রের অভাব বলে। সুতরাং ঘর বাঁধার জিনিষ তাদের এখন থাকে না, তারা আশ্রয় নেয় বিভিন্ন হাটের হাটচালিতে।

যে সকল অবাঙ্গালীর পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করলাম তাদের কর্মকেন্দ্র কেবলমাত্র বনগ্রাম পৌর এলাকায় সীমাবদ্ধ নয়। বনগ্রাম মহকুমার যে সব গঞ্জ ও ব্যবসায় কেন্দ্র আছে সর্বত্রই তাঁরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। যেমন পাইকপাড়া, গাঁড়াপোতা, চাঁদা, হেলেঞ্চা, আষাঢ়ু, বাগদা, বাণেশ্বরপুর, সিন্ধ্রাণী, গোপালনগর, বেগে, চাঁদপাড়া, পাঁচপোতা ইত্যাদি জায়গার উল্লেখ করা যায়। অবাঙ্গালী অনেকে বঙ্গললনা বিবাহ করে ঘরকন্না করছেন। অনেকে বিবাহান্তে বাঙ্গালী স্ত্রী নিয়ে স্বদেশেও যাচ্ছেন।

আমাদের অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া চোখে এ সকল অবাঙ্গালী ধীরে ধীরে বনগ্রামে অনুপ্রবেশ করে বনগ্রামের অর্থনীতিকে অনেকক্ষেত্রে পরিচালনা করছে। পাটের ব্যবসায়ে এখানকার ব্যবসায়ীরা মাড়োয়ারীদের হাতের পুতুল। কৃষকেরা আড়তে পাট দেয়—নগদ টাকা মেলেনা সবক্ষেত্রে। কারণ দাদন দেনার দায় আছে। আড়ৎদাররা মাড়োয়ারীদের কাছে পাট বিক্রয় করেন অধিকাংশক্ষেত্রে বাকীতে। সেই টাকা আদায় করতে অনেক সময় কালঘাম ছোটে। হাজার হাজার টাকার লেনদেন এইভাবে হয়ে আসছে। পাট শিল্প যা কিছু সবই অবাঙ্গালীর। সেখানে বাঙ্গালীরা কাগজবাবু আর কলমবাবু। এছাড়া মিল মালিক থেকে ঝাড়ুদার পর্যন্ত সবই অবাঙ্গালী। সেখানে পাটের দাম কমে, শ্রমিকের আয় বাড়ে তিলে তিলে আর মালিকের মুনফা বাড়ে তালে তালে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বনগ্রামে চীনা কাঠ মিস্ত্রির কারবার ছিল। তারা আসবাবপত্র ভালই গড়ত। একারণে তাদের পসার ছিল। যুদ্ধের সময় থেকে আর তাদের দেখা যায় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছুদিন পর পযন্ত একটি মাত্র ইটের ভাটা ছিল ইছামতীর ধারে। তার মালিক ছিলেন গুজরাটি। বাড়ি ঘর সংসার সবই এখানে ছিল কয়েক পুরুষ ধরে। ১৯৫৩ সালের পর সব বিক্রী করে তাঁরা স্বদেশে চলে গেছেন। এখন মালিক বাঙ্গালী। এছাড়া বাংলা পাঁজা খোলা ছিল। বেশীর ভাগ মালিকই স্থানীয় মুসলমান। মতিগঞ্জ শিমুলতলা অঞ্চলে ছিল তাদের পাঁজা খোলা। এখন সেখানে রাণীগঞ্জের টালির কারখানা হয়েছে কয়েকটি।

ষ্টেশন অঞ্চলে রকমারী দেশের লোকের কাজ কারবার। কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসে ও রেলে বিভিন্ন রাজ্যের ও বিভিন্ন জাতির লোকই কাজের খাতিরে আসেন—যান। তার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। রেলবাজার বলে যে অঞ্চল খ্যাত, সেখানে অবাঙ্গালী অনেক আছেন। কাজের খাতিরে এসে বনগ্রামের মাটিকে আর ছেড়ে যেতে পারেন নি। তাঁদের বাড়িঘর আছে। স্থানীয় বিদ্যালয়ে তাদের সন্তানরা শিক্ষা লাভ করে। তারা আধা বাঙ্গালী বলা যায় এখন।

এছাড়া আছেন হরিজন সম্প্রদায়। তাঁদের কথিত ভাষা স্বতন্ত্র। বাংলায় কথাবার্তা যখন বলেন তখন একটু টান দেখা যায়। এদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। নিজস্ব বাড়ি ঘর আছে। স্টেশন ও হাসপাতাল অঞ্চলে তাঁদের বসতি।

খৌরকার :—পূর্বে গ্রামবাংলার ব্যবস্থামত গ্রামের লোক গ্রামের

ক্ষৌরকারদের দ্বারাই ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করতেন। এতে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানও জড়িত ছিল। তাছাড়া হাটবারে পথের পাশে ভাসমান সেতুর সন্নিকটে ক্ষৌরকারেরা বসতেন। তাদের মধ্যে দু'তিন জন বিহারীও ছিলেন। এখন সে ব্যবস্থা থাকলেও বনগ্রামে সেলুন হয়েছে বেশ কয়েকটি। নাগরিক জীবনে এখন সেলুন অপরিহার্য। প্রথম সেলুন প্রতিষ্ঠা করেন সতীশচন্দ্র পরামাণিক। ১৯৪০ সালে বনগ্রামে প্রথম সেলুনের প্রতিষ্ঠা হয়। বিহারীদের সেলুনও আছে এখন।

লনড্রী : ১৯৩৩ সালের পূর্বে বনগ্রামে লনড্রী ছিল না। মতিগঞ্জে প্রথম লনড্রী খোলেন একজন ছাটাই সরকারী কর্মী কালু দত্ত। দু'তিন বছর পরে বন্ধ হয়ে যায়। এখন বনগ্রামে লনড্রীর সংখ্যা চল্লিশ-বিয়াল্লিশ এবং তার সব কয়টির মালিকানা রজকদের হস্তগত। এছাড়া গরম জামাকাপড় কাচতেন যাঁরা তাদের শালকর বলা হত। রিপু ও কাচার কাজ করতেন তাঁরা। তাঁরা সকলেই শান্তিপুরের অধিবাসী। পশ্চিমা রজকও ছিলেন। তাঁদের সংখ্যা অধিক ছিল না। এখন আর তাঁদের দেখা যায় না।

মাল : বনগ্রাম মহকুমায় বেশ কিছু সংখ্যক মালের বাস ছিল। তিন শত ঘর মাল একমাত্র ঝাউডাঙ্গাতেই বাস করতেন। তাদের পেশা ছিল বানর নাচান, বায়োস্কোপ দেখান এবং বাজিকরের খেলা দেখান। কেউ একটা কেউ দুটো বানর দড়ি বেঁধে নিয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে গ্রামের পথে পথে ঘুরে পল্লীতে পল্লীতে খেলা দেখিয়ে বেড়াতেন। তাদের কর্মকেন্দ্রের এলাকা ছিল বিরাট অঞ্চল জুড়ে। ২৪ পরগণা, যশোহর, নদীয়া জেলার সর্বত্র হুগলী, মেদিনীপুর, বর্ধমান, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি স্থানের সর্বত্রই মালেদের কর্মক্ষেত্র ছিল। মাথায় বায়োস্কোপের বিরাট বাক্স নিয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে বেড়াতেন মালেরা। বিভিন্ন ছবি দেখা যেত ছিদ্র দিয়ে আর সেই সঙ্গে শোনা যেত বিচিত্র সুর করে বর্ণনা দিয়ে গান বায়োস্কোপওয়ালার মুখে। বাজিকর মালেরা নানারকম খেলা দেখাতেন ঢোলোক বাজনার তালে তালে। অনেক দুঃসাহসিক খেলাও তাঁরা দেখাতেন। এখন ঝাউডাঙ্গায় মালেদের বসতি আর নেই।

এ সকল অবাঙ্গালী বনগ্রামবাসীদের দৈনন্দিন জীবনধারায় এমনভাবে মিশে আছেন যে তাঁরা আজ বাঙ্গালী সমাজের অঙ্গ হিসাবেই গণ্য হচ্ছেন। সুতরাং বনগ্রামবাসীরা এখন ভারতীয়। সকলেই তাই রাজ্য সীমার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে চান না, সে কারণেই বৈবাহিক সম্পর্কস্থাপনেও কোন সঙ্কোচ আসেনা কারও মনে।

৩২

গাজন উৎসব

বৎসর বিদায় দিতে চৈত্র মাসে যে উৎসব হয় তাকে বলা হয়ে থাকে গাজন উৎসব। বাংলার সর্বত্র এই উৎসব হয়ে থাকে। এই উৎসবের রীতি প্রকৃতি সর্বত্র অনেক অংশে এক নয়। তবুও অনেক ক্ষেত্রে উৎসবের কয়েকটি বিশেষ অংগ সর্বত্র সমান।

চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন যে উৎসবের শেষ হয় তাকেই বলা হয়ে থাকে দেল পূজা ও চড়ক উৎসব। চৈত্র মাসের প্রথম দিন থেকেই এই উৎসবের প্রস্তুতি চলতে থাকে। যাঁরা এই উৎসবের বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন তাঁদের গাজনের সন্ন্যাসী বলা হয়ে থাকে। এই সন্ন্যাস যাঁরা গ্রহণ করেন তাঁরা তাঁদের রুচি ও সামর্থ্য মত গ্রহণ করে থাকেন। কেউ একমাস, কেউ এক পক্ষকাল, কেউ এক সপ্তাহকাল আবার কেউ বা তিন চার দিনও সন্ন্যাস গ্রহণ করে থাকেন। এ সময় তাঁরা শুদ্ধাচারে থাকেন। গৈরিক বস্ত্র পরিধান করেন আর এক বেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন আর এক বেলা ফল আহার করেন।

সংক্রান্তির তিন দিন পূর্বের দিনটিকে বলে ঘাট সন্ন্যাসীর দিন। এদিন 'তারা পাট ভাঙ্গে' সন্ন্যাসীরা। এর অর্থ হল একটি নির্দিষ্ট খেজুর গাছ থাকে যে গাছ কেউ কোনদিন রসের জন্য বা অন্য কোন কারণে অস্ত্র প্রয়োগ করেনি বা করবে না। সেই গাছের তলা পরিষ্কার করে বেদী রচনা করা হয়। তারপর পুরোহিত সেই গাছ মন্ত্রের দ্বারা শোধন করেন। অতঃপর অপরাহ্নে মূল সন্ন্যাসী অর্থাৎ এই সন্ন্যাসীদের পরিচালক ও নির্দ্দেশক (স্বভাবতই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এই পদলাভ করেন) তিনি প্রথমে সেই খেজুর

গাছের মাথায় উঠবেন। তারপর দোয়ারেক, তোয়ারেক ও শেষ সন্ন্যাসী এবং অপর সন্ন্যাসীদের মধ্যে যদি কেউ উঠতে চান উঠবেন। তাঁরা সকলে মিলে বৃত্তাকারে খেজুর গাছের মাথায় ঘুরবেন কেবলমাত্র মাঝ পাতার গুচ্ছ ধরে। তারপর মাঝ পাতার কিছু অংশ ছিঁড়ে নিয়ে খেজুর কাঁটা খেজুর কাঁদি ভেঙে নিয়ে নেমে আসেন। এই কাজের পদ্ধতি অনেকে সহজ মনে করলেও সহজসাধ্য নয়। খেজুর গাছের মাথায় অন্য কোন সময়ে আহত না হয়ে ওঠা যায় না। কারণ খেজুরের তীক্ষ্ণ কাঁটা ভেদ করে ওঠা কারও পক্ষেই অক্ষত অবস্থায় সম্ভব নয়। কিন্তু সন্ন্যাসীরা অক্ষত থাকেন। সে সময় ঢাক, ঢোল, কাঁসি বাজান হয় আর সন্ন্যাসীরা "কৈলাশের বুড়োশিব মহাদেব" এবং "বাবা তারকেশ্বরের সেবা লাগে মহাদেব" বলে উচ্চস্বরে ডাকতে থাকেন। যাঁরা দেখেন, তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন খেজুর গাছের কাঁটা সে সময় লজ্জাবতী গাছ স্পর্শ করলে যেমন স্পর্শকাতর হয়ে ম্রিয়মান হয়, খেজুর গাছের কাঁটাও সেইরূপ অবনমিত হয়। মাথায় ওঠার সময় যে স্থান দিয়ে সন্ন্যাসীরা ওঠেন সেই স্থানের পাতা বেগ্‌লসহ উভয় পার্শ্বে সরে গিয়ে ওঠার জন্য পথ করে দেয়।

খেজুর গাছ থেকে মাঝ পাতা আনার পর জলাশয়ের ঘাটে কাদা দিয়ে বেদী রচনা করে, কাদা দিয়ে শিব গঠন করে সেখানে পূজা করা হয়। সন্ন্যাসীরা স্নান করেন। এই শিবের মাথায় ফুল দেওয়া হয়। ফুল আপনা হতেই পড়ে যায়। যতক্ষণ না পড়ে ততক্ষণ সন্ন্যাসীদের নিয়ম নিষ্ঠার ত্রুটি ঘোষণা করে। সুতরাং সন্ন্যাসীরা মার্জনা ভিক্ষা করেন শিবের নিকট। তাকে বলা হয় শয়াল খাটা। ফুল পড়লে তবে তাঁদের নিস্তার। শিবের মাথায় ফুল দেওয়া আর মাথা থেকে ফুল পড়া এই অনুষ্ঠানকে "ফুল কাড়ান" বলা হয়। এরপর সন্ন্যাসীরা উত্তরীয় ধারণ করেন। এক একটা ফেটি সুতার গুচ্ছা গলায় মালার মতন করে তাঁরা পরে থাকেন এবং তার নীচের দিকে অর্থাৎ যে অংশ বুকের উপর থাকে তাতে খেজুর গাছের মাঝ পাতা, যা তাঁরা গাছ থেকে পেড়ে আনেন তাই বেঁধে দেওয়া হয়। যাঁরা নূতন সন্ন্যাসী হন তাঁদের সেই সময় গুরু নির্ধারণ করতে হয় যাকে বলা হয়ে থাকে "চৈতেগুরু"। সন্ন্যাসীরা নিজ নিজ পছন্দমত জাতিবর্ণ নির্বিশেষে গুরুর নাম করতে পারেন। গাজনের পর এই চৈতে শিষ্য গুরুকে সাধ্যমত প্রণামী দিয়ে থাকেন। গুরুও সাধ্যমত তাঁর শিষ্যকে খাওয়ান ও পোষাক পরিচ্ছদ দিয়ে থাকেন। এরপর সন্ন্যাসীরা ফিরে আসেন যেখানে চড়ক উৎসব হয় সেইখানে যাকে "চড়কতলা" বলে। কোথাও কোথাও সেই দিন সন্ন্যাসীরা

জলাশয়ের ধারেগিয়ে আকুল স্বরে শিবকে ডাকতে থাকেন। আশুতোষ শিবও ভক্তের সেই আহ্বানে ঘাটের কূলে আসেন তখন জল থেকে বুদ-বুদ উঠতে থাকে। তখন মূল সন্ন্যাসী তাঁকে কোলে করে তুলে নিয়ে আসেন। আবার অনেক সময় শিব জলের মধ্যে লুকোচুরি খেলা করেন। বুদবুদ এক স্থান থেকে সরে আর এক স্থানে যায় এইভাবে বহু সাধ্য সাধনা আর শয়াল খাটার পর শিব ধরা দেন। এরূপ একটা অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা যায় জলেশ্বর, সিন্দ্রানী, বাজিতপুর, গোববাপুর-গাঁড়াপোতা প্রভৃতি গ্রামে। যেখানে এরূপভাবে শিব তোলার রীতি নেই সেখানে অন্য শিব এনে পূজা করা হয়। জল থেকে যে শিব তোলা হয়, চড়ক পূজার দিন পূজা অন্তে শিবকে পুনরায় জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। এক বৎসর জলে ডুবে থাকেন। শত চেষ্টা করিলেও আর সেই শিবকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্বে পাওয়া যায় না।

ঘাট সন্ন্যাসীর পরের দিন হয় নীল পূজা। এদিন হাজরা নিমন্ত্রণ করা হয়। হাজরা হল শিবের চেলা ভূত প্রেতের অধিনায়ক। কোন জলাশয়ের ধারে সন্ন্যাসীদের একটি নির্দ্দিষ্ট গাছ থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় জিবলী গাছ আবার কোথাও কোথাও বট অথবা অশ্বত্থ গাছও থাকে। এই স্থানকে হাজরাতলা বলা হয়। নীলের দিন প্রথম প্রহরে মূল সন্ন্যাসী তাঁর সহায়ক হিসাবে দোয়ারকে, তেয়ারকে-কে সঙ্গে নিয়ে সেই গাছতলায় গিয়ে গাছের তলা পরিষ্কার করেন। তারপর একটি পান ও একটি সুপারি রেখে বলে আসেন, "হাজরা তোমাকে আমরা ভোগ দেব আজ রাত্রে অমুক সময় থেকে অমুক সময়ের মধ্যে। আমাদের এই নিমন্ত্রণে অনুগ্রহ করে উপস্থিত হয়ে তোমার ভোগ গ্রহণ কোরো।" ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ভোগ সেখানে হাজির করতে হয়, নচেৎ যেমন ভোগ তেমনই পড়ে থাকে সকাল পর্যন্ত। তার পর শিয়াল কুকুরে খায়। রাত্রে কোন দেহধারী প্রাণী সে খাদ্য স্পর্শও করে না।

তারপর হয় নীলপূজা। প্রথমে নীলাবতী দুর্গাপূজা করা হয়, পরে হয় শিব পূজা। এই পূজায় নীল রঙ্, নীল বস্ত্র, ঘট, গামছা ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। ঐ সময় শিবের বাণে নীল মাখান হয়। একটি লৌহ শলাকা তাতেই নীলরঙ্ মাখান হয় সেইটাই হয় শিবের বাণ। তারপর পুনরায় ফুল কাড়ান হয়। একই-ভাবে তারপর শিবকে মূল সন্ন্যাসী মাথায় করে নিয়ে চলেন গ্রাম গ্রামান্তরে বাড়ি বাড়ি। তার পিছনে অনুসরণ করেন অপর সন্ন্যাসীরা, ঢাকি, ঢুলি, কাঁসি-বাদক। গৃহস্থ বধুরা ও কন্যারা শিবের মাথায় দুধ, গঙ্গাজল, বিল্বপত্র দেন

এবং সন্ন্যাসীদের ফল দেন। বাদ্যকরদের দেন পয়সা সামর্থ্যমত। এইভাবে ঘোরার পর অপরাহ্নে গাজন তলায় ফিরে আসেন। মূল সন্ন্যাসী তাঁর দুজন সহায়ক সঙ্গে নিয়ে যান শ্মশানে এবং সেখান থেকে মড়া পোড়ানোর পর যে পোড়া কাঠ অবশিষ্ট পড়ে থাকে তাই নিয়ে আসেন। তারপর গাজনতলায় হয় শিবের গান তাকে 'বালাকী' বলা হয়। মধ্যরাত্রে আবার শিব পূজা করা হয় এবং একইভাবে ফুল কাড়ান হয়। শ্মশান থেকে আনা কাঠের সঙ্গে অন্য কাঠ মিশিয়ে আগুন জ্বালা হয়। সন্ন্যাসীরা সেই আগুনের মধ্য দিয়ে একপাশ থেকে অপর পাশে লাফালাফি করেন। তারপর শ্মশানের থেকে আনা কাঠ ঐ আগুনে দিয়ে ধরিয়ে নিয়ে হাজরার ভোগ রান্না করার উনান ধরান হয়। এই ভোগ দেওয়াকে বলে "হাজরা-ভাটা"। ভোগ রান্না করেন মূল সন্ন্যাসী সে সময় তাঁর মুখে নাকে কাপড় বেঁধে রাখতে হয়। একটি নূতন মাটির হাঁড়িতে চালে ডালে পাঁচ পোয়া পরিমাণ সিদ্ধ করা হয়, সিদ্ধ চাল এবং মটর অথবা ছোলার ডাল দেওয়াই রীতি। শোল, চ্যাঙ, গজাল এর মধ্যে যে কোন এক প্রকারের মাছ পোড়ান হয় তার আঁশ পরিষ্কার করে নেওয়ার পর। এই ভোগ সিদ্ধ হলে উনান থেকে নামিয়ে মূল সন্ন্যাসী সেই গরম হাঁড়ি সরাসরি মাথায় নিয়ে হাজরার ভোগ দিতে হাজরাতলা অভিমুখে রওনা হন। তাঁর পিছন পিছন অন্যান্য সন্ন্যাসীরাও ঢাক, ঢোল, কাঁসি বাদ্যসহকারে চলতে থাকেন। মূল সন্ন্যাসী, দোয়ারকে, তেয়ারকের নাকে "মুখো ডাব্" অর্থাৎ কাপড় বাঁধা থাকে। অন্যান্য সন্ন্যাসীরা সুর করে বলতে বলতে যান "শিবের দূত কেলে ভূত আয়রে আয়।" হাজরাতলায় গিয়ে একখানা কলার আগুট পাতা পেতে এক ভাঁড় জল রাখা হয়। তারপর ভোগের হাঁড়ি উপুড় করে ঝাঁকানিতে যতখানি ভোগ পড়ে পাতায় তাই দিয়ে সমান করে মাঝামাঝি দাগ কেটে চার ভাগে ভাগ করা হয়, আর তার কেন্দ্রস্থলে পোড়ান মাছ রাখা হয়। ভোগের উপরে গাওয়া ঘি ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এরপর সকলে পিছন ফিরে সেদিকে কেউ না তাকিয়ে গাজনতলায় ফিরে আসেন। নির্দ্দিষ্ট সময় ভোগ উপস্থিত না হলে হাজরা আসেন না। অনেক সময় ভোগ রান্নার পূর্বে ফুল কাড়ানর সময় শিবের মাথা থেকে ফুল পড়তে দেরী হয়ে যায়। ফুল না পড়লে ভোগ রান্না করার রীতি নেই। সে সময় দেরী অনিবার্য হয়ে ওঠে।

পরদিন চড়ক পূজা অর্থাৎ শিব পূজা পুরোহিত করেন। প্রত্যেক সন্ন্যাসী পর্যায়ক্রমে শিবের মাথায় ফুল দেন। ফুল না পড়লে শয়াল খাটতে

আরম্ভ করেন। সন্ন্যাসী বিশেষে কোন ত্রুটি থাকলে বা নিষ্ঠার অভাব থাকলে এই ঘটনা ঘটে। ফুল পড়লে পূজা সফল হয়। সকল সময় সন্ন্যাসীরা শিবনাম করেন। পূর্বে এই দেল পূজার পুরোহিত দরকার হত না, মূল সন্ন্যাসীই ও কাজ করতেন। এখন এই তান্ত্রিক বৌদ্ধ রীতি হিন্দু আচার আচরণে জারিত হয়ে উঠেছে।

এরপর চড়ক গাছে ঘোরা, উপর থেকে লাফ ইত্যাদি হয়। চড়ক বাঁশের গাছ একটা লম্বা কাঠের মাথায় একটা বাঁশের কেন্দ্রস্থল ছিদ্র করে চড়ক কাঠের মাথায় বেঁধান থাকে। একদিকে এক একজন সন্ন্যাসীর কোমর দড়ি দিয়ে বেঁধে অপর মাথায় দড়ি ধরে প্রবল ভাবে ঘোরান হয়।

উপর থেকে লাফানোর সময় কেউ এক তলা আবার কেউ বা তিন চার তলা উঁচুর থেকে লাফ দিয়ে পড়েন তলায় থাকে জাল, জালের উপর বৈঁচের কাঁটা, বঁটি, দা, কাটারি, ছুরি ইত্যাদি ধারাল অস্ত্র। এরই উপরে সন্ন্যাসীরা লাফ দিয়ে পড়েন। এতে তাঁদের দেহে কোন আঘাত লাগে না। এরপর চড়ক পূজার সমাপ্তি সন্ন্যাস ত্যাগ। শিব বিসর্জন।

[যত দিন সন্ন্যাস থাকে ততদিন সন্ন্যাসীদের 'শিবগোত্র'। পারিবারিক কোন জন্ম-মৃত্যুর অশৌচ পালন ইচ্ছাধীন। কারণ সন্ন্যাস ত্যাগ না করলে অশৌচ হয় না।]

৩৩

ডাকপুরুষ ও ডাক সংক্রান্তি

প্রাবৃটের মেঘমুক্ত কলেবর, শরতের নির্মল নীল আকাশ, যখন হাসিভরা মুখে নিজের বিমল জ্যোতিতে ভাস্তে ভাস্তে শস্যশ্যামলা বসুন্ধরার অপূর্ব শোভা নিরীক্ষণ করে, আনন্দে আত্মহারা হয়ে হেমন্ত ঋতুকে আলিঙ্গন করবার জন্য অগ্রসর হয়, ঠিক সেই সময় আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির পূর্ব রাত্রিতে, বঙ্গের কৃষককুলের ঘরে ঘরে এক বার্ষিক আনন্দোৎসব কৃষকদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এই বিশেষ রাত্রিটিকে 'ডাক সংক্রান্তি' বলা হয়ে থাকে।

শৈশব ও কৈশোরের অতীত পল্লীজীবনের দিনগুলির সুখময় স্মৃতিকথা মনে করলে এই আনন্দমুখর রাত্রির কথা স্বতঃই মনকে আন্দোলিত করে। প্রতি পল্লীর ঘরে ঘরে কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই এই আনন্দে অংশ-গ্রহণ করে থাকেন। এমন কি অনেক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারও এই বিশেষ আনন্দ উৎসবে যোগদান করতেন। এখনও পল্লী মায়ের স্নেহের দুলালরা এই আনন্দ উৎসবের অনুষ্ঠান করে থাকেন। কিন্তু পূর্বের ন্যায় সে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ কোলাহল নেই, তা আনুষ্ঠানিক কার্যে পরিণত হয়েছে।

এই পর্বকে কোন ধর্ম বা শাস্ত্রসঙ্গত বা অনুমোদিত পর্ব বলা চলে না। কতদিন থেকে যে পল্লীবাসীরা এই উৎসব পালন করে আসছেন তাও নির্ণয় করা যায় না। কারণ তার কোন শাস্ত্রীয় বা ঐতিহাসিক নিদর্শন বা কোন বিশেষ ধর্মের অনুশাসন নেই। পুরাণ বা ইতিহাস-এর কোন

সংবাদ রাখে না, পল্লীবাসীর জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করা ব্যতীত এর তথ্য নির্ণয় করার অন্য কোনও উপায় নেই। যে ব্যক্তির বা যে মহাপুরুষের নামোল্লেখে এই উৎসব প্রতি বছরই পালিত হয় তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাবার কোন উপায় নেই বা কেউ এই বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু নন। কেবলমাত্র প্রমাদপূর্ণ কিংবদন্তী ও প্রবাদের উপর নির্ভর করেই এই আনন্দ-উৎসব প্রতি বছরে বাংলার কৃষককুলের ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

কৃষককুলে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, অতীতের হারানো দিনের কোন এক সময় এক মহাপুরুষ বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন। শারীরিক বল বীর্য্যে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। মন্ত্রৌষধিও তাঁর বিশেষভাবে জানা ছিল। কথিত আছে যে, তিনি প্রতি বছরে আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির পূর্ব রাত্রিতে কোন এক নির্দিষ্ট শুভ-লগ্নে লাঠি ও প্রজ্জ্বলিত মশাল হাতে নিয়ে, বীরত্বব্যঞ্জক ভাব ভঙ্গীতে ভয়ঙ্কর শব্দ করতে করতে বিধাতা পুরুষের নিকট গমন করতেন এবং তাঁর কাছে মরধামের জীবগণের শারীরিক ও সাংসারিক অবস্থার বিষয় জ্ঞাপন করে বিধাতা পুরুষের কাছ থেকে জীবকুলের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষতা লাভের আশীর্ব্বাণী ও উপদেশ নিয়ে মর্ত্যধামে ফিরে আসতেন ও মানবগণকে সেই আশীর্ব্বাদ ও সদুপদেশ দান করতেন। পৃথিবীর সংবাদ নিয়ে তিনি স্বর্গধামে গমন করতেন বলে তাঁকে 'ডাকপুরুষ' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেন যে, তিনি আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির পূর্ব রাত্রিতে নির্দিষ্ট সময়ে পল্লীবাসীকে ডেকে উন্মুক্ত মাঠে নিয়ে গিয়ে তাদের ব্যায়াম ও মন্ত্রৌষধি শিক্ষা দিতেন।

প্রকৃত ঘটনা কি তা জানা না গেলেও কেবলমাত্র রূপকথা বা উপাখ্যানের উপর নির্ভর করেই আজও বাংলার ঘরে ঘরে যুবকগণ দল বেঁধে মাঠে যায় ও সমস্ত রাত্রি মল্লযুদ্ধ বা কুস্তি, লাঠিখেলা, মশাল জ্বালান প্রভৃতি নানারূপ ক্রীড়া কৌতুক দ্বারা ঐ বিশেষ রাত্রিটি পালন করে অতীত হারানো দিনের মাহাত্ম্য রক্ষা করে থাকে। নিশাবসানে নিকটবর্ত্তী কোন নদী বা জলাশয়ে স্নান করে একটি পাত্রে করে জল নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। ঐ জলকে কৃষকগণ 'ডাকজল' বলে থাকেন। প্রত্যেক কৃষক পরিবারে আবাল বৃদ্ধ বণিতা নিমপাতা, তালশাঁস ভক্ষণান্তে ঐ ডাকজল পান করে থাকেন। তাঁদের বিশ্বাস উহাই ডাক পুরুষের আদেশ বা বাণী। ঐদিন ঐরূপ ভক্ষণ করলে সমস্ত বছর স্বাস্থ্য ভাল থাকে ও উহার গুণ সারা বছর ধরে শরীরের মধ্যে কাজ করতে থাকে।

আবাব দেখা যায় নিশাবসানে অল্পবয়স্ক বালকগণ একটি বংশদণ্ড হাতে নিয়ে কুলা পিটাতে থাকে আর উচ্চকণ্ঠে নিম্নলিখিত ছড়া বলে সমস্ত গ্রামকে মুখরিত করে তোলে—

"আশ্বিন যায় কার্ত্তিক আসে
মা লক্ষ্মী গর্ভে বসে
আমন ধানের সাব বসে।
এপারের পোকা মাকড ওপারেতে যায়
ওপারের শেযাল কুকুরে ধরে ধরে খায়।
হোঃ, হো।"

এই ছড়ার প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করলে দেখা যায়—প্রকৃতই ঐ সময় আমন ধান পুষ্ট হতে থাকে এবং বর্ষায় মশা ও অন্যান্য কীট জন্মে কৃষকগণকে বিব্রত কবে ও শস্যের হানি করে। সেগুলিও শরতের শেষ ও হেমন্তের আবির্ভাবে অন্তর্হিত হতে থাকে বলে কৃষকগণ আনন্দ প্রকাশ করেই ঐ ছড়া বলে থাকেন।

উৎসবের তিন চার দিন পূর্ব হতেই পল্লীর ঘরে ঘরে পাটকাঠি সংগ্রহের ধুম পড়ে যায়। ঐ সব পাটকাঠি শুকনো ক'রে বেছে আঁটি বা তাড়া বাঁধা হয়। তাকেই মশাল বলে। এই মশাল প্রজ্জ্বলিত করে কৃষক সন্তানগণ সমস্ত রাত গ্রামের চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়ায় এবং 'ওহো ওহো' করে আনন্দ-ধ্বনি করতে থাকে। এও মশক ও অন্যান্য কীট ধ্বংসের একপ্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় বলা যেতে পারে। এই মশাল পোড়ানো বা জ্বালানো শেষ হলে নিশাবসানে কৃষক বালকগণ প্রজ্জ্বলিত মশালের শেষ অংশ একত্রিত করে বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি করে ও সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নির উত্তাপে হাত, পা, মুখ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে উত্তাপ গ্রহণ করে। আবার কেউ কেউ ঐ রাত্রিতে ঝাড়ান-এর মন্ত্র আবৃত্তি করে ও নানাপ্রকার গাছ ঔষধের জন্য সংগ্রহ করে।

কৃষক রমণীগণেরও ঐ বিশেষ দিনে আনন্দ উৎসবে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়—তবে তা অন্তঃপুরে। নতুন আউশ তণ্ডুলের গুঁড়ার সঙ্গে নারিকেল ও গুড় দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করে পরদিন আত্মীয় স্বজনগণকে পরিবেষণ করে অপার আনন্দলাভ করে থাকেন। ডাক সংক্রান্তিতে সমস্ত কৃষিকার্য বন্ধ থাকে। উৎকলেও এই দিনটি প্রতিপালিত হয়। কিন্তু দিন বা স্থান ভেদে আচার ও ব্যবহার পদ্ধতি স্বতন্ত্র।

রূপকথাই হোক আর কিংবদন্তীই হোক যে মহাপুরুষের নাম স্মরণ করে বহুকাল হ'তে বঙ্গের কৃষকসমাজে এই পর্বোৎসব পালিত হয়ে আসছে সেই ডাকপুরুষ যে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ

নেই—যদিও তাঁর জীবনী আমাদের কাছে চিরদিনই অন্ধকারাচ্ছন্ন। সুদূর পল্লীর কৃষককুলে জন্মগ্রহণ করে পল্লীবাসীর মুখোজ্জ্বল করেছিলেন সেই কথাই বারে বারে অন্তরে জাগিয়ে দেয়। তিনি যে বঙ্গের কোন্ অংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার কোন নিদর্শন নেই। তবুও নিম্নের ছড়া থেকে অনুমিত হয় যে, তিনি পূর্ববঙ্গের কোন পল্লীর দুলাল ছিলেন।

"আশ্বিনেতে কচি শশা কার্ত্তিকেতে ওল,
অগ্রহায়ণে শালি ধান্য ইছা মাছের ঝোল।"

(পূর্ববঙ্গে 'ইছা' চিংড়ি মাছকে বলে থাকে।) খনার বচনের মত ডাকপুরুষেরও অনেক বাণী প্রচলিত আছে যা কৃষকগণ আজও পালন করে থাকেন।

আজ আমরা সভ্য হয়েছি, অতীতের সংস্কার ও আনন্দপদ্ধতি আমাদের কাছে লজ্জাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা শৈশবে ঐ দিনটিতে অংশগ্রহণ করে লাঠি ও নানাপ্রকার ক্রীড়াকৌশল শিক্ষা করবার সুযোগ লাভ করেছি। সে কারণ আজও নিজেকে ধন্য মনে করি। আজ ঐ উৎসব কৃষকগণের মধ্যেও ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে।

জাতিধর্ম, সংস্কার ইত্যাদি সমস্ত তুচ্ছ করে পল্লী মায়ের দুলালেরা যে ঐ বিশেষ দিনে ডাকপুরুষের ডাকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অনাবিল আনন্দে আত্মহারা হ'ত, পল্লীজীবনের সংহতি রক্ষা করে আগত বৎসরের সুখময় স্বাস্থ্য ও সম্পদের কামনা করে ডাকপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করত—কালচক্রের কুটিল গতির ছন্দে ক্রমশ যেন ঐ উৎসব স্তিমিত হয়ে আসছে। ঐ বিশেষ দিনটি পালন কুসংস্কার হতে পারে, আচার বা অনুষ্ঠান শাস্ত্রসঙ্গত না হতে পারে, তবুও এ-কথা সত্য যে, পল্লীবাসীর সংহতি রক্ষা ও পরস্পর মনের অনাবিল মিলনের সুযোগ এই আনন্দ কোলাহলের মাধ্যমেই হ'ত। আজ আমাদের সেই পল্লী জীবনেও ছন্দপতন শুরু হয়েছে। কালের ভাবধারা দিন দিন স্বাভাবিক জীবনস্রোতকে যেন যন্ত্রচালিত করে তুলছে তাই আর পল্লীবাসীর অন্তরে অতীত কালের ডাকপুরুষের ডাকে পূর্বের ন্যায় সাড়া জাগে না। আজ সেদিন পালন আনুষ্ঠানিকভাবেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। সেই স্বভাবসিদ্ধ চাঞ্চল্য, প্রাণ মাতানো আনন্দ কলোচ্ছাস যেন ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে। তাই মনে এই প্রশ্নই জাগে—কৃষককুলের সে অনাবিল আনন্দস্রোতের উৎস কিসের উত্তাপে আজ শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে? কোন্ এক ক্রূর শক্তি অলক্ষ্যে তাদের সহজ ও সরল প্রাণকেন্দ্রে নিষ্ঠুর আঘাত হানছে—এই প্রশ্ন আজ অন্তর থেকে জেগে উঠে।

৩৪

শিল্প

মুক্তা ও চুন : শিল্পক্ষেত্রে বনগ্রামের যে পরিচয় উদ্ঘাটন করা যায় তাতে দেখা যায় বিশেষ একটা শিল্প যা বনগ্রামের গৌরব বৃদ্ধি করত সেটি হল মুক্তা বা মতি শিল্প। সেই সঙ্গে তার উপজাত শিল্প ছিল ঝিনুকের চুন। ইছামতী গর্ভ থেকে ঝিনুক আহরণ ও তার থেকে মুক্তা বের করে ব্যবহার উপযোগী করে বাইরে চালান দেওয়া হত। ঝিনুক পুড়িয়ে চুন উৎপাদন করা হত। এই চুন ইমারৎ প্রস্তুতকার্যে ব্যবহার করা হত। পানে খাওয়ার জন্যও এই চুনের ব্যবহার ছিল। তাকে বাখারী চুন বলা হত। এখন এ শিল্প আর নেই। ইছামতী মতি হারা। এই অঞ্চলের বিরাট এক অংশের লোকের রুজীরোজগার চলত এই শিল্পের মাধ্যমে। ঝিনুকের থেকে বোতাম প্রস্তুত করার কারখানাও হয়েছিল একটি। বছর কয়েক পরে বন্ধ হয়ে যায়।

লৌহ : বনগ্রামে লৌহ শিল্প যা ছিল তা কৃষিভিত্তিক। গৃহস্থালী দ্রব্যাদি যেমন দা, কুড়ুল, বঁটি, খুন্তি, লাঙ্গলের ফাল, গরুর গাড়ির চাকার হাল ইত্যাদি গ্রামের কর্মকাররা করতেন। বৃহদাকারের শিল্প কিছু ছিল না। বর্তমানে এই শিল্পের কিছু প্রসার ঘটেছে। সেটিও কৃষিকে কেন্দ্র করে। যেমন পাম্প ও তার সংস্থাম আমদানি ও মেরামতি, মোটর মেরামতির কারখানা, সাইকেল মেরামতি, রিক্সা প্রস্তুত ও মেরামত। টিনের বাক্স, টব, উনুন ইত্যাদি প্রস্তুত ও মেরামত।

ঘড়ি মেরামত : ঘড়ি মেরামতের দোকান স্বাধীনতালাভের পূর্বে মাত্র

ত্রুটি ছিল। এখন ঘড়ি ব্যবহার বেড়েছে সুতরাং মেরামত ও নূতন ঘড়ি বিক্রয়ের দোকানও প্রায় অর্ধশতাধিক হয়েছে বনগ্রাম শহরেই। এছাড়া বিভিন্ন গঞ্জে ও শহরে ত আছেই।

স্বর্ণশিল্প : স্বর্ণশিল্প পূর্বে কেবলমাত্র বনগ্রাম শহরে ছিলনা অনেক গ্রামেও এই শিল্প ছিল। গ্রামের শিল্পীরা তাঁদের বাড়িতেই অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করতেন গ্রাহকদের ফরমাস মত। সেখানে রেডিমেড গহনার ব্যবস্থা বা শো কেসে সাজানর কোন রেওয়াজ ছিল না। এমন কি বনগ্রাম শহরেও শো কেসে রেডিমেড গহনা রাখার ব্যবস্থা ছিলনা। বর্তমানে শহরে স্বর্ণ-শিল্পীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং দোকানের সংখ্যা যে বাড়ছে তাই নয় অনেক দোকান কলিকাতার অনুকরণে সুসজ্জিত। এ ছাড়া অনেকার শিল্পী মহাজনদের প্রায় সকলেই বন্ধকী কারবার করে থাকেন।

পিতলকাঁসা : পিতলকাঁসার বাসন বনগ্রামে প্রস্তুতের কোন কারখানা না থাকলেও পূর্বে মেরামতি, কোঁদাই, নালুক ইত্যাদির একাধিক দোকান ছিল, এখনও আছে।

কাষ্ঠশিল্প : বনগ্রামে কাষ্ঠশিল্পের কোন দোকান ছিলনা। সীমিত সংখ্যক কাঠের আড়ৎ ছিল। আড়াকুশী দিয়ে চেরাই তক্তা ইত্যাদি বিক্রয় হত। গৃহস্থেরা বাড়িতে মিস্ত্রী ডেকে ইচ্ছামত প্রস্তুত করিয়ে নিতেন। তখন এত আসবাবপত্রের ব্যবহারের প্রচলন ছিল না। উচ্চ মধ্যবিত্ত দু'এক জনের ঘরেই খাট পালঙ্কের দেখা পাওয়া যেত। এখন কাষ্ঠশিল্পের প্রসার ঘটেছে। বিবিধ কাঠের আসবাবপত্র নির্মাণের কারখানা হয়েছে। বিবাহে কাঠের আসবাবপত্র যৌতুক দেওয়া একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে শিল্পায়িত দ্রব্য সাজিয়ে রাখার শো রুম হয়েছে। এখন বাইরের থেকে নানা ধরণের কাঠ আমদানি করা হয়। শাল, সেগুন ইত্যাদি দামী নামী কাঠের ব্যবহার তখন কমই ছিল। স্থানীয় আম, কাঁঠাল, জাম, সেগুন ইত্যাদি কাঠই স্থানীয় চাহিদা মেটাত। এছাড়া ছিল গরুর গাড়ি ও ঘোড়ার গাড়ির চাকা নির্মাণের কারখানা। বাবলা গাছই এই শিল্পের একমাত্র সম্বল। এখনও এ শিল্পটিকে আছে তবে প্রয়োজন পূর্বের থেকে কম। এ শিল্প বেশীরভাগই শিমুলতলা, মতিগঞ্জে কেন্দ্রীভূত ছিল, এখনও আছে। বনগ্রামে নৌকা নির্মাণ এখনও কয়েকটি স্থানে হয়। নৌকা নির্মাণ ও মেরামতের একটি কারখানা পানচিতা বাঁওড়ের ধারে এখনও বর্তমান আছে।

বাঁশ : বনগ্রামে বাঁশের অভাব কোনদিনই ছিল না। আর তার ব্যবহারও ছিল খুব বেশী। অধিকাংশ গ্রামেই খড়ের বাড়ি ছিল। কোঠা-

বাড়ির দেখা মিলত সীমিত সংখ্যক গ্রামে। এ ছাড়া বাঁশের ঝুড়ি, চাঁচ, কুলা, ধুচুনি, চ্যাঙারী ইত্যাদি অনেক গ্রামে প্রস্তুত হত। বনগ্রামের বিভিন্ন মেলায় ও হাটে বিক্রয় হত ও হচ্ছে। বেতের ধামা, কাঠাও প্রস্তুত হ'ত অনেক গ্রামে, এখনও হয়ে থাকে। বর্তমানে মুলিবাঁশের ব্যবহার বেড়েছে। এই বাঁশ বাইরের থেকে আমদানি করা হয়। এই বাঁশ দিয়ে দর্মা প্রস্তুত করার একাধিক কারখানা হয়েছে এবং ব্যবহারও ক্রমে বেড়েই চলেছে। পূর্বে ইছামতী দিয়ে বাঁশের ঝাড় ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হত কলিকাতায় ও বিভিন্ন অঞ্চলে। এখনও চালান যায় লরিতে।

বেতারযন্ত্র: বেতারযন্ত্রের অর্থাৎ রেডিও ও ট্রানজিষ্টার বিক্রয় ও মেরামতের বেশ কয়েকটি দোকান বনগ্রাম শহরে স্থাপিত হয়েছে। এই শিল্প বনগ্রামের অন্যান্য শহর ও গঞ্জেও প্রসারিত। বেতারযন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে এবং শিল্পেরও প্রসার ঘটছে।

সঙ্গীত যন্ত্রশিল্প: হারমোনিয়াম, তারের বাদ্যযন্ত্র, খোল, ঢোল, ডুগি, তবলা ইত্যাদি প্রস্তুত ও মেরামতের একাধিক কেন্দ্র বনগ্রামে আছে। পূর্বেও এ শিল্প ছিল কিন্তু বর্তমানে চাহিদা বেড়েছে সুতরাং প্রসারও ঘটেছে। এছাড়া শব্দযন্ত্র বা মাইক সরবরাহ কেন্দ্র বনগ্রাম মহকুমায় শহর ও গঞ্জ সর্বত্রই একাধিক হয়েছে।

চশমা: বনগ্রামে স্বাধীনতালাভের পূর্বে চশমার কোন স্থায়ী দোকান ছিলনা। কয়েকজন চশমা বিশারদ শহর ও গ্রামে ঘুরে ঘুরে চশমা ফিরি করতেন। এই শিল্পে অবাঙ্গালী এবং কাবুলীদের দেখা যেত।

মৃৎশিল্প: বনগ্রামে মৃৎশিল্প যা ছিল তাতে গৃহস্থালী দ্রব্যাদি প্রস্তুত হত। এখনও হয়ে থাকে, হাঁড়ি, কলসী, কুয়ার পাট ইত্যাদি। এছাড়া নিম্নমানের মাটির পুতুল প্রস্তুত হত। প্রতিমা নির্মাণের মৃৎশিল্পী ছিলেন বনগ্রামে সীমিত সংখ্যক। তাঁরা মুসলমান পটুয়া। তখন পূজার এত বাড়াবাড়ি ছিল না। দুর্গাপূজা কালীপূজা ইত্যাদি সার্বজনীন ছিল না। গৃহস্থ বাড়ি যা হত তার শিল্পীরা নির্দিষ্ট ছিলেন। তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তৈরী করে দিতেন। সারা শহরে বিশ্বকর্মা পূজা হত একটি। এখন বিশ্বকর্মার প্রসার বিশ্বজোড়া সুতরাং তার পূজার সংখ্যাও ক্রমশ উল্লেখযোগ্য ভাবেই বাড়ছে। প্রতিমাশিল্পের প্রসার ঘটেছে এবং এখন ঐ শিল্পের শিল্পী সবই হিন্দু বিভিন্ন বর্ণের। কয়েকজন ব্রাহ্মণ মৃৎশিল্পীও আছেন।

বস্ত্রশিল্প: তাঁতের ও তাঁতির উপস্থিতি বনগ্রামে একেবারেই ছিল না একথা বলা চলে না। উল্লেখযোগ্য না হলেও ঘাটবাঁওড়ে ছিল। তাঁরা

সকলেই মুসলমান তাঁতি। এখন তারা ঐ শিল্প পরিহার করেছেন এমন কি পাড়ার নাম ছিল কারিকর পাড়া, তারও পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। জানিনা এই শিল্পের ভিতর অবমাননাকর কি আছে! আমি পূর্বে যা দেখেছি তা বললেও এখন যাঁরা ঐ শিল্পীর বংশধর আছেন, তাঁরা অস্বীকার করেন। তাঁদের অবস্থার উন্নতি ঘটেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে।

চিরুনি : চিরুনিশিল্পে বনগ্রামের স্থান কেবল পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা ভারতে এখন শীর্ষস্থানে। স্বাধীনতালাভের পূর্বে বনগ্রামবাসীদের এ শিল্প অজ্ঞাত ছিল। তখন যশোহরে একটিমাত্র চিরুনির কারখানা ছিল। ১৯০৯ খ্রীঃ মন্মথনাথ ঘোষ জাপান থেকে এই শিল্পের শিক্ষালাভ করে আসেন এবং 'অরিজিনাল কম্ব ফ্যাক্টরি' নামে যশোহরে একটি চিরুনি কারখানা স্থাপন করেন। যশোহর চিরুনি নামে ঐ কারখানায় প্রস্তুত চিরুনি বিক্রয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। স্বাধীনতালাভের পর তাঁরই আত্মীয় নলিনীবিহারী মিত্র বনগ্রামে বসতি স্থাপন করেন ও চিরুনির কারখানা স্থাপন করেন। নলিনী মিত্রের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্রেরা ঐ কারখানার প্রসার ঘটিয়েছেন এবং উৎপাদন অব্যাহত রেখেছেন। নলিনী মিত্রের কারখানায় শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক শিল্পীই এখন বিভিন্ন কারখানা করতে ও এই শিল্পের প্রসার ঘটাতে সাহায্য করেছেন। এখন বনগ্রামে সর্ব অঞ্চলেই এই কারখানা ছোট বড় নানা আকারেই দেখা যায়। এই লাভজনক ব্যবসায়ে অনেকেই বিত্তবান। বহু শ্রমিকের অন্নসংস্থান হচ্ছে এই শিল্পের মাধ্যমে। বিভিন্ন নামে যশোহর চিরুনি আজ ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এবং ভারতের বাইরে এই চিরুনি রপ্তানী হচ্ছে। উপজাত শিল্প কর্পূর প্রস্তুত করার কারখানা দুটি হয়েছিল মতিগঞ্জ, শিমুলতলায় কিন্তু কিছুকাল চলার পর দুটিই পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে ঐ শিল্প বিপজ্জনক বিধায় বোধ হয় কেউ আর নূতন করে করতে সাহস করছেন না। এছাড়া সেলুলয়েডের বিকল্প দিয়েই এখন বেশী কাজ হচ্ছে।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রশিল্প : বনগ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র বেসরকারীভাবে চালু হয় স্বাধীনতালাভের কয়েক বৎসর পর, সুতরাং তার আগে এ শিল্প বনগ্রামে ছিল না। বর্তমানে বনগ্রাম শহরে বৈদ্যুতিক যন্ত্র বিক্রয় ও মেরামতের দোকান স্থাপন ও তার প্রসার সারা মহকুমায় দেখা যায়। এই শিল্পে অনেকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। এখন সরকার এই মহকুমার বিদ্যুৎ সরবরাহ নিজ হস্তে গ্রহণ করেছেন এবং সুদূর গ্রাম অঞ্চলের বহুস্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে। বিদ্যুৎ চালিত জলসেচের গভীর এবং অগভীর অনেক নলকূপ এই

মহকুমায় আছে।

আইসক্যাণ্ডি : বনগ্রামে কয়েকটি আইসক্যাণ্ডির কলও স্থাপিত হয়েছে স্বাধীনতালাভের পর। আইসক্যাণ্ডির বিক্রয় ক্ষেত্র সুদূর গ্রাম অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত। বৃদ্ধ থেকে বালক বালিকা পর্যন্ত এই আইসক্যাণ্ডি বিক্রয় করে থাকে বনগ্রামের পথে পথে। পূর্বে বরফ বিক্রয় হত কুলপি বরফ। আর বরফ পিষ্ট করে কাঠিতে পরিয়ে রঙিন মিষ্টি জল দিয়ে। এইসব বিক্রেতারা কলিকাতা থেকে আসতেন নিত্য। হাটবারে তাদের সংখ্যাধিক্য দেখা যেত। আইসক্যাণ্ডি শিল্পেও অনেকের কর্মসংস্থান হয় মরসুমে মরসুমে।

গুল প্রস্তুতকরার কারখানা : ১৯৭৫-৭৬ খ্রীঃ থেকে বনগ্রামে কয়লার অভাবহেতু গুলের প্রচলন হয়। একটি দুটি করে গুলের কারখানা হতে হতে এখন প্রায় সব পল্লীতেই দু একটা করে গুল প্রস্তুতের কারখানা দেখা যাচ্ছে। এইক্ষেত্রে পুরুষ কর্মী অপেক্ষা নারী কর্মীর সংখ্যাই অধিক।

চানাচুর : পূর্বে চানাচুর প্রস্তুত ও বিক্রয় করতেন কয়েকজন অবাঙ্গালী। পরিমাণেও অল্প এখন চানাচুর প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয়েছে। দোকানে বস্তা বস্তা চানাচুর প্লাষ্টিক ব্যাগে সাজান দেখা যায়। সুদূর গ্রাম অঞ্চল পর্যন্ত এই খাদ্যবস্তু বিক্রয় হয়ে থাকে। কলিকাতা থেকে আগত অবাক জলপানের ফেরিওয়ালা আর দেখা যায় না।

শঙ্খশিল্প : এই শিল্প বনগ্রামে পূর্বে কখনও ছিল না। বঙ্গবিভাগের পর শঙ্খশিল্পীর আগমন ঘটে। তাঁরা এখানে কয়েকটি শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করেছেন।

পিতল কাঁসা ইত্যাদি ঝালাই : এই মেরামতি ও রং ঝালাই-এর কাজ পূর্বে ছিল কিন্তু খুব কম সংখ্যক দোকানই দেখা যেত। এখন এই দোকানের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। তা ছাড়া গ্রামে গ্রামে ঘুরেও অনেকে এই কাজ করতেন এখনও করে থাকেন।

তুলা : লেপ, তোষক, ছোবড়ার গদি, বালিশ ইত্যাদির দোকান পূর্বে ছিল একটি। এখন স্থায়ী দোকান কেবলমাত্র ঐ ব্যবসায়ের দু'তিনটির অধিক নয়। মরসুমের সময় অর্থাৎ শীতকাল অনেকে কাপড়ের দোকানের সঙ্গেও এই শিল্পের সংস্থান রাখা হয়। শিল্পী সবই বহিরাগত বিহারী মুসলমান। ছোবড়ার গদির জন্য ছোবড়া প্রস্তুত ও বিক্রয় করার কাজও অনেক পল্লীতে নারী পুরুষকে নিযুক্ত দেখা যাচ্ছে বর্তমানে। এখন বিয়েতে শয্যাদান আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে এই শিল্পের প্রসার দেখা যাচ্ছে।

ছাতা ও চর্মশিল্প : ছাতা মেরামত করার একটা বিশেষ সম্প্রদায় ছিল।

তাও সংখ্যা খুব কম। বর্তমানে যাঁরা জুতা মেরামত করেন তাঁরাই ছাতা মেরামত করছেন। জুতা প্রস্তুত ও জুতা মেরামত যাঁরা পূর্বে করতেন তাঁদের সকলেরই বাসস্থান ছিল মতিগঞ্জে এবং তাঁরা অবাঙ্গালী। এখন সেই পল্লীতে এবং আরও বিভিন্ন পল্লীতে দেখা যাচ্ছে বাঙ্গালী ঋষি সম্প্রদায়কে। তাঁরা এই কাজ ক্রমশ দখল করছেন। কাঁচা চামড়া সংগ্রহ ও রপ্তানির একটিমাত্র সংস্থা ছিল, মালিক মুসলমান। বর্তমানে একাধিক এবং সকলেই উচ্চবর্ণের হিন্দু। পূর্বে কলের ছাতার ব্যবহার গ্রাম অঞ্চলে কম ছিল। নারীদের ছাতা মাথায় দেওয়ার অধিকার ছিল না। গ্রাম অঞ্চলে তাল পাতার ছাতা টোকা ব্যবহার হত। এখন নারীরা মাথায় দিচ্ছেন রং বেরং-এর ছাতা আর ব্যবহারও বেড়েছে খুব। তবে আধুনিক যুবকেরা ব্যতিক্রম।

পোষাক পরিচ্ছদ: এ শিল্প যাঁদের পূর্বে ছিল তারা সকলেই মুসলমান এবং তাঁরা ওস্তাগর এই আখ্যায় আখ্যায়িত হতেন। স্বাধীনতালাভের কয়েক বছর পূর্ব থেকেই দু একজন হিন্দু দরজি দেখা যেত তাঁরা সকলেই কাপড়ের দোকানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। আটটি স্বতন্ত্র ওস্তাগরের দোকান ছিল। বর্তমানে পোষাক নির্মাণের কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। রেডিমেড পোষাক বাজারে তাঁরা যোগান দেন। অনেক নারীও এই শিল্পে নিযুক্ত। মধ্যবিত্ত ঘরের অনেক শিক্ষিতা মহিলাকেও এই শিল্প পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই শিল্পে দেশপ্রেমিক-দের দেখা যেত খাদি সুতাকাটা ও খাদিবস্ত্র বোনায়। বনগ্রামে শিবপদ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রগোপাল চট্টোপাধ্যায় ও শিক্ষক জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খাদি তাঁতের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্মী ছিলেন। বর্তমানে তা লুপ্ত। স্বাধীনতা লাভের পর অভয় আশ্রম থেকে এই শিল্পের প্রসার ঘটানোর চেষ্টা চলেছিল বনগ্রামে। কিন্তু দু'তিন বৎসর চলার পর বন্ধ। এখন কেবলমাত্র তিন চারটি খাদি বিক্রয়কেন্দ্র বনগ্রামে দেখা যাচ্ছে। ঝাউডাঙ্গায় মুসলমান তাঁতির বাস ছিল, তাঁদের উৎপাদিত বস্ত্র তখন ঐ অঞ্চলে বিশেষ আদৃত ছিল।

ধান ভানাই কল: বনগ্রামে ধানকল 'রাইসমিল' একটাই ছিল বৃহৎ আয়তনের—ইছামতী নদীর তীরে। বর্তমানে সে স্থানের নাম হঠাৎপল্লী। এ ছাড়া দুটি হাসকিং মেসিন ছিল। ধান ভানাতে গ্রামবাসীদের বনগ্রামেই আসতে হত। তবে গ্রামে গ্রামে ঢেঁকির প্রচলন ছিল। ফলে স্থানীয় চাহিদা তাতে মিটত। এছাড়া বাইরের চাল আমদানি হত। স্বাধীনতা-

প্রাপ্তির পর রাইস মিল বন্ধ হয়ে গেল। গ্রামে গ্রামে দেখা দিল হাসকিং মেসিন আর সেই সঙ্গে আটা ভাঙান কল। রেশন ব্যবস্থা ও গম চাষের সঙ্গে সঙ্গে আটার কলের প্রচলন বেড়ে গেল দ্রুত। এখন শুধু আটা ভাঙানই হয় না—ডাল ভাঙান, হলুদ ইত্যাদি গুঁড়া করা সবই যন্ত্রে হচ্ছে। ঢেঁকি আজ গ্রাম থেকে একরকম নির্বাসিত। অনেক বেওয়া, বিধবার কর্মসংস্থান হত ঢেঁকির মাধ্যমে। আজ এখন সে পথ বন্ধ।

ডেকরেটার্স: এখন এর বাংলা বললে অনেকেই বোঝেন না। কিন্তু এই শিল্প ও তার যোগান বনগ্রামে অজ্ঞাত ছিল। আজ ক্রিয়াকর্মে, যাত্রা থিয়েটারে এঁরা অপরিহার্য। তাই তার প্রতিষ্ঠানও এখন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বে দুটিমাত্র রূপসজ্জার প্রতিষ্ঠান ছিল। যাত্রা থিয়েটারের সাজ-সজ্জা সিন-সিনারী যোগান দিতেন তাঁরা। এখন এ শিল্পের প্রসার ঘটেছে। রূপসজ্জার সংকোচন দেখা যাচ্ছে। যাত্রা থিয়েটারের স্থানীয় সংস্থা গড়ছে না—ভাঙছে। তাই রূপসজ্জার কদর কম হচ্ছে।

নার্শারী: বাগীচা শিল্পের পথ প্রদর্শক এ অঞ্চলে গ্লোব নার্শারীর মালিক অমরবাবু। তিনিই প্রথম গোবিন্দপুরে বৃহদাকারে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সেখান থেকে ফল, ফুল গাছ কলিকাতায় যোগান যেত। বনগ্রামেও একটি বিক্রয় কেন্দ্র ছিল। বর্তমানে এই নার্শারীর ব্যবসায়ে অনেককেই দেখা যাচ্ছে। ছোটবড় অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ক্রিয়াকর্মে ফুলের সজ্জাও এরা করে থাকেন ও যোগান দেন। স্বাধীনতালাভের কয়েক বছর পূর্বেথেকেই গোবিন্দপুরে গ্লোব নার্শারীর প্রতিষ্ঠা। তার পূর্বে এই শিল্প অজ্ঞাত ছিল।

হাঁসমুরগী পালন: স্বাধীনতালাভের পূর্বে হাঁস, মুরগী পালন গ্রামের গৃহস্থরাই করতেন। তবে হিন্দুদের মুরগী পালন অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হত। যদি কেউ মুরগীর ডিম কিম্বা মাংস খেতেন তা গোপনে। বর্তমানে মুরগী অধিকাংশ হিন্দুদের প্রিয় খাদ্য। সুতরাং মুরগীর ডিম ও মাংস যোগানের জন্য বেশ কয়েকটি পোলট্রি গড়ে উঠেছিল। এখন পোলট্রি থাকলেও বৃহদায়তনের মুরগী পালন খামার আর দেখা যাচ্ছে না। তবে অনেকের বাড়িতেই দেশী মুরগী পালন করা হচ্ছে। মতিগঞ্জের হাটের ত্রিসীমানায় মুরগী বিক্রয় করা অপরাধ ছিল। এখন এই হাটে একটা বিশেষ বাজার সৃষ্টি হয়েছে। ক্রেতা বিক্রেতা সকলেই হিন্দু একথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

স্থাপত্য শিল্প : বনগ্রামে যাঁরা স্থপতি ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই মুসলমান এবং অধিক সংখ্যক শিল্পীর বাস ছিল জয়পুর গ্রামে। তাঁরা রাজ-মিস্ত্রী নামে পরিচিত। এখনও মুসলমান রাজমিস্ত্রীর সংখ্যা কম নয়। হিন্দু রাজমিস্ত্রীও অনেক দেখা যায়, তারা বনগ্রামের বিভিন্ন পল্লীতেই বসবাস করছেন। গ্রামাঞ্চলে কোথাও কোথাও দু'এক ঘর হিন্দু রাজমিস্ত্রীর বাস ছিল।

মিষ্টান্ন শিল্প : বনগ্রামের কাঁচাগোল্লার খ্যাতি সর্বজন বিদিত। যাঁরা এই শিল্পে সমধিক খ্যাত ছিলেন তাঁদের নাম উল্লেখ না করে পারছি না। ভরতচন্দ্র মোহন্ত এবং তার গুরু কান্ত মোদক কাঁচাগোল্লাকে বিখ্যাত করে-ছিলেন তাদের পাক প্রণালীর দক্ষতায়। কান্ত মোদক ধর্মপুকুরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। মতিগঞ্জে দোকান ছিল। ভরত মোহন্ত সুখপুকুরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দোকান বনগ্রামে আছে, তাঁর বংশধরেরা মালিক। শিল্পীর পদবীও তাঁরা কেউ কেউ পালটেছেন। বনগ্রামের জোড়া সন্দেশ প্রস্তুতকারক ছিলেন হাজারীলাল মোদক। তার আদি নিবাস গাঁড়াপোতায়। পরে তিনি মতিগঞ্জে তার শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থানান্তরিত করেন। এ দুটি মিষ্টান্ন নিত্য কলিকাতায় যোগান যেত। এখন বনগ্রামের জোড়া সন্দেশ ও কাঁচাগোল্লা গোল্লায় গেছে। সে দক্ষ কারিকর আর নেই। এখন কলিকাতার ধাঁচে অনেক দোকান গড়ে উঠেছে। বিবিধ মিষ্টান্নও বিক্রয় হয়ে থাকে কিন্তু সে কৌলীন্যের দাবিদার এখন কেউ নেই। সুতরাং বনগ্রামের কাঁচাগোল্লার সন্ধান এখন 'যশোহর খুলনার ইতিহাসের' পৃষ্ঠাকেই সুস্বাদু করে রেখেছে। তবে বর্তমানে বনগ্রামের দধি উৎকৃষ্ট এ দাবি রাখে। বনগ্রামের দধি এখন কলিকাতায়ও চালান যাচ্ছে।, চাঁদা গোবরা-পুর, আষাঢ়ুতে এখনও কাঁচাগোল্লার কারিকর দু একজন আছেন।

পাটশিল্প : বনগ্রাম পশ্চিমবঙ্গের পাট উৎপাদন ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আসছে। পাট রপ্তানির বিশেষ কেন্দ্র এই বনগ্রাম বঙ্গ বিভাগের বহু পূর্ব থেকেই। বর্তমানেও সেই সুনামের অধিকারী এই বনগ্রাম। বনগ্রামে পাটের কয়েকটি প্রেস্ ছাড়া পাটশিল্প বলতে কিছু নেই। কিন্তু এখানে এই শিল্প প্রসারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে বলে মনে করি। ইছামতী নদীর তীরে একটা পাটের কল বা 'জুটমিল' স্থাপন করলে এই শিল্পের শিল্পায়িত বস্তুর উৎপাদন ব্যয়ও যথেষ্ট কম হবে বলে দাবি করা যায়। উপরন্তু স্থানীয় অনেক বেকারের কর্মসংস্থানও যে হবে সে কথা উল্লেখ করার কোন অবকাশ থাকে না। সরকারের শুভ ইচ্ছার উপরই বনগ্রামবাসীর শিল্প-

প্রসারের সুযোগ করে দিতে পারে। এই পাটশিল্প স্থাপন হলেই আনুষঙ্গিক বিবিধ শিল্পকেন্দ্র গড়ে ওঠার সুযোগ হবে। আর সেই সঙ্গে বনগ্রামের অনেক বেকারের জীবিকার সংস্থান হবে। পাটকাঠি ও বাঁশের সাহায্যে একটা কাগজের কল চালানও অসম্ভব নয়।

বিড়ি শিল্প: বনগ্রামে পূর্বে বিড়ি শিল্পের এত প্রসার ছিল না। বর্তমানে এই শিল্পের প্রসার ঘটেছে। বৃহদাকারের কয়েকটি কারখানাও হয়েছে। কয়েকশত নারীপুরুষ এই শিল্পে বর্তমানে নিযুক্ত আছেন।

গুড: বনগ্রাম খেজুরের গুড় উৎপাদনে পূর্বের থেকেই খ্যাত। কারণ এই এলাকায় খেজুরের গুড়ের চিনির কারখানা ছিল বিশেষ করে রাণীগঞ্জে (ঘাটবাঁওড)। তাছাডা গোবরডাঙ্গায় চিনি প্রস্তুতের বিরাট কেন্দ্র ছিল। বর্তমানে এই শিল্প নিশ্চিহ্ন হলেও খেজুরের গুড় নলেন পাটালি প্রচুর চালান যায়। এছাডা খেজুর পাতার চাটাই প্রস্তুত হয় এবং চালানও যায়। আখের গুড ও পাটালি এখনও হয় তবে পূর্বাপেক্ষা এই শিল্পের উৎপাদন কমেছে কারণ আখের চাষ এখন কম হচ্ছে এই অঞ্চলে।

ইটের ভাটা: পূর্বে বনগ্রামে একটি মাত্র ইটের ভাটা ছিল এখন ইটের ভাটার সংখ্যা নয় দশটি। বাংলা পাঁজার ইটের ব্যবহার কম ও পাঁজার সংখ্যাও কমেছে। রাণীগঞ্জ টালির প্রচলন হয়েছে ১৯৩০-৩১ খ্রীঃ থেকে। মতিগঞ্জে প্রথম কারখানা স্থাপন করেন বীরেন রায় (কর্মকার)। এখন এই শিল্প সুদূর গ্রাম অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত।

সিনেমা: বনগ্রামে অস্থায়ীভাবে সিনেমা দেখান আরম্ভ হয় ১৯৩৩ সাল থেকে মতিগঞ্জে। তারপর বনগ্রামে বিচালীহাটায় 'হীরামহল' সিনেমা-গৃহ স্থাপিত হয়।, তার কয় বৎসর পরে 'বনগাঁ টকিজ' এখন যার নাম 'বনশ্রী' স্বাধীনতা লাভের পর হয়েছে। অতঃপর 'শ্রীমা' সিনেমাগৃহ প্রতিষ্ঠা হয়। এখন বনগ্রাম মহকুমা শহর ছাড়া চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, গাঁড়াপোতা, গোপালনগর ইত্যাদি শহরেও সিনেমাগৃহ স্থাপিত হয়েছে।

৩৫

বনগ্রাম ঃ সম্পন্ন সংস্কৃতির উত্তরাধিকার

বনগ্রাম আজ দ্বিধাবিভক্ত সুতরাং অতীতদিনে বনগ্রামের যা ব্যাপ্তি ছিল আজ আর তা নেই। তবুও যে অংশটুকু এখন খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত সেই অংশের সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্য নিতান্ত কম নয়।

বনগ্রামের প্রাণস্রোত বহন করে চলেছে ইছামতী ও তার শাখা ও উপনদীগুলি। যার সরস সমৃদ্ধ মাটিতে জন্ম নিয়েছিলেন কবি-সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও সঙ্গীতজ্ঞগণ। বনগ্রামের শ্যামলীমা, পল্লীপ্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য ও মাধুর্যই এসকল কবি ও লেখক সৃষ্টির সহায়তা করেছিল এবং এখনও করে চলেছে একথা বলা অসমীচীন হবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক লেখকদের নাম উল্লেখ করতে গেলেই সর্বাগ্রে নাম করতে হয় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর। তাঁর "স্বর্ণলতা" উপন্যাস তদানীন্তনকালে গ্রাম বাংলার গার্হস্থচিত্র ও তার ব্যথা বেদনার রূপ তুলে ধরেছিল। সেই সময়ই দেখা যায় দীনবন্ধু মিত্রকে, যিনি শুধু নাট্যকারের গৌরবে গৌরবান্বিত নন, তিনি অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত প্রকম্পিত করে তুলেছিলেন। সেই উনবিংশ শতকেই গরীবপুর নিবাসী ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায় সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় চিকিৎসাশাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর 'জর চিকিৎসা' এবং 'ধাত্রী বিদ্যা' গ্রন্থ দু'খানি সে সময় অবহেলিত ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত গ্রামবাসীদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুযোগ এনে দিয়েছিল। যদুনাথ 'ইণ্ডিয়া মিরার' নামে ইংরাজী সংবাদপত্র ও 'সমাজ

ও সাহিত্য' নামে একখানি বাংলা পত্রিকা সম্পাদনা করতেন কলকাতা থেকে। সে যুগে 'সমাজ ও সাহিত্য' একখানি বিখ্যাত সংবাদপত্র ছিল। প্রথম কয়েকটি সংখ্যা যদুনাথ নিজেই সম্পাদনা করেন; তারপর তাঁর মধ্যম পুত্র গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় মাত্র উনিশ বৎসর বয়স থেকেই ঐ পত্রিকা দু'খানি সম্পাদনার ভার নেন। তিনি ঐ পত্রিকা দু'খানি নিজ গ্রাম গরীবপুর থেকে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন এবং গরীবপুরে 'উমা প্রেস' নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। বনগ্রাম মহকুমায় এটিই প্রথম ছাপাখানা। এই ছাপাখানা পরিচালনার জন্য একজন ইংরাজ কর্মচারী ছিলেন। তিনি ঐ গ্রাম থেকেই ছাপাখানাটি পরিচালনা করতেন। গিরিজানাথ একজন খ্যাতিমান প্রেমের কবি হিসাবে তদানীন্তনকালে সমাদৃত হয়েছিলেন। তাঁর লেখা কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'বেলা', 'পরিমল', 'পত্রপুষ্প', 'অর্চন' সুবিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। গিরিজানাথ 'সমাজ ও সাহিত্যের' নাম পরিবর্তন করে 'বার্তাবহ' নামে প্রকাশ করতে থাকেন। এই পত্রিকার গ্রাহক তখনকার কালে চার সহস্রেরও অধিক ছিল। গিরিজানাথের মৃত্যুর পর ১৩৫০ সাল থেকে 'বার্তাবহ' অনাদিনাথ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় রানাঘাট থেকে প্রকাশ হতে থাকে। আজও 'বার্তাবহ' রানাঘাট থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। গিরিজানাথের পৌত্র বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় কৃষি বিশারদ হলেও সাহিত্য অনুরাগী এবং লেখক।

চারুচন্দ্র রায় বৈরামপুর গ্রামের সন্তান। তিনি বনগ্রামে 'পল্লীবার্তা' নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন ১৯০৬ খ্রীঃ। ঐ সময় থেকে 'পল্লীবার্তা' নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তিনি দু'খানি গ্রন্থও প্রকাশ করেন। গ্রন্থ দু'খানির নাম 'নিকার বিবি' ও 'গল্পে তুফান'। চারুচন্দ্রের পুত্র মনোজ রায় ঐ পত্রিকা ও ছাপাখানা স্বনামের সঙ্গেই সম্পাদনা ও পরিচালনা করতে থাকেন। তাঁর মৃত্যুর পর কনিষ্ঠভ্রাতা পঙ্কজকুমার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। হরিপদ মুখোপাধ্যায় বনগ্রামের অন্তর্গত যমুনা তীরে ইছাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বনগ্রামে মুন্সেফ কোর্টে ওকালতি করার কালে তিনি কয়েকখানি নাটক প্রকাশ করেন তার মধ্যে 'রাণী দুর্গাবতী', 'দধীচি', 'রামপ্রসাদ' নাটক কয়খানি তদানীন্তনকালে অভিনয়প্রিয় জনগণের মনের খোরাক যোগাত। সে সময় কলিকাতার মনোমোহন থিয়েটারে দীর্ঘ দিন তাঁর নাটক অভিনয় হয়েছে। হরিপদ মুখোপাধ্যায়-এর তৃতীয় পুত্র বর্তমানে খ্যাতিমান লেখক মণিশংকর

মুখোপাধ্যায় যিনি সাহিত্য জগতে 'শংকর' নামে খ্যাত। হরিপদ মুখোপাধ্যায় একজন সুঅভিনেতাও ছিলেন।

হরিপদ মুখোপাধ্যায়-এর সমসাময়িক কালে বনগ্রামে যাঁরা সাহিত্য-চর্চা করতেন এবং সংস্কৃতির দীপ্তি উজ্জ্বল রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে গরীবপুরের বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সুখপুকুরিয়ার প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, বনগ্রামের জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত এবং মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর নাম উল্লেখ করা যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক ও ইতিহাস গবেষক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নাম জগৎজোড়া। তাঁর পৈতৃক ভিটা ছয়ঘরিয়ায় দৃশ্যমান। তাঁর সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু বলা এক্ষেত্রে প্রয়োজনহীন।

বনগ্রামে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত থাকার কালে রমেশচন্দ্র দত্ত বনগ্রামের সরকারী আবাসের বকুলতলায় বসে রচনা করেছিলেন তাঁর 'বঙ্গ বিজেতা' উপন্যাস। যার পটভূমি বনগ্রামের চৌবেড়িয়া গ্রামের চতুর্বেষ্টিত দুর্গ।

বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যশোহর খুলনার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রাহক। যশোহর খুলনার ইতিহাসের লেখক সতীশচন্দ্র মিত্র চারুচন্দ্রের নিকট থেকে বহু ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর ইতিহাসে সংযোজন করেন।

গৈপুর গ্রামের সন্তান প্রখ্যাত কবি অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বনগ্রামের স্কুলে অধ্যয়নকালেই কবিতা রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন।

ছুটগানের বিখ্যাত কবি ও সঙ্গীতকার মোহনদাস বৈরাগী (সরকার) গোপালনগরে জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি তাঁর আবির্ভাব। তাঁর সুমধুর সঙ্গীত, রসিক লোকের অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বনগ্রামের তথা বাংলা সাহিত্যের নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটান। তাঁর কথা—সাহিত্য হচ্ছে The prayer, the music, the song of the human soul'.—এ প্রেরণায় তাঁর জীবিতাবস্থায় অনেকেই কাব্য সৃষ্টিতে রত হন। সেই বৃহৎ বটচ্ছায়ায় অনেক তরুণ কবি ও সাহিত্যিকের পরিচয় পাওয়া যায়। বিভূতিভূষণের মিতা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় চালকী গ্রামের সন্তান। তিনি দু'খানি ছোটগল্পের বই ঐ সময় উপহার দেন 'অক্রুর সংবাদ' ও 'স্বরসপ্তক'।

বিভূতিভূষণের লিচুতলা ক্লাবের লিচুগাছটি আজও আছে কিন্তু তার তলায় বসে যাঁরা সাহিত্য আলোচনা করতেন তারা ছিলেন মন্মথনাথ

চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মনোজ রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। তাঁদের কেউই আজ ইহলোকে নেই। এই সময় অর্থাৎ বিংশ শতকের তৃতীয় চতুর্থ দশকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে বনগ্রামে জোয়ার এসেছিল। পূর্ণিমা সম্মিলন নামে বনগ্রামের সাহিত্যসেবীরা এক চক্রে সমবেত হতেন; তাব স্থান নির্দিষ্ট ছিল না। ঐ চক্রেই ঠিক করা হত পববর্তী চক্র কোথায় বসবে। বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ চক্রের সভাপতি ছিলেন। বিভূতিভূষণ ও তাঁর মিতা বিভূতি, মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়ও ঐ চক্রে যোগদান করতেন। অনেক তরুণ লেখক ঐ চক্রে তাঁদের লেখাপাঠ করে শোনাতেন। দুঃখের বিষয় চক্রের অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ণের পাল্লা ক্রমশ ভারি হতে থাকায় পূর্ণিমা সম্মিলন অমাবস্যাব অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

এই সময় বনগ্রামে কয়েকটি সাহিত্য সভা হয়। ১৯৩৮ সালে বিভূতিভূষণকে মানপত্র দেওযা হয় বনগ্রাম টাউন হলে। এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সজনীকান্ত দাশ। ১৯৪০ সালে মার্চ মাসে মিজান পার্কে (বর্তমানে যেখানে জীবনরতন হাসপাতাল) কাজী নজরুল আসেন বনগ্রামবাসীর আমন্ত্রণে। তাঁকে ঐ সভায় সম্বর্দ্ধনা জানান হয়। নজরুল বনগ্রামেই বোধহয় তাঁর শেষ ভাষণ দেন। ১৯৪১ সালে বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের হল ঘরে হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে এক মহতী সাহিত্য সভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন তখনকার দিনের কয়েকজন তরুণ সাহিত্য প্রেমিক। তার মধ্যে গোপালচন্দ্র সাধু, কৃষ্ণপদ মুখোপাধ্যায়, প্রভাসচন্দ্র সাহা, সুধীররঞ্জন চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ করা যায়। তিনের দশকে জাগরণ প্রেস থেকে 'জাগরণ' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হত লীগ আমলে, সম্পাদক ফজলুর রহমান। চতুর্থ দশকের তরুণ লেখকদের মধ্যে শিমুলতলার অধিবাসী শিবপ্রসাদ ঘটকের নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি 'শেষ প্রতিশ্রুতি', 'মণিশিখা' 'শর্বরী' নামে পর পর তিনখানি উপন্যাস উপহাব দেন। সহসা পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর লেখনী স্তব্ধ হয়ে যায়। ঐ সময় এই গ্রন্থকারেরও একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় "দুঃসহ পাঁচালী" নামে। অন্যান্যদের মধ্যে নির্মল আচার্যের নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি কয়েকখানি গল্প, উপন্যাস, নাটক ও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। 'তৃতীয় মেরু' তার দীর্ঘ উপন্যাস। এছাড়া 'সছিদ্র জল', 'পাড়োয়ানপাড়া রোড' 'বিলচরের নীল হাঁস' ইত্যাদি প্রায় দশখানি উপন্যাস সাহিত্যের এক দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

পঞ্চম দশকের একজন শক্তিমান যাত্রা পালাকার কানাইলাল নাথ। যাত্রা জগতে নাট্যকার হিসাবে তিনি বিশেষ যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছেন।

দৈনন্দিন সংবাদপত্রের সম্পাদক বিশ্বনাথ মৈত্র কয়েকখানি কাব্য ও উপন্যাস উপহার দিয়েছেন ঐ সময়ের মধ্যে। বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত একজন শক্তিমান লেখক, সমালোচক ও কবি। তাঁর একাধিক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে।

পঞ্চম দশকের লেখকদের মধ্যে আরও কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শম্ভুদাস ভাবতী, গোপালচন্দ্র সাধু, অনিলকুমার সাধু, গোবিন্দ হালদার, নৃসিংহ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিরা বনগ্রামের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে শ্রীমণ্ডিত করেছেন।

বিংশ শতকেব ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকের সাহিত্যিক ও কবি এবং তাঁদের সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার নাম বা সংখ্যা সীমিত লেখায় স্থান সঙ্কুলান সম্ভব নয়। তবুও বিভূতিভূষণের আবির্ভাবের পূর্বে ও পরে বনগ্রামে যে সকল পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে বা হয়েছে তার তালিকাই বনগ্রামে সাহিত্য চর্চার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেয। বনগ্রামের মাটিতে কাব্য সাহিত্য প্রকাশিত হযেছে অনেক। অনেকে সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। কিন্তু যাঁরা পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন তাঁদেব সংখ্যা নগণ্য নয়। সময় সময একই সঙ্গে একাধিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ লাভ করেছে। এপর্যন্ত শতাধিক পত্র-পত্রিকার সন্ধান পাওযা যায। এর মধ্যে অনেক পত্রিকা শৈশবে, অনেকগুলি আবার কৈশোবেই বিদায় নিযেছে। তৎসত্ত্বেও সাহিত্যিক ও কবি সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঐ পত্রিকাগুলিব অবদান যে অপরিসীম তা অস্বীকার করা যায় না। সম্ভবতঃ পঞ্চাশ দশকেব শেষ দিকে দেবপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 'আজকাল' পত্রিকাটি লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে নূতন সম্ভাবনার সূচনা করে।

বর্তমানে বনগ্রাম থেকে যে কয়খানি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে, সেগুলির মধ্যে 'শিস' : স্বপন চক্রবর্তী ও সমর মুখোপাধ্যায়, 'সীমান্ত সাহিত্য' : কার্তিক মোদক, 'রক্ত স্বাক্ষর' : নির্মল আচার্য, 'মেঘনা' : কান্তিময় ভট্টাচার্য ও অশোক আচার্য, 'সাহিত্য-সংলাপ' : অরুণ রায় সরস্বতী, 'উদাসী দুর্গ' : অসিত সাহা, 'পণ' : মণি মণ্ডল, নাম উল্লেখ করা যায। এ ছাড়া সংবাদ সাহিত্যে 'দৈনন্দিন' : বিশ্বনাথ মৈত্র, 'বনগাঁ বার্তা' : উদয়ভানু সিংহ, 'বনগাঁ হিতৈষী' : অনিল-কুমার চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদির নাম উল্লেখ করার মত। এগুলির মধ্যে

'শিস' মফঃস্বল শহর থেকে যেভাবে প্রকাশ হচ্ছে তা কলিকাতার অনেক প্রথম শ্রেণীর পত্রিকাগুলির সমকক্ষ বলে গুণীজনের নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছে।

বর্তমানে এই সব পত্রিকায় লেখকদের নামও কিছু উল্লেখ করতে হয়। অবশ্য বিশেষ বিবরণের স্থান সীমিত। লেখকদের মধ্যে প্রবীণ লেখক নির্মল আচার্য, অনিল চৌধুরী, বিশ্বনাথ মৈত্র, বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত, শংখদাস ভারতী, অনিল সাধু, এছাড়া দেবপ্রসাদ ঘোষ, কার্তিক মোদক, ক্ষিতীশ বিশ্বাস, রাখাল বিশ্বাস, প্রণব মুখোপাধ্যায়, বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর মুখোপাধ্যায়, স্বপন চক্রবর্তী, চন্দন ঘোষ, অমিত চক্রবর্তী, অশোক আচার্য, গৌর চক্রবর্তী, সত্য দেবনাথ, বুদ্ধদেব দে বিশ্বাস, অমিয় রায় সরস্বতী, মলয় গোস্বামী, সঞ্জয় মিত্র, জ্যোতির্ময় ঘোষ, জলধি হালদার, কান্তিময় ভট্টাচার্য, নীলাদ্রি বিশ্বাস, কৃষ্ণ মণ্ডল, রণবীর দত্ত, আশুতোষ বিশ্বাস, মোহন ঘোষ, জগন্নাথ লালা প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অনেকেই আছেন যাঁরা এইসব পত্র-পত্রিকার লেখক। নামী লেখকরাও ঐ সব পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করে থাকেন। অনিয়মিত হলেও অমূল্য চক্রবর্তী, অজিত বসু, পরিমল ঘোষ, সুধাংশু বিশ্বাসের নামও উল্লেখযোগ্য।

বনগ্রামের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কিছু পরিচয় প্রয়োজন। বনগ্রাম মহকুমার সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা তার নাট্য আন্দোলন ও সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায়। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে মধুকান (কিন্নর) ঢপ ও টপ্পা সঙ্গীত এবং মোহনদাস বৈরাগী ছুটগানে সারা বাংলা মাতিয়ে তুলেছিলেন। বিংশ শতকের পূর্বে বনগ্রামের অন্তর্গত বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছয়ঘরিয়া, গোবরাপুর, ইছাপুর, গরীবপুর প্রভৃতি গ্রামে নাট্য সংস্থা ছিল। ঐ গ্রামগুলির প্রায় সবগুলিতেই থিয়েটার করার মত ষ্টেজ, দৃশ্যপট এবং শ্রোতাদের বসার ব্যবস্থা ছিল। ১৯২২-২৩ সাল থেকেই বনগ্রামের উকিল ও মোক্তারদের 'ড্রামেটিক ক্লাব' ছিল। তখন পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক তাঁরা অভিনয় করতেন। 'ভীষ্ম', 'বিল্বমঙ্গল', 'দধীচি', 'রাণী দুর্গাবতী', 'দেবলা দেবী' প্রভৃতি। তার পরবর্তীকালে বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় 'বনগ্রাম ড্রামেটিক ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরাও পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক অভিনয় করতেন। বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও বসন্ত মুখোপাধ্যায় শক্তিশালী অভিনেতা ছিলেন।

এরপর বিংশ শতকের দুই দশকে প্রতিষ্ঠা হয় 'বাণী নাট্য সমাজ'। সতীশচন্দ্র রায়, অনিলভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅন্নদা নাথ, অমরেশ সিংহ,

যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, শ্রীকালীপদ সাধু, শ্রীবিনোদবিহারী ঘোষাল ঐ সংস্থার শক্তিশালী অভিনেতা ছিলেন। সতীশ রায় ঐ সংস্থার প্রাণপুরুষ এবং তাঁর মত নাট্যামোদী দুর্লভ। তিনি নিজেই দৃশ্যপট প্রস্তুত ও অঙ্কন করতে পারতেন। সাজ পোষাক পরানো, মেক-আপ দেওয়ারও তাঁর ছিল অদ্ভুত দক্ষতা। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ঐ সংস্থা একের পর এক নাটক উপহার দিয়েছে। তাদের প্রথম সামাজিক নাটক "পথের শেষে" সাফল্যমণ্ডিত নাটক।

চার-এর দশকে আর একটি নাট্য সংস্থা গড়ে ওঠে 'বনগ্রাম আর্ট প্লেয়ার্স' নামে। এই নাট্যসংস্থার উদ্যোক্তা ও অভিনেতাদের মধ্যে উদয়ইন্দু তরফদার, স্বয়ং লেখক, ডাঃ অমর চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, ভাগবত বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস উকিল, নির্মল নাথ, কালীসাধন বন্দ্যো-পাধ্যায়, সত্যেন মুখোপাধ্যায় (সতু), প্রভাস সাহা, সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরাই বনগ্রামে প্রথম প্রগতিশীল নাটক অভিনয় করেন হীরামহল প্রেক্ষাগৃহে টিকিট করে। প্রথম প্রথম নারীর ভূমিকা পুরুষরাই করতেন পরে নারীর ভূমিকা কলিকাতা থেকে অভিনেত্রী এনে করান হ'ত।

১৯৪৩-৪৪ সালে বিশ্বযুদ্ধের সময় অজিত গাঙ্গুলীর প্রেরণায় যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রচিত নাটক বনগ্রাম, গোপালনগর, চাঁদপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলের হাটে হাটে হাট ভাঙার পর অভিনয় করা হত। যাঁরা অভিনয় করতেন তাঁদের মধ্যে বর্তমান গ্রন্থের লেখক, শান্তিসুধা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল চক্রবর্তী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ধরণের মুক্তমঞ্চাভিনয় এখন বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু তখনকার দিনে এ ধরণের নাটক অভিনয় করা নিষিদ্ধ ছিল। তবুও তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গণ-আন্দোলন ও চেতনা জাগ্রত করার প্রয়াস চালিয়ে গেছেন।

নাট্য আন্দোলন ও নাট্যাভিনয় ক্ষেত্রে 'সাধুজন পাঠাগারের' ও 'সাধু সংস্কৃতি সংঘের' অবদান আছে। তাঁরা একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। তাঁরাই প্রথম বনগ্রামের স্থানীয় মহিলা শিল্পী দিয়ে নারী চরিত্র অভিনয় করান। সাধুজন পাঠাগার সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্রস্থল বললে অত্যুক্তি হবে না। বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি এই পাঠাগারে পদার্পণ করেছেন ও করে থাকেন।

বিংশ শতকের চারের দশকে বনগ্রামে আশপাশের বিভিন্ন পল্লীতে নাট্য সংস্থা গড়ে ওঠে। তন্মধ্যে কোড়ারবাগান, শিমূলতলা উন্নয়ন সমিতির

পরিচালনায় 'শিমুলতলা ড্রামেটিক ক্লাব' কয়েকখানি নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। অভিনেতাদের মধ্যে সুশীল ঘোষ, বর্তমান গ্রন্থকার, সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অমিয় মুখোপাধ্যায়, রবি গাঙ্গুলী, চিত্ত মুখোপাধ্যায়-এর নাম উল্লেখ করা যায়।

'কোড়ারবাগান ড্রামেটিক ক্লাবে' যাঁরা অভিনয় করতেন তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায, প্রফুল্ল গাঙ্গুলী, শান্তিসুধা বন্দ্যোপাধ্যায, অন্নদা নাথ প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। এঁদের উত্তরসূরী হিসাবে পঞ্চানন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতির নামও স্মরণীয়। পরবর্তীকালে 'বান্ধব নাট্য সমাজ'ই আজকের নাট্যকার কানাই নাথকে স্বনামধন্য করেছে। সত্যনারায়ণ সিংহ, কালিদাস মুখার্জী, সুনীল বিশ্বাস কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনযের প্রমাণ রেখেছেন।

বনগ্রামে একটি পাবলিক ষ্টেজের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। সেই অভাব দূর করবার জন্য যাঁরা চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উদয়ইন্দু তরফদার, সতীশ রায, স্বযং লেথক, সত্যেন মুখোপাধ্যায় (সতু) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিজেদের সামান্য অর্থ কায়িকশ্রম ও সামান্য অর্থের উপর নির্ভর করে তাঁরা একটি পাকা ষ্টেজ নির্মাণ করেন। সেই ষ্টেজে কয়েকখানি নাটক অভিনয করা হয়। পরবর্তীকালে বঙ্গ বিভাগের পর সেই ষ্টেজ ভেঙ্গে তদানীন্তন নেতৃবর্গ মহকুমা শাসক শ্যামসুন্দর দত্তের আনুকূল্যে বর্তমান 'ললিতমোহন বাণী ভবনের' সৃষ্টি করেন। ষ্টেজের অভাব যেমন ছিল তেমনি থাকল, আর যাঁরা তাঁদের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন তাঁরা বাণী ভবনের তলায় তলিয়ে গেলেন। আজ উদযইন্দু তরফদার, সতীশ রায় নেই, তাঁদের লোকে ভুলেছে ইতিহাসও হারিয়ে গেছে।

ছয়-এর দশকে আর একটি নাট্য সংস্থা কযেকখানি নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। এই সংস্থাটির নাম "ফাল্গুনী"। এই সংস্থার সংগঠক হিসাবে বিজয় বিশ্বাসের (আমু) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সংস্থার অভিনেতাদের মধ্যে সংগঠক ছাড়াও ডাঃ শ্রীকান্ত দাস, অমিয় মুখোপাধ্যায়, শক্তি মিত্র, পল্লব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিরা বিশিষ্ট অভিনয়ের উৎস। অবশ্য বামপন্থী চেতনায় উদ্বুদ্ধ সাংস্কৃতিক সংস্থা 'সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'ও সীমিত সংখ্যক গণনাট্য প্রযোজনার নজীর রেখেছে। যাত্রা ক্ষেত্রেও বনগ্রাম পশ্চাদ্‌পদ ছিল না। প্রতি বৎসর কলিকাতার বিভিন্ন নামকরা অপেরা পার্টি বনগ্রামে অভিনয় করতে আসত। বনগ্রাম,

গোপালনগর 'ট' বাজারে এই অনুষ্ঠান হত। এর ব্যয়ভার বনগ্রামের ব্যবসায়ীগোষ্ঠী বহন করতেন। সারাবৎসর পাইকারী খরিদ্দারের নিকট থেকে ঈশ্বর বৃত্তি নামে অর্থ সংগ্রহ করা হত, তা দিয়েই ঐ ব্যয়ভার বহন করা হত।

যাত্রার দলের উল্লেখ করতে গেলে প্রথমেই নাম করতে হয় "মতিগঞ্জ বয়েজ অপেরা পার্টির"। কয়েকজন তরুণ এই দলের স্রষ্টা। বিংশ শতকের তিনের দশকে এই অপেরা পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। দলের অভিনেতা ও প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে হাজরাকালী নাথ, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি পরামাণিক, ভীমদাস-এর নাম উল্লেখ করা যায়। এই দলের শিক্ষক ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী।

'পূর্বপাড়া যাত্রাপার্টি' সকল যাত্রাপার্টির মধ্যে প্রাচীন। বিংশ শতকের প্রথম দিকে এই পার্টির প্রতিষ্ঠা। ১৯৫০ সালে এই পার্টি ভেঙ্গে 'বনগ্রাম বাজার যাত্রাপার্টি' নাম গ্রহণ করে। এর অভিনেতার অনেকেই 'পূর্বপাড়া যাত্রাপার্টি'র অভিনেতাদের বংশধর। পশুপতি কুণ্ডু, কাটু মহারাজ, সত্যনারায়ণ সিংহ, সুকুমার মুখার্জী প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। সতীশ আঢ্য এই পার্টির শিক্ষক ও পরিচালকদের অন্যতম ছিলেন। গোবরাপুরের 'সতীশ অপেরা পার্টি' ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত সুনামের সঙ্গে পালাগান করেছেন দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরে। এ যাত্রাপার্টির নিজস্ব সাজ-পোষাক যা প্রয়োজন সবই ছিল।

ভবানীপুর কৃষ্ণযাত্রার দলের নামও উল্লেখযোগ্য। হাজরাকালী গাইন এই দলের প্রতিষ্ঠাতা। আজও এ দলটি টিকে আছে একক প্রচেষ্টায়।

এছাড়া ঢপ, কীর্ত্তন, কবিগান, রামায়ণ গান, মনসার ভাসান ইত্যাদির দল অনেক গ্রামেই ছিল। এখনও অনেক গ্রামে ঐ সকল দলের অস্তিত্ব দেখা যায়।

উৎসব অনুষ্ঠানের দিক থেকে বনগ্রামের কৃষকদেরও বিশেষ কয়েকটি উৎসব ছিল যাতে সাংস্কৃতিক চেতনার রূপ সুস্পষ্ট। 'স্যাঁক কল' বা 'ফলুই' একটি বিশেষ উৎসব। অগ্রহায়ণ থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাড়ি বাড়ি গ্রাম্য নিরক্ষর কবির রচিত গান গাইত তরুণ সমাজ। এ কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। সামাজিক ন্যায় অন্যায় নিয়ে রচিত শ্লেষ ও সমালোচনার গান। 'ডাক সংক্রান্তি' আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হত। আজ 'স্যাঁক কল' উৎসব আর দেখা যায় না। 'ডাক সংক্রান্তি' থাকলেও তার সে উৎসাহ উদ্দীপনা অন্তর্হিত। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও স্তব্ধ।

এ্যামেচার বা সৌখীন নাট্য সংস্থার প্রথম ও প্রধান অন্তরায় আর্থিক সমস্যা। সাধারণত সংস্থার অভিনেতারা তাঁদের নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে অভিনয়-এর ব্যবস্থা করতেন। সর্বসাধারণের আর্থিক সাহায্য কোথাও কোথাও মিললেও তা যৎসামান্য। এই সঙ্কটের জন্যও অনেক নাট্য সংস্থা বন্ধ হয়ে যায়। ছয়ঘরিয়া, গোবরাপুর, গবীবপুব, ইছাপুর প্রভৃতি গ্রামের নাট্য সংস্থাগুলিব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ঐ গ্রামের জমিদার বা সঙ্গতিশালী ব্যক্তি। তাঁদের আর্থিক সচ্ছলতায় ক্রমশ ভাঁটা পড়তে থাকায় নাট্য সংস্থাগুলি টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। উপরন্তু মধ্যবিত্ত যাঁরা, তাঁরা রুজি-রোজগারেব তাগিদে শহরমুখী হয়ে পড়েন, যার ফলে গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ অনেকের ছিন্ন হয়ে যায়। এ কারণেও গ্রাম্য সমিতিগুলি ছন্নছাড়া হয়ে ভেঙ্গে যায়। আবার অনেক ক্লাবে মন মত পার্টের জন্য নিজেদের মনোমালিন্যেও ক্লাব ভেঙে যায়।

বঙ্গ বিভাগের ফলে বনগ্রামের সমাজ ব্যবস্থায় একটা প্রবল পরিবর্তন ঘটল। রাজনৈতিক মতাদর্শও অনেক সংস্থাকে নানা দলে বিভক্ত করে দিল। ফলে অনেক সংস্থাই বন্ধ হয়ে গেল। এরপর রুচির পরিবর্তনও একটা কারন হিসাবে উল্লেখ করা যায়। কিশোর ও যুবক যারা তারা এই সকল সংস্থার প্রাণশক্তি। কিন্তু তারা তাদের রুচির পরিবর্তন ঘটালেন। নিজেরা অভিনয় করার থেকে বাইরের থেকে নামী শিল্পীদেব এনে গান বাজনা করান (ফাংসান) লাভজনক বলে মনে করলেন। সে কারণে দেখা যায় প্রায় নামকরা ক্লাবগুলিই বার্ষিক উৎসব পালন করে হয় যাত্রাদল কলিকাতার থেকে এনে নয়ত কলিকাতার নামী শিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশন করে। এখানে টিকিট বিক্রি করা হয় লাভের শর্তে। অনেকটা ব্যবসায়ী মনোভাব নিয়ে।

বর্তমানে সরকারী আমলা, হাসপাতালের কর্মচারীরা মাঝে মাঝে থিয়েটার করে তাঁদেব বার্ষিক উৎসব পালন করেন। স্থানীয় যুবকদের মধ্যে আর সে অভিনয় করার স্পৃহা বড় একটা দেখা যাচ্ছে না।

বর্তমানে কয়েকটি যুব সংগঠন দেখা যায় এবং তাতে আশার আলো দেখা যাচ্ছে। গণসঙ্গীত ও গণনাট্য পরিবেশন তাঁরা করে থাকেন। এদের মধ্যে "সুকান্ত স্মৃতি শিল্পী সংস্থা" "ঐকতান শিল্পী সংস্থা" (হেলেঞ্চা), "ঢাকুরিয়া যুব সংস্থা" ও 'নাট্য সংঘের' নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

বহুদিনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী এই মহকুমা কোন কোন সময়ে সঠিক নির্ণয়ের পাদপীঠে হয়ত স্বীয় নাম সংযুক্ত করতে পারেনি, হয়তবা গ্রামীণ সাংস্কৃতিক অবজ্ঞাসূচক মন্দবাক্যকে ভূষণ হিসাবে কণ্ঠে ধারণ করেছে, কিংবা নগরকেন্দ্রীকতার দুঃসহ জোয়ারের কাছে লুপ্ত তাম্রলিপ্তের মত ইতিহাস

থেকেই গেছে। তবুও ইছামতীর পাললে উর্বর বনগ্রাম চিরকাল দিয়েছে ফসল, সংস্কৃতির বাগিচায় এনেছে সহস্র কোরক। আকাশের অনন্ত গ্রহতারার মত দিগদর্শনে চিহ্নিত হননি কেউ, আবার ভোরের শিউলীর সতেজ ঘ্রাণে মুখর করেছেন কেউ বৃদ্ধ শিল্প. সাহিত্য, সংস্কৃতির দেউল। এ বহমান গতির সর্বজন স্বীকৃত, নন্দিত স্মৃতি সুধার পাত্রখানি আজও সুধীজনের ঈর্ষার বিষয়, অথবা গ্রাম্য ফুল লতা পাতায় নিঃশব্দে ঝরে যেতেই এমন আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক প্রয়াসের মহাকালের অভিষেক। তবুও এক সম্পন্ন সাংস্কৃতিক বৈকুণ্ঠ হিসাবে মহকুমা বনগ্রাম চিহ্নিত বহুকাল ধরে। এর প্রকৃতির সালংকারা বৈভব অথবা নীল ইছামতীর মতই উত্তরাধিকার সূত্রেই পুষ্পিত এখানকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

৩৬

নদী বাঁওড় ও মৎস্যজীবী

হিন্দু যুগে অর্থাৎ ভারতের বাহিরের কোন জাতির এ দেশে রাজত্ব করার পূর্বে আমাদের দেশের নদীগুলি বা অন্য স্বাভাবিক জলাগুলি কার মালিকানার অধীনে ছিল? নিশ্চয় এ প্রশ্ন অবাস্তব। কারণ এক কথায়, যে রাজার রাজ্যের মধ্যে যতটুকু, ততটুকু তাঁর অধীনে ছিল। কিন্তু জগতে সকল জিনিষেরই তো ক্ষয় হয়, বৃদ্ধি হয় বা যে কোন পরিবর্তন হয়। এ ক্ষেত্রে নদীগুলির যে পরিবর্তন ঘটত তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কার ছিল? এ প্রশ্ন একটু জটিল। কারণ তখন কোন নদীর পরিবর্তন স্বাভাবিক কারণেই হতে পারত। প্রায়ই নদীর খাত পরিবর্তনের প্রয়োজন হত, এখনও অনেক নদীর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। তার ফলে প্রাচীন অবস্থানে নদী অনেক ক্ষেত্রে তার চিহ্ন রেখে যাচ্ছে। যাকে এখন আমরা বাঁওড় বলে থাকি ভৌগোলিক অর্থ তার যাই হোক না কেন। নদী বা বাঁওড়ের মালিকানা যার থাকুক না কেন রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল তীরস্থ অধিবাসীদের। যারা তীরে বাস করতেন, নদী বা বাঁওড়ের জলই পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করতেন।

বর্তমানে সারা ভারত জুড়ে নদী সঙ্কট দেখা দিতে চলেছে। কারণ অবশ্য তার যথেষ্ট আছে। উত্তর ভারতে গঙ্গা ও তার উপনদীগুলি শাখা নদীগুলিকে জল যোগান দিয়ে আসছে। গঙ্গাকে এমন একটা নদী বলা যায় যা উত্তর ভারতের মাতৃসমা। সেই গঙ্গার সঙ্কটই অন্যান্য নদীর সঙ্কট এনেছে। আজ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে

গঙ্গার উৎসমুখে যে তুষার সঞ্চিত হত এখন তার চেয়ে অনেক কম তুষার সঞ্চিত হয়। সুতরাং গঙ্গার উৎস থেকেই জলের যোগান কম হচ্ছে। যমুনা ও অন্যান্য উপনদীগুলির দশাও ঐ একই। হিমালয়ের হিমানীপ্রবাহ কমে আসছে, দ্রুত না হলেও সুদূর ভবিষ্যতে যদি এমন চলতে থাকে তবে তখন হয়ত ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। উপরন্তু উৎসমুখ থেকে নানা উন্নয়নমূলক কাজে গঙ্গা ও তার জল নানা পদ্ধতিতে কাজে লাগান হচ্ছে। যেমন গতি ঘুরিয়ে কৃত্রিম প্রবাহ সৃষ্টি করা হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য, উপরন্তু বহু খাল কাটা হয়েছে সেচের সুবিধার জন্য উত্তরপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে। সেখানেও গঙ্গাকে প্রচুর জল যোগান দিয়ে তবে আসতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের দিকে। স্বাভাবিক কারণেই এই সকল বাধায় তার স্রোত হয়ে আসছে মন্দীভূত, জল প্রবাহও হয়ে আসছে কম। ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে জুটছে বালি আর পলি। মন্দীভূত স্রোতের জন্য গঙ্গাবক্ষে দেখা দিচ্ছে বড় বড় দ্বীপ সদৃশ চড়া। উপরন্তু গঙ্গা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের মুখে হচ্ছে দ্বিধাবিভক্ত। প্রবল ভাগটিই পদ্মা নাম নিয়ে বাংলাদেশে ঢুকল আর দুর্বল ভাগটা ভাগীরথী নাম নিয়ে ঢুকল পশ্চিমবঙ্গে। এই ভাগীরথী যার নিজের শক্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে গতিপথের মাঝেই, সেই ভাগীরথীর থেকে যে সকল শাখানদী বের হয়েছিল তাদের আজ অবস্থা কি! রুগ্ন জরাজীর্ণ জননীর স্তনদুগ্ধপায়ী অপুষ্ট রিকেট ব্যাধিগ্রস্ত শিশুর মত নয় কি? মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর অংশে ফারাক্কা বাঁধ, সেই ফারাক্কার উদ্দেশ্য ও কার্যে অনেক ফারাক সৃষ্টি হয়েছে। গঙ্গার স্রোত বাড়ালে কি জলপ্রবাহ বৃদ্ধি করলেই গঙ্গা এখন এমন একটা কিছু সৃষ্টি করবে যাতে সকল উদ্দেশ্য সাধন হতে পারে! গঙ্গার গর্ভ সঞ্চিত পলি ও বালিতে ভরাট, আর তা এমন দৃঢ় যে স্রোতের বেগে ধুয়ে নিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং ভাগীরথীর পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশমুখ রুদ্ধ বলা চলে।

মুর্শিদাবাদের লালবাগের বহু প্রাসাদ আজ ভাগীরথীর গর্ভে। তারই ওপর জমেছে বালি আর পলি। সুতরাং বাঁধ দিয়ে অধিক জল প্রবেশ করলেই, সে প্রবাহে গঙ্গাগর্ভ গভীর হওয়া সহজ হবে? বরং ঐ খানেই গঙ্গার স্রোতের প্রবাহ মন্দীভূত হয়ে আসছে যার ফলে ভাগীরথী তার শাখা নদীগুলিকে জলের যোগান দিতে পারছে না। সে কারণেই শাখানদী ও প্রশাখানদী কোনটা একেবারে শুষ্ক হয়ে গিয়েছে, কোনটার হৃদ্‌স্পন্দন স্তব্ধ। আবার কোনটা কোন প্রকারে তার শীর্ণ কায়া ধরে কোন রকমে টিকে আছে।

বনগ্রাম মহকুমার ইছামতী এই রকমই একটা প্রশাখা নদী, যার সৃষ্টি পদ্মার শাখা নদী মাথাভাঙ্গা থেকে। মাথাভাঙ্গা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একভাগে চূর্ণী নামে রাণাঘাটের নীচ দিয়ে গিয়ে হুগলী বা ভাগীরথী নদীতে মিশেছে, আর একভাগ ইছামতী বনগ্রাম মহকুমায় প্রবেশ করেছে। এই প্রবেশ-মুখেরই মাঝ দিয়ে রেলের সেতু নির্ম্মাণকালে পাথর ফেলা হযেছিল যার ফলে রেলসেতুর উত্তর দিকের নদীর খাত ভবাট হয়ে গিয়েছে। গড়ে প্রায় তিন মাঁইল ইছামতীর কোন জলপ্রবাহ নেই। কোথাও নদীগর্ভেই চাষ হচ্ছে। ইছামতীর যা গতিশীলতা দেখা যায়, তা সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার চাপে ও টানে। সে কারণে ইছামতী প্রতিবর্ষে উভয় তীর দু তিন হাত করে সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এখন ইছামতীর শাখাগুলির দুরবস্থা যে কতখানি তা অনুমান করা কি কঠিন? ইছামতীর এক শাখা বেত্রবতী বা বেতনা এখন শুষ্ক। বাগদায গেলেই দেখা যাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়েছে এই নদী। আল দিযে পুকুর কাটা হযেছে নদীগর্ভে। আর কলারোয়ার (বাংলাদেশ) এখনও এর ঘাটে নৌকা বাঁধা থাকে। তার পরই কোদলা। আষাঢ়ে ওখানে কিছু জল দেখা যাবে। স্রোতহীন নদী এর উপরদিকে পাঁক আর পানায ঢাকা। কোদলা আবার দক্ষিণে এসে দুইভাগে বিভক্ত হযেছে নাওভাঙ্গা আর হাঁকোর নামে। হরিদাসপুরে দেখা যাবে নাওভাঙ্গার নাভিশ্বাস উঠেছে আর জযন্তীপুরে দেখা যাবে হাঁকোর। কিন্তু এখন সে নদী কোথায়। নদী খুঁজতে হবে পাটক্ষেত ও কলাবাগানের মধ্যে।

এর পবেই বলব যমুনা নদীর কথা। যে নদী সর্পিল গতিতে নদীয়া, চব্বিশ পরগণার বহু গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে। যমুনা, গঙ্গার শাখা নদী। ত্রিবেণী, যাকে মুক্তবেণী বলা হয় সেখানে ভাগীরথী, সরস্বতী—আর যমুনা ত্রিধা-বিভক্ত হয়েছে। চৌবেড়িয়া ও নিমতলার সংযোগ রক্ষা করাতে উখডা সডকে একটা সামান্য সাঁকো তৈরী করেই কাজ মিটে গেছে। গাইঘাটায যমুনার অস্তিত্ব আছে মনে হয়। গোবরডাঙ্গার স্রোত ওঠা নামা করে, কিন্তু সে স্রোত সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার।

এছাডা যে কটা নদী আছে তার মধ্যে মরালীর কথা বলা যায়। গতিবেগ ধীরে ধীরে হারিয়ে যাওয়ার পথে। চাকদহের হিংনাড়া, শ্রীনগর, নিশ্চিন্দিপুর গেলেই দেখা যাবে মরালীর মরাল গতি কোথায় হারিয়ে গেছে।

আর একটি নদী যেটি এখন এই মহকুমার উত্তরাঞ্চল স্পর্শ করেছে সামান্য কিছু পথ, তার নাম কপোতাক্ষী নদী। ভৈরব নদ থেকে এর

উৎপত্তি। এ নদীর যেটুকু বনগ্রামের ভাগ্যে পড়েছে সেটুকু পাঁক, বোদ আর পানা।—স্রোতহীন।

ইছামতীর আর একটি শাখা নদী ট্যাংরা। দীঘাড়ীর কাছ থেকে বের হয়ে দক্ষিণে সাতাশীর কাছে যমুনা নদীতে মিশেছে। আর একটি নদী ট্যাংরা থেকে বের হয়ে শিমুলপুরে যমুনায় গিয়ে মিশেছে। এ নদী দুইটির এখন রেখাটাই আছে। তার বুকে এখন চাষ হচ্ছে।

মরালী নদীর একটি শাখা ভাণ্ডারকোলার মধ্য দিয়ে চাঁদপাড়ার কাছে সেয়ানা, ছেকাঠির মধ্য দিয়ে ইছামতীতে মিশেছে। ভাণ্ডারকোলায় এই নদীর সোঁতায় একাধিক পুকুর। ছেকাঠির নিচেয় খালের মত-ই নদীতে জল আছে তবে পানা আর বোদে পূর্ণ। চাঁদপাড়া থেকে ঝাউডাঙ্গার পথের ডানদিকে দেখা যাবে একটা নদী, যার নাম ছিল চাউলহাণ্ডিয়া। এখন তাকে বলা হয় চালুন্দর বিল। এর মাঝেও অনেক পুকুর কাটা হয়েছে। এ নদী গঙ্গার শাখা, যমুনায় মিশেছে। শ্রীমন্তপুব যে নদীর ধারে তার নাম ছিল জোকা। যমুনার শাখা গোপালনগরের দবিযাঘাটার পুলের নিচে দিয়ে ইছামতীতে মিশেছে। এখন শুষ্ক। শ্রীমন্তপুরের সাঁকোর পাশে বল্লভপুর এই নদীর ধারেই ছিল।

বনগ্রাম মহকুমার পশ্চিম প্রান্তে গরীবপুব গ্রামের উভয় পার্শ্বে ছিল দুটি নদী। একটি চামটা গ্রামের পূর্ব্ব দিকে, আর একটি গরালী গ্রামের পশ্চিম দিকে। দুটিই গঙ্গার শাখা—ইছামতীতে পডেছে। এ নদী দুইটির কোথাও জল আবার কোথাও বা চাষ আবাদ হচ্ছে।

সোনাই নদী কোদলার শাখা—ইছামতীতে পড়েছে। আজ তার চিহ্ন আছে। গোবরাপুর আর চাঁদার মাঝে যে জাযগাকে এখন পেতেল বাগান বলে। তার উপর একটা সাঁকো আছে বাগদা—বনগ্রাম সড়কের নিচেয়। এখন এ নদী গর্ভে চাষ হচ্ছে।

এই নদীগুলি ছাড়া আরও কত নদী হারিয়ে গেছে, তার চিহ্নও মুছে গেছে কে তার বার্তা দেবে। নদী ছাড়া বনগ্রামে আছে কতকগুলি বাঁওড। কতকগুলির নাম করা যেতে পারে। একদিন সেখানে নদী ছিল। এখন নদী তার চিহ্ন রেখে দূরে সরে গেছে বা চিরবিদায় নিয়েছে।

ঘাটবাঁওড়, মণিগ্রাম, ধর্ম্মপুকুরিয়া, মাধবপুর, সবাইপুর, পানচিতা, নকফুল, গোবরাপুর, কুঁদিপুর, সুন্দরপুর, ডুমা, রামনগর, বেড়ী, পাঁচপোতা পূর্ব্ব, পাঁচপোতা পশ্চিম প্রভৃতি গ্রামগুলি ঘুরলেই বাঁওড দেখা যাবে। এ ছাড়াও অনেক বাঁওড় আছে। তাছাড়া বহু গ্রামেই দেখা যাবে পুকুর।

যার অধিকাংশকেই বলতে হবে এঁদো পুকুর।

বনগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ৩৩টি বাঁওড় আছে। তার মধ্যে ২১টি বাঁওড় সেন্ট্রাল-কো-অপারেটিভ-এর আওতায় এসেছে। অবশিষ্ট কয়টি এখনও ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত এবং তা উৎপাদনহীন। এছাড়া আরও কয়েকটি জলাশয় আছে, সেগুলিকে বাঁওড় বলা হয় না। এগুলিও উৎপাদনহীন।

১) জয়ন্তীপুরের—'মনসাদোয়া'। ২) বর্ণবেড়িয়ার—'ছোটডোব', 'বড়ডোব'। ৩) আংরাইল—'বিক্রমবাবুর সোরা' কেন্দ্রীয় সমবায় দখলদার। উৎপাদনহীন। ৪) তেঁতুলবেড়ের 'গড়জোলা'—ব্যক্তিগত মালিকানা। ৫) পুরাতন বনগাঁর—'খাল' ইছামতীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ৬) চেলারামের ইটখোলার 'চারটি জলা'—বেওয়ারিশ। ৭) কাঁচিকাটার খাল—নদী ও বাঁওড়ের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ৮) কালিয়ানী পুলের পাশে ছিল—নদীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

এছাড়া আরও কয়েকটি বাঁওড় ব্যক্তিগত মালিকানায় উৎপাদনহীন অবস্থায় আছে।

১) শশাডাঙ্গার বাঁওড়। ২) নকফুলের বাঁওড। ৩) ঘাটবাঁওড়ের বাঁওড। ৪) শ্রীপল্লীর বাঁওড়—উৎপাদনহীন। ৫) পোলতার বাঁওড়—উৎপাদনহীন। ৬) গোপালনগরের বাঁওড়—ব্যক্তিগত মালিকানা। উৎপাদনহীন। ৭) মস্যমপুর বাঁওড়।

ইছামতী নদী ছিল এই মহকুমার সম্পদ। মাছ ছিল অফুরন্ত। তা ছাড়া পাওয়া যেত মতি বা মুক্তা। মুক্তা বার করার পর শুক্তি বা ঝিনুক পুড়িয়ে হত চুন। এ কারণে বনগ্রাম মহকুমায় ধীবর শ্রেণীর বাস অধিক। এখনও প্রায় তিন হাজার ধীবর বা মৎস্যজীবীর বাস। এছাড়া ব্যাক্রক্ষত্রিয় (বাগদি) এরাঁও মৎস্যজীবী। এদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। কিন্তু এরা সকলেই নিরন্ন। নদী-নালা, বাঁওড় মৎস্যশূন্য। ফলে শিরা-উপশিরার মত বহমান নদী-নালা সংস্কার অর্থে জাতীয় অর্থনীতিরই উজ্জীবন, মানুষের কর্মসংস্থান।

নীল চাষ ও বনগ্রামের কৃষককুল

বনগ্রাম মহকুমা হওয়ার পূর্বে একদিন কুশদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোম্পানীর আমলে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কুশদ্বীপকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়। বনগ্রাম সে ক্ষেত্রে কখনও নদীয়া কখনও বা যশোহর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে বনগ্রাম ২৪ পরগণার অন্তর্ভুক্ত। বনগ্রাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জেলার অন্তর্ভুক্ত হলেও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে কুশদ্বীপের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ধারা নিয়ে চলে এসেছে। তাই বিভিন্ন সময়ে বনগ্রাম বিভিন্ন জেলার অন্তর্ভুক্ত হলেও নদীয়ার পূর্বাঞ্চল এবং ২৪ পরগণার উত্তর অঞ্চলের অংশ বিশেষের সঙ্গে যোগসূত্রে আবদ্ধ।

১৮৫৭ খ্রীঃ ঐতিহাসিক মহাবিপ্লব ঘটে, যাকে ইংরাজেরা সিপাহী বিদ্রোহ আখ্যা দিয়েছিলেন। সেই মহাবিপ্লবের পূর্ব্বে ১৮২৪ খ্রীঃ ২৪ পরগণার ব্যারাকপুরে এক সিপাহী বিদ্রোহ ঘটেছিল যাকে ৪৭তম বাঙ্গালী পল্টন (47th Bengal Infantry)-এর বিদ্রোহ বলে ২৪ পরগণা জেলার ইতিহাসে বিশেষ ঘটনা বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই বিদ্রোহের পর ২৪ পরগণার উত্তর প্রান্তে গোবরডাঙ্গার আর একটি বিপ্লব সংঘটিত হয় ১৮৩১ খ্রীঃ। এই বিপ্লবের পটভূমি যে কারণে রচিত হয়েছিল তার কিছু পরিচয় দেওয়ার প্রয়াস পাচ্ছি। এই বিপ্লবের নায়ক ছিলেন তিতুমির বা তিতুমিঞা।

পলাশীর যুদ্ধের অবসানের পর কোম্পানীর প্রসাদপুষ্ট কৃতজ্ঞ মীরজাফর ১৭৫৭ খ্রীঃ ২০শে ডিসেম্বর ২৪ পরগণার জমিদারী ইংরাজদের হাতে তুলে দেন। ১৭৭৪ খ্রীঃ ক্লাইভের মৃত্যু হয়। তারপরই জমিদারী কোম্পানীর মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮১৪ খ্রীঃ ২৪ পরগণা থেকে কলিকাতা ও তার শহরতলী বিচ্ছিন্ন করে একটি জেলা গঠন করা হয়। অবশিষ্ট গ্রামাঞ্চল নিয়ে থাকে ২৪ পরগণা জেলা।

মীরজাফর কোম্পানীর হাতে ২৪ পরগণা তুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই জেলার অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিল। ১৬ মাস কোম্পানী সরাসরি খাজনা আদায় করার পর যখন দেখল যে তাতে মুনাফা কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগতভাবে কিছু থাকছে না তখন প্রাচীন জমিদারদের শঠ, প্রবঞ্চক এই অভিযোগে অভিযুক্ত করে সরিয়ে দেওয়া হয়। ১৭৫৯ খ্রীঃ স্বল্প মেয়াদে ভূমি রাজস্ব ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ইজারাদারদের জমির ওপর কোন ক্ষমতা থাকল না স্বল্প মেয়াদের জন্য। ভূমি রাজস্বের কোনও উন্নতিও সম্ভব হলো না। সে কারণে ১৭৯৩ খ্রীঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা করা হল। এই ব্যবস্থায় কৃষকরা জমিদারদের সম্পত্তিতে পরিণত হলেন। জমিদাররা রাজস্ব আদায় করার নামে যথেচ্ছ পীড়ন করতে থাকেন। এই জমিদাররা কোম্পানীর দেয় রাজস্ব দেওয়ার পর নিজেদের বিলাস ব্যসনে মত্ত হয়ে প্রজাদের শোষণ করতে থাকেন।

এই সময় আবির্ভাব ঘটল নীলকর কোম্পানীর। এই নদীমাতৃক দেশে পলিমাটি সমৃদ্ধ উর্ব্বর জমি নীল চাষের উপযুক্ত। সে কারণে কোম্পানী বাংলার এই মাটিতে নীল ফলাবার ব্যবস্থা করলেন। ইছামতীর মরা খাত এখন যাকে পাঁচপোতার বাঁওড় বলা হয় তার তীরেই মোল্লাহাটি গ্রাম, সেইখানে নীলকর সাহেবদের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হল সারা বাংলার। আর তার অধীন ১৫২টি কুঠি ইছামতী, যমুনা, ট্যাংরা, জোকা ইত্যাদি নদীর তীরে গঠিত হল। এই মোল্লাহাটি কুঠির এলাকা ছিল উত্তর ও পূর্বে ইছামতী নদী, পশ্চিমে বামনডাঙ্গা এবং দক্ষিণে খাবরাপোতা। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল নীলের আবাদ, কারখানা, কার্যালয়, আর নীলকর সাহেবদের বসবাস করার কুঠি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রচেষ্টায় নীলচাষের প্রসার ঘটে। নীলচাষ করা হত দুই রকম পদ্ধতিতে। নীলকর সাহেবরা চাষীদের অগ্রিম কিছু টাকা দিতেন যাকে দাদন বলা হয়। দাদনের অর্থ গ্রহণ করলে কৃষক তার সমস্ত ফসল নীলকর সাহেবদের নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য থাকত।

এর জন্য আবার নীলকর সাহেবদের অর্থলোলুপ নির্দয় আমলাদের সন্তুষ্ট করতে তার বেশী অংশ ব্যয় করতে হত। ফলে কৃষকরা প্রকৃতপক্ষে কিছুই পেত না উপরন্তু দাদন নেওয়ার ফলে নীলকর সাহেবদের কাছে ঋণে জড়িয়ে পড়ে জমিজমা হারিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হত। আর এক পদ্ধতি হল নীলকর সাহেবরা নিজের জমিতে জোর করে কৃষকদের নীলচাষ করতে বাধ্য করত পরিবর্তে দিত যৎসামান্য মজুরী। নিজের জমিতে কৃষকরা চাষ করতে পারত না। তাদের পরিশ্রমের সময়টুকু সাহেবদের নীলের জমিতেই কাটত। এতে তারা উদরান্নের সংস্থানের জন্য জমি-জমা বেচে পথে বসত। নীলকর সাহেবরা তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করত। এছাড়াও ছিল নীলকর সাহেব ও তাদের গোমস্তা-আমলাদের পীড়ন ও অত্যাচার। অত্যাচারের বিরুদ্ধে চাষীরা প্রতিবাদ করলে যা শাস্তি পেত তা অমানুষিক। তাদের ধরে এনে ফাটকে পোরা হত। মাথা কামিয়ে তাতে কাদা লেপন করে নীলের বীজ বোনা হত। যতদিন না চারা গজাত, ততদিন হাত পা বেঁধে বসিয়ে রাখা হত। এ ছাড়া চাবুক মারা, ঘর জ্বালান, নারীধর্ষণ ইত্যাদি'ত আছেই। নীলকর সাহেবরাই ফাঁসি দিত বিদ্রোহী কৃষকদের। আরামডাঙ্গার ফাঁসি দেওয়ার বটগাছ আজও বর্তমান আছে। তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং নীলকর সাহেবদের সহায় ও পরম বান্ধব ছিলেন। ফলে কৃষকরা বিচার কোথায় পাবে! অসহায়ভাবে মরত তারা। ম্যাজিস্ট্রেটরা কতদুর নীল-কর সাহেবদের সাহায্য করত তার প্রমাণস্বরূপ ১৩/১১/১২৫৮ সালের সংবাদ প্রভাকরের সংবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে। ২৪ পরগণা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নীলকরদের পক্ষ অবলম্বন করায় চার পাঁচ শ' কৃষক লাঙ্গল কাঁধে করে "গভর্ণমেন্ট হাউসের" সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল। 'সেখানে প্রতিকার না পেয়ে পরদিন দেওয়ানি আদালতের সামনে' গিয়ে অনুরূপ-ভাবে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। কৃষকরা একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিল তাই ভয় পায়নি। (সম্পাদকীয় অনুসারে : সংবাদ প্রভাকর ২/৩/১২৫৫)

নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে হরিশ মুখোপাধ্যায় তাঁর সংবাদপত্র 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে' নানাভাবে লিখতে লাগলেন। এর অল্প কিছুকাল পরেই প্রকাশিত হল বনগ্রামের সুসন্তান চৌবেড়িয়ার দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'। লেখক অজ্ঞাত থাকলেও মাইকেল মধুসূদনের 'নীলদর্পণের' ইংরাজী অনুবাদ পাদ্রী লং সাহেব-এর প্রকাশনায় সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলল। যার ফলে নানা ঘাত প্রতিঘাতে নীলকর সাহেবরা নীল চাষ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শোষণ পীড়নে বাংলার কৃষককুল· মরিয়া হয়ে নিজেদের রক্ষা করার ব্যবস্থা নিজেরা করেছিল। এ বিক্ষোভ চরম আঘাত হেনেছিল কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থায়। এই মরিয়া কৃষককুলদের নিয়ে এক বাহিনী গঠন করেছিলেন গোবরডাঙা অঞ্চলে তিতুমীর। ইতিহাসে এই বিপ্লবকে ১৮৩১ সালের কৃষি বিদ্রোহ বলে চিহ্নিত হয়ে আছে।

হিন্দু মুসলমান সমাজে নানা বিবর্তনের জন্য এসেছে নানা কুসংস্কার। সৈয়দ আহম্মদ নামে একজন প্রভাবশালী মুসলমান মক্কা যান। সেখানে ওয়াহাবী আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। দেশে ফিরে সেই আদর্শে মুসলমান সমাজ গঠন করার চেষ্টা করতে থাকেন। সকল প্রকার দুর্নীতি, অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই ছিল ওয়াহাবীদের আদর্শ। তিতুমীর এই আদর্শে দীক্ষা গ্রহণ করেন। যদিও এই সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক গোড়ামি ছিল প্রবল, তবুও কৃষক সমাজের সামগ্রীক দুঃখ কষ্টের উৎস যেখানে তা দূর করতে তিতুমীর সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। তিনি অত্যাচারী জমিদার আর নীলকর সাহেবদের উচ্ছেদ করে দেশ থেকে কোম্পানীর রাজত্বের অবসান ঘটাবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন।

তিতুমীর ঘোষণা করলেন জাতিধর্ম নির্বিশেষে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তরবারির মুখে অত্যাচারীদের অত্যাচারের জবাব দেওয়ার জন্য গড়ে তুললেন এক কৃষক বাহিনী। জমিদার ও নীলকর সাহেবরা দুর্বার গতিতে চালালেন সেই বিদ্রোহী বাহিনী দমনের জন্য অত্যাচার। কিন্তু সংগঠিত বাহিনীর নিকট পরাস্ত হয়ে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। বৃটিশ শাসক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন তিতুমীরের কৃষক বাহিনীর ভয়ে।

১৮৩১ সালে, গোবরডাঙার অন্তর্গত হয়দারপুর গ্রামে ছিল তিতুমীরের কর্মকেন্দ্র। ১৪ই নভেম্বর ইংরাজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে এক ইংরাজ সেনাবাহিনী পাঠান হল তিতুমীরকে দমন করতে কিন্তু কৃষকদের নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত তীরের মুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা হল না আগ্নেয় অস্ত্রধারী ইংরাজ সৈন্যদের। এর দুদিন পর নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নেতৃত্বে প্রেরিত হল আর এক সৈন্যবাহিনী। এবারও· তিতুমীরের বীরকৃষক বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে প্রাণ নিয়ে পালাল ইংরাজ বাহিনী। এই ঘটনার পর বৃটিশ রাজত্বের ভিত টলমল করে উঠল। বৃটিশ সরকার আতঙ্কিত। কলকাতা থেকে এক হাজার ইংরাজ সৈন্যের এক বাহিনী এল কামান, বন্দুকে সুসজ্জিত হয়ে তিতুমীরের মোকাবিলা

করতে। ফাঁকা মাঠে কামানের মুখে তিতুর বাহিনী পরাস্ত হল।

তিতু হেরে গেলেও পিছু হটার লোক নন। গোবরডাঙার থেকে দক্ষিণে ইছামতী নদীর তীরে তেতুলিয়ায় তিতু গড়ে তুললেন এক অদ্ভুত দুর্গ। আশপাশের গ্রামের বাঁশ দিয়ে প্রস্তুত করলেন বাঁশের কেল্লা। ইংরাজ বাহিনী আক্রমণ করল সেই বাঁশের কেল্লা। কেল্লার থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে বিষাক্ত তীর। অনেক ইংরাজ সেই তীরে রাজত্বের মায়া ত্যাগ করে পরপারে গেলেন। অবিরত কামান থেকে গোলা বর্ষণ হতে থাকল, সেই সঙ্গে উঠল প্রবল ঘূর্ণিঝড়। এই দুই-এর আক্রমণে তিতুর বাঁশের কেল্লা বিদ্ধস্থ হয়ে গেল। তিতু আহত হলেন, আহত হলেন তাঁর দক্ষ সেনাপতি গোলাম মাসুম। বৃটিশ বেয়নেটে তিতুর বক্ষস্থল বিদীর্ণ হল। তিতুর বিদ্রোহ সফল না হলেও কৃষককুল বুঝেছিল অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে হলে চাই সঙ্ঘবদ্ধ প্রযাস এবং প্রতিবাদ করার মত সৎসাহস। কিন্তু এই সাহস ও মনোবল কৃষকদের বেশী দিন থাকল না। উপর্যুপরি ইছামতী ও যমুনার বন্যা ১৮৩৮, ১৮৫৭, ১৮৫৯, ১৮৬৭, ১৮৭১, ১৮৮৫, ১৮৯০ এবং ১৮৬৬ খ্রীঃ প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ, সর্বোপরি ১৮৩৫, ১৮৩৬, ১৮৪২, ১৮৪৪, ১৮৪৫ খ্রীঃ ভযাবহ মহামারী (কলেরা) কৃষককুলকে নির্মূল করে দিয়ে গেল। এর উপর উত্তর চব্বিশ পরগণা ও নদীযায ম্যালেরিয়া রোগ জাঁকিয়ে বসে থাকল। গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেল। পোড়াভিটে আর জঙ্গল নিয়ে রোগ শোকে ক্লিষ্ট মুষ্টিমেয় গ্রাম্য কৃষক মানব জীবনের চেতনা ও চৈতন্য হারিয়ে কালের প্রহর গুণে চলল জীবন মৃত হয়ে।

সেই সঙ্গে ছড়িয়ে থাকল বনগ্রামের সারা অঞ্চল জুড়ে নীলের ক্ষত চিহ্ন। নীলকর সাহেবরা শুধু কতকগুলি যে কুঠি ফেলে গেলেন তা নয রেখে গেলেন বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চলে সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুর থেকে আনীত সস্তা মজুর সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওড়াং প্রভৃতি আদিবাসীদের। আর সৃষ্টি করে গেলেন কিছু অর্থলোলুপ অত্যাচারী শোষক জমিদার। নীলকর সাহেবদের আমলা, গোমস্তারাই এক একজন জমিদার হয়ে বসলেন। তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও অত্যাচার স্মরণ করলে এখনও শিহরণ জাগে। তাঁদের অনেকের বংশধরেরা আজ সমাজসেবার তকমা নিয়ে প্রভাবশালী বহু মান্য ব্যক্তি, স্বদেশপ্রেমী, কারা-প্রাচীর না দেখেও কারা লাঞ্ছিত আখ্যায় আক্ষায়িত।

মোল্লাহাটি সেই দ্বিতল কুঠির আর কিছুই নেই, আছে ভগ্নস্তূপ আর সারা অঞ্চল জুড়ে ছড়ান ছিটান ইটের টুকরো। আদিবাসীদের বংশধরেরা

এখন "সর্দার" পদবীতে ভূষিত হয়েছেন। নীলকর সাহেবদের দিয়ে যাওয়া সম্পত্তি সবই গিয়েছে অস্তাচলে। দু' একজন ছাড়া আর সকলেই কৃষি-শ্রমিক, ভ্যান ও রিকসা চালক। এই সব বৃত্তি নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। সর্দার পাড়ায় প্রবেশ করলেই বোঝা যায় শীতকালে পাতা ঝরার পর গাছগুলো যেমন অস্তিত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে থাকে, এরাও সেই রকম জীবনের সবল পত্র পল্লব খুইয়ে কালের প্রহর গুনছে। গাছের নব কিশলয় প্রাপ্তির আশা আছে, কিন্তু এদের মানুষের পর্যায়ে উঠে আসা এখনও দুরাশা। মেয়ে পুরুষে কাজও করে এরা। পেটের ভাত কাপড়ের জোগাড় করার সামর্থ থাকলেও হাড়িয়ার দৌলতে যে তিমিরে সেই তিমিরে। নেতারা এদের রাজনীতির ঘুটি হিসাবে ব্যবহার করেন। মিছিলে এদের দেখা যায় শহরের পথে। অর্ধনগ্ন নারী পুরুষ মিছিলে অংশ গ্রহণ করে, নানা শ্লোগান অনুকরণ কোরে চলে শহরের পথে, দেশ নেতাদের তাগিদে। দল ও মতের প্রশ্ন এদের কাছে গৌণ।

বনগ্রামের নীল চাষ-এর ইতিবৃত্ত যতটুকু জানা যায় গ্রাম বাংলার পল্লীর পথে প্রান্তরে ঘুরে, তাতে তার অতীত যা ছিল তার থেকে বর্তমানের কোন প্রভেদ আছে বলে মনে হয় না। অতীতে ছিল বিদেশী-শোষক শ্বেতকায় দানবেরা, আর আজ খাঁটি স্বদেশী-তাম্রবর্ণ দেশপ্রেমের ভেকধারী সুযোগসন্ধানী মানবেরা। আকৃতি ও প্রকৃতির রকমফের ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩৮

স্বদেশী যুগে বনগ্রাম

১৯৩০ সাল যশোহর জেলার বন্দবিলা লবণ কর বন্ধ, সত্যাগ্রহ ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে। বিজয় রায় এই আন্দোলনে তখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন। জেলার বিভিন্ন অংশ থেকে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা হচ্ছে। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক যাচ্ছে বন্দবিলায়। বনগ্রামের বিদ্যালয় বলতে তখন বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের তের চৌদ্দ বছরের ছেলেরাও স্বেচ্ছাসেবক হয়ে ছুটছে বন্দবিলায়। তখন বনগ্রামের কংগ্রেস অফিস ছয়ঘরিয়ায় ঘোষ বাড়িতে।

সে সময় যশোহরের জেলাশাসক মিঃ লারকিন আইরিশ সাহেব তিনি সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত আয়ারল্যাণ্ডের অধিবাসী, নরমপ্রকৃতির। তার সঙ্গে মত বিরোধ ঘটায় তাঁকে সরিয়ে যশোহরের পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্ট মিঃ এলিসনকে জেলাশাসকের দায়িত্ব দিলেন। ভারতে যে কয়জন অত্যাচারী বৃটিশ কর্মচারী ছিল, মিঃ এলিসন তাঁদের অন্যতম। বনগ্রামের কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের ঠাণ্ডা করার জন্য তাঁর অভিযান চলল বনগ্রামে। তখন থানার দারোগা ছিলেন মঃ মকবুল আলম। সেপাইদের মধ্যে একজন ছিলেন তাঁকে ছেলে বুড়ো সকলেই বলত 'চাচা'। আর তিনিও সকলকে 'চাচা' বলে ডাকতেন। তাঁরা দুজনেই কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক ছেলেদের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। মিঃ এলিসন রাত্রে ডাকবাংলায় এসে উঠলেন। তখন মাঘের প্রথম, শীতও পড়েছে প্রচণ্ড। রাত্রেই চাচার আহ্বান শোনা যেতে লাগল বাড়ি বাড়ি নির্দেশ পালনের। সকালেই মিঃ এলিসন বার হবে স্বেচ্ছাসেবক-

দের শায়েস্তা করতে। তের চৌদ্দ বছরের তরুণ ছেলেরা বাড়ি থেকে যে যে দিকে পারল আত্মগোপন করতে ছুটল।

মিঃ এলিসন বাংলা ভাষাটা খুব ভালই রপ্ত করেছিল, এমন কি গালাগালি পর্যন্ত। ঘোড়ার পিঠে উঠে ছুটল সকালে, দারোগাও সঙ্গে। প্রথম লক্ষ্যস্থল ছয়ঘরিয়া ঘোষ বাড়ি যেখানে ছিল কংগ্রেস অফিস। সেই বাড়ির অন্যতম মালিক বিজয়কুমার ঘোষ। ডাকনাম টুনুবাবু। শক্তিশালী পুরুষ, বন্দুকও ছিল। সুতরাং তাকে শায়েস্তা করা প্রথমেই দরকার। বিশেষ করে তাঁর পুত্র সুশীল ঘোষ ও তার কয়েকজন বন্ধু মতিগঞ্জ ও শিমুলতলার অধিবাসী কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক। ঘোড়া ছুটল। চন্দ্রকান্ত রোডের মুখে দেখা বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের দপ্তরী চন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়-এর সঙ্গে। এলিসন জিজ্ঞাসা করল কোন ভলাণ্টিয়ার এই পথে গিয়েছে কিনা। আর টুনুবাবুকে চেনে কিনা। চন্দ্র চটোপাধ্যায় হকচকিয়ে গিয়ে বলে বসল 'না'। শুধু এই কথা। আর যায় কোথায়। 'শুয়ার কা বাচ্চা' বলেই ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে হাণ্টার দিয়ে প্রহার চলতে লাগল। মারের চোটে মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল। শেষ পর্যন্ত জ্ঞানশূন্য অবস্থায় রাস্তার পাশে ফেলে রেখে আবার ঘোড়া ছুটল। চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দাসপাড়ার লোক আর জীবন বাগদী সেবা শুশ্রূষা করে জ্ঞান ফেরায়। রক্তাক্ত অবস্থায় কোন রকমে চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক যতীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আবাসে এসে ওঠে।

সকাল আটটা হবে, ঘোষ বাড়ির সেজ ভাই টুনুবাবুর দাদা প্রমোদচন্দ্র ঘোষ যাঁর ডাকনাম শীলুবাবু, তিনি বাইরের প্রাঙ্গণে চৌকিতে বসে তাম্রকূট সেবন করছেন। মাইনদারে বিচুলি কাটছে। তার দুটি বিকৃত মস্তিষ্ক পুত্র নানা অঙ্গভঙ্গী করছে। এমন সময় ঘোড়সওয়ার সাহেব আর তার সঙ্গে দারোগার ঘোড়ার পিঠ থেকে অবতরণ। শীলুবাবুর বিকৃত মস্তিষ্ক পুত্রদ্বয় সঙ্গে সঙ্গে নানা রব আর অঙ্গভঙ্গী করে তাঁদের আহ্বান জানাল। সাহেব ত' খচে বোম। শীলুবাবু ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সাহেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করল 'টুনুবাবু কে আছে?' শীলুবাবু বললেন, 'হুজুর সে আমার ছোট ভাই।' 'ড্যাম-নিগার বুলাও উসকো'। ঠিক সেই মুহূর্তে টুনুবাবু পেশীবহুল দীর্ঘ দেহ কোঁচার খুটে আবৃত করে প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হলেন। সাহেবের সামনে এসে বললেন 'আমিই টুনুবাবু, কি চান বলুন।' কোন উত্তর নয় 'শুয়ার কা বাচ্চা' বলেই হাণ্টার চলল অবিরাম তাঁর সারা অঙ্গে। টুনুবাবু বারান্দার দিকে মুখ করে বারান্দা ধরে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। সে কি নির্মম প্রহার! এমন সময় তার স্ত্রী (আজও জীবিত) বয়স তাঁর এখন

৭৫ বৎসর হবে প্রায় (১৯৭০ খ্রীঃ)। তিনি মহাত্মা গান্ধী আর চিত্তরঞ্জনের ফটো আর কংগ্রেসের খাতা পত্র পেটে কোঁচড়ে করে নিয়ে ঘোমটা দিয়ে তাদের সমুখ দিয়ে চলে যাওয়ার কালে এলিসন পুলিশদের ইঙ্গিত করার সঙ্গে সঙ্গে টুনুবাবুর অপর জ্ঞাতিভাই-এর বিধবা স্ত্রী নিতাই ঘোষের জননী মাছকাটা বঁটি নিয়ে এলিসনকে শাসিয়ে বলেন, 'দেখো সাহেব্‌ মেয়েদের দিকে যদি এক পা এগোও ত' এই বঁটি দিয়ে তোমাদের শেষ করব।' এতে সেদিকে আর কেউ এগোলো না। টুনুবাবুর স্ত্রী চলে গেলেন বাড়ির বাইরে। টুনুবাবু নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না, উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। এলিসন নাল লাগানো বুট দিয়ে তাঁর পিঠ চটকাতে লাগল। তারপর সম্ভবত মৃত কিম্বা চৈতন্য শূন্য মনে করে তাঁকে পরিত্যাগ করে গৃহ-খানা তল্লাসি করতে লাগল। এক লাইসেন্স করা বন্দুক ছাড়া আর কিছু মিলল না। সেটা নিয়ে এলিসন ফিরল। টুনুবাবুকে নিয়ে এসে থানায় আটক করল। টুনুবাবু থানা থেকে জামিনে খালাস হলেও নিত্য সকালে থানায় হাজিরা দিয়ে যেতে হত অনেক কাল ধরে।

বেলা এগারোটা। কোর্টের সকলে কর্মব্যস্ত। উকিল ও মোক্তার লাইব্রেরীতে উকিল মোক্তারগণ নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। এমন সময় এলিসন কোর্টের আঙ্গিনায় দর্শন দিলেন। সামনেই এক মাঝবয়সী মুসলমান মামলার জন্য কোর্টে এসেছে; এলিসন নির্মমভাবে তাকে প্রহার করে চলল হাকিমের খাস কামরার দিকে। আর লাইব্রেরীদ্বয়ের কপাট ইতিপূর্বেই বন্ধ হয়ে গেছে অবস্থা দেখে। কিন্তু সকলে চুপ করে থাকলেও সেই সৌম্য দর্শন দীর্ঘদেহী গৌরবর্ণ বোখা উকিল চুপ করে থাকার পাত্র নয়। সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুন্দরপুরের মিত্র পরিবারের সুসন্তান, গর্জে উঠলেন। পরণে নীল রং-এর খদ্দরের স্যুট। "ব্রিটিশ রাজত্বে ল এণ্ড অর্ডারও কি গিয়েছে। আমি এর মোকাবিলা করব। কোর্ট কম্পাউণ্ডে মক্কেলকে প্রহার করে যাবে আর তার জবাব দেওয়া যাবে না?" সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করেই তিনি চললেন প্রতিবাদ জানাতে।

এস্‌, ডি, ও, কোর্টের যে লাল থামওয়ালা বারান্দা ঘিরে এখন অফিস-ঘর হয়েছে, তার ভিতর অংশের ঘর তখন ছিল এস্‌, ডি, ও'র খাস কামরা। ললিতমোহন সেন বি, সি, এস, তখন এস্‌, ডি, ও, তাঁর মুখোমুখি চেয়ারে বসে এলিসন আলোচনারত এমন সময় সুরেনবাবু উকিলের গোল থাম বারান্দায় আবির্ভাব। এলিসন বারান্দার দিকে পিছন করে বসে। ললিত সেন মহাশয় সুরেনবাবুকে দেখেই এলিসনকে বলে বাইরে এলেন। সুরেনবাবু

ললিত সেন মহাশয় বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বললেন 'ব্রিটিশ রাজত্বে কি ল এণ্ড অর্ডার একেবারেই উঠে গেছে'—একটু জোর দিয়েই বললেন। এলিসন পিছন ফিরে তাকাল। কোন কথা না বলেই হান্টারটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল সোজা ডাকবাংলায়।

সুরেনবাবু দমবার পাত্র নন। সেই প্রহৃত লোকটাকে দিয়ে ফৌজদারী নালিশ করালেন গাঁটের কড়ি খরচ করে এলিসনের বিরুদ্ধে। সমন জারি করবে কে? সকল পেযাদাই অস্বীকার করল। পেয়াদা জুম্মন বনগ্রাম পশ্চিমপাড়ায় বাড়ি। বিশাল দেহ। একগাল হেসে বলল, 'আমিই হুঁজুরকে সেলাম জানাব।'

জুম্মন ডাকবাংলায় যখন গেল তখন এলিসন মধ্যাহ্ন ভোজনে রত। অপেক্ষা করতে হল। তার পরই জুম্মন সেলাম দিল সাহেবকে। সমন জারি করে জুম্মন ফিরে এল। এলিসন দারোগা সাহেবকে পুলিশের রুমাল চুরি করেছে ঐ প্রহৃত লোকটা এই মর্মে একটা মামলা করার নির্দেশ দিয়ে ঘোড়া ছোটাল যশোহর।

এ ঘটনাব দুদিন পর এলিসন যশোহর কংগ্রেস অফিস তছনছ করে। সে সময় কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকবা যে যেদিকে পারে পালায়। কিন্তু যশোহর ষ্টেশনে ধরা পড়ল জন ত্রিশেক স্বেচ্ছাসেবক তার মধ্যে বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়েব তের চৌদ্দ বছরের ছাত্র জন ছ' এক। সুশীল ঘোষ ছাড়া তাদের আর কারও নাম এখানে দিলাম না তবে তাদের মধ্যে দুজন মৃত। আর চারজন জীবিত আছেন। সেই স্বেচ্ছাসেবকদের ধরে আনা হল গদখালি এক নির্জন বিলের মাঠে। তাদের জামা কাপড় খুলে গায়ে আলকাতরা মাখিয়ে তার উপর তুলো দিয়ে ভেড়া বানান হল। হাত ও পায় ভর দিয়ে চতুষ্পদ করে রাত্রি আটটা থেকে ভোর পর্যন্ত ছোটান হল থামলেই পিঠে চাবুক। মদে চুর এলিসনের মুখে বুলি 'সব বাঙ্গালী ভেড়া হ্যায়'। ক্লান্ত অবসন্ন দেহে অসহ্য জ্বালা নিয়ে লুটিয়ে পড়ে থাকল স্বেচ্ছাসেবক তরুণের দল। এলিসনের ঘোড়া ছুটল সন্ধ্যার অন্ধকারে যশোহর। সুশীল সুদর্শন আর বয়স অল্প সে কারণে আঘাতটা কম করেছিল। সেই উলঙ্গ অবস্থায় যশোহর পথে এসে দাঁড়ায় এবং বনগ্রাম থেকে যশোহরগামী বাসে সংবাদ পাঠায় যশোহর কংগ্রেস অফিসে। যশোহর থেকে কংগ্রেস কর্মীরা এলেন। স্থানীয় অধিবাসীদের অনুকম্পায় কোনপ্রকারে দেহের আবর্জনা পরিষ্কার করা হল। সেবা শুশ্রূষা করে তাদের সকলকে সুস্থ করা হয়। তিন জনকে যশোহর চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

যা কিছু জুটল তাই অঙ্গে দেওয়ার পর কিছু আহার্য বস্তুও মিলল—তাই খেয়ে যে যার বাড়ির পথে রওনা হল। বনগ্রামের যারা তারা 'মায়ের দান' বাসে করে বনগ্রামে ফেরে। তখন বাসের মালিক ছিলেন গোবরাপুরের মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বনগ্রাম যশোহর ঐ বাস তখন চলত আজ সেই তরুণেরাই বৃদ্ধ। নেতৃত্ব তাঁরা কোন কালেই করেন নি। দেশ সেবার ব্রত নিয়ে যে যেভাবে পেরেছেন সেইভাবেই সেবা করে চলেছেন। নাম জাহির করার মোহ তাঁদের নেই। এখন যাঁরা স্বদেশসেবার বৃত্তি ভোগ করছেন সরকার থেকে, সেই মহাপ্রাণদের দেশসেবার ইতিহাস অজানা থেকে গেল।

ঠিক সাতদিন পরে আবার এলিসন বনগ্রামে এল। সকাল সাতটা সুরেন মিত্র মহাশয়-এর ডাক পড়েছে এস, ডি, ও সাহেবের কুঠিতে, এলিসনের ডাক। সুরেনবাবু প্রস্তুত হলেন, মনে ধারণা তাঁকে 'এ্যারেষ্ট' করবে। সংসার বৃহৎ। তাঁর সহকর্মী যাঁরা মতিগঞ্জে ছিলেন তাঁদের ডাকলেন। তাঁরা হলেন প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। তাঁরা তাঁকে ভরসা দিলেন। সংসারের ভাবনা তাঁর ভাবতে হবে না, যদি তাঁকে এ্যারেষ্ট করে ত তাঁরা লড়বেন। সুরেনবাবু রওনা হলেন এস্, ডি, ও'র কুঠিতে।

বেলা ন'টা সুরেনবাবু ফিরে এলেন। এলিসনের সংগে মীমাংসা হয়েছে। রফা হয়েছে উভয় পক্ষের মামলা প্রত্যাহার। এর অল্প কিছু দিন পরেই এলিসনকে যশোহর বিপ্লবী বাহিনী থেকে এক পত্র দেওয়া হয়। তাতে হুমকি দেওয়া হয় 'তোমার মৃত্যু আসন্ন প্রস্তুত হও।' এলিসন স্বেচ্ছায় বদলি হয়ে গেল চট্টগ্রামের কুমিল্লায়। কিছুদিন পরেই সংবাদ-পত্রে শিরোনামের সংবাদ কুমিল্লায় এলিসন রিভলবারের গুলিতে আহত হন। চিকিৎসকেরা চেষ্টা করেও তাঁকে বাঁচাতে পারেনি। মৃত্যুর পূর্বে শুধু এই কথাটাই বলে গেছেন আততায়ী তাঁর চেনা, নাম বলতে পারেন নি। যশোহর জেলার কোন তরুণ বালক। বনগ্রামের কয়েকজন বালককে ধরা হল, জেলখানায় প্যারেড করিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। সুশীল ঘোষ ধরা পড়ল কলকাতায়। কিন্তু প্রমাণ অভাবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল বেদম প্রহারের পর। কিন্তু কে সেই বালক? তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। এলিসনকে হত্যা করার অপরাধে কি মাতৃসেবার পুরস্কার গ্রহণেও তাঁর অনীহা। আজ তিনি বৃদ্ধ হতে চলেছেন নিশ্চয়; যদি বেঁচে থাকেন। সেই বীর দেশ মাতৃকার সেবককে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই।

৩৭

স্বাধীনতার প্রথম শহীদ

ইছামতীর তরঙ্গ বিধৌত তটভূমির একজন বীর দেশপ্রেমিক সন্তানের পরিচয় না দিয়ে পারছি না। অরণ্যে কত সুন্দর সুগন্ধী ফুলই ফোটে, আবার লোক চক্ষুর অন্তরালেই নিজেকে নিবেদন করে ধরিত্রীর চরণ প্রান্তে। এই বীর সন্তানও সেই রকম করেই আত্মদান করেছিলেন বাংলা আর বাঙ্গালীর মর্য্যাদা আর অধিকার আদায় করার জন্য। বিশেষ করে দুস্থ অবহেলিত শ্রমিককুলের জন্য। এই দেশপ্রেম স্বাধীন চিত্ত বীর সুসন্তান কেবলমাত্র বনগ্রামের গৌরব তা নয় সমগ্র ভারতের মেহনতী মানুষের গৌরব ও আদর্শ স্থানীয়।

বনগ্রামের শহীদ সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ছাত্র মহলের 'ছন্তদা'। দরিদ্র মধ্যবিত্তের সন্তান। তার বাবা মন্মথনাথ চক্রবর্তী বনগ্রামের যে অংশটুকু রাণাঘাটস্থ নফর পালচৌধুরীর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই অংশের নায়েব-এর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সত্যেন পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন ও স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেন। ১৯৩০ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। দেশের ডাকে পরিপূর্ণভাবে সাড়া দেওয়ার সুযোগ পান নি। পিতৃ বিয়োগ ও সংসারের অভাব অনটনের জন্য তিনি চাকুরী গ্রহণে বাধ্য হন আসামের ডিগবয়ে তেলের খনিতে।

তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের শাসনকালে খনির মালিক ছিল এক ইংরাজ কোম্পানী। কোম্পানীর প্রতিনিধি তিন ইংরেজ সে সময়ে তেল খনির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা হলেন মিঃ টেম্স, মিঃ স্মে এবং মিঃ গ্রেজব্রুক। তাঁরা কেবল শ্রমিকদের নানা ভাবে শোষণ করতেন তা নয়। তাঁদের অত্যাচারেরও সীমা ছিল না। সত্যেন এই দুস্থ নির্যাতিত শ্রমিকদের সংগঠিত করেন ও কোম্পানীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামেন। তখন সারা ভারত জুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে; এ অবস্থায় শ্রমিক

আন্দোলন বিশেষ করে ইংরেজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে অমার্জনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হল। সরকার কোম্পানীর হাতে ঢালাও ক্ষমতা অর্পণ করল এই শ্রমিক আন্দোলন দমন করার জন্য। ইং ১৯৩৮-৩৯ সাল, বিদেশী সেই কোম্পানীর বেপরোয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্যেন অহিংস সৈনিক হয়ে নেতৃত্ব দেন। মিঃ টেম্স, মিঃ স্মে ও মিঃ গ্রেজব্রুক আগ্নেয় অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে এলেন নিরস্ত্র শ্রমিকদের দমন করতে। বনগ্রামের বীর সন্তান সত্যেন বুক পেতে দিলেন কোম্পানীর বর্ব্বর প্রতিনিধিদের উদ্যত আগ্নেয় অস্ত্রের সামনে। বর্ব্বর সেই ইংরাজের গুলিতে সত্যেনের বক্ষ বিদীর্ণ হল। সেই সঙ্গে প্রাণ দিলেন গৌহাটির প্রাণেশ্বর চৌধুরী আর পোরোকপুরের চণ্ডী আহির তাঁরা লুটিয়ে পড়লেন আসাম উপত্যকার মাটিতে। লাল হয়ে গেল তাঁদের বুকের রক্তে আসাম উপত্যকার মাটি। ছাত্র মহলের প্রিয় ছনুদা শহীদের মৃত্যু বরণ করলেন। স্ত্রী-পুত্রদ্বয়, ভাই-এরা আত্মীয়স্বজন আর অগণিত বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জন পড়ে রইল তাঁর জন্মভূমি বনগ্রামে। তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদ্বয়ের দুঃখ দুর্দ্দশার চরমতম দিনগুলি কাটতে লাগল এই বনগ্রামে কোডার বাগান পল্লীর আবাসে। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রটি উপার্জ্জনক্ষম হওযার পর হঠাৎ কর্ম্মরত অবস্থায় আকস্মিক দুর্ঘটনায় নিহত হয়। এখন এক পুত্র ও স্ত্রী বর্ত্তমান।

সত্যেন বনগ্রামের বীর সন্তান। বনগ্রামের আর কোন সন্তানই এমন করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জীবন পণ করে বুক ফুলিযে রুখে দাঁড়ান নি। তিনি নিজের বক্ষরক্তে ভারতের ভূমি সিক্ত করে যে আদর্শ দেশবাসীর কাছে দেখিযে গিয়েছেন তা দেশপ্রেমিকদের অনুকরণ যোগ্য। সত্যেন বীর, সত্যেন শহীদ, সত্যেন বুঝেছিলেন শ্রমজীবির অধিকার, আর সেই অধিকার আদায করতে চেয়েছিলেন বীরের ন্যায়। পরাধীন ভারতের ছেলেদের প্রাণে নিজের বুকের রক্ত দিয়ে অন্যাযের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য সাহস ও অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছেন। আমরা বনগ্রামের অধিবাসী। সত্যেন আমাদের ছনুদা— আমাদেরই একজন। তাঁর পুণ্যময স্মৃতি চির অম্লান চির ভাস্বর হযে থাকবে দেশবাসীর অন্তরে। আজ দীর্ঘ তেত্রিশ বছর হল তিনি শহীদ হয়েছেন। কালচক্রের আবর্তে তাঁর স্মৃতি হয়ত অনেকের অন্তর থেকে অবলুপ্তির অপেক্ষায় আবার অনেকেই হয়ত তার নামও কোনদিন শোনেন নি বা শোনার সুযোগও পান নি। কিন্তু তাঁর স্মৃতি জড়িয়ে আছে বনগ্রামের আকাশে বাতাসে। বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালযের প্রতিটি কক্ষে বনগ্রামের পথে প্রান্তরে। সেই বীর শহীদ ছনুদার স্মৃতির উদ্দেশে হৃদয়ের শত সহস্র স্বভক্তি প্রণতি জানাই। বলি হে বীর আশীর্ব্বাদ কর যেন বাংলা মা'র প্রতিটি সন্তান আজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। মানুষ হয়ে বাঁচার অধিকার আদায় করে নিতে পারে।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

সম্মাজর্নী

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	পড়তে হবে
১	৭	সুখপুখুরিয়া	সুখপুকুরিয়া
৪	৬		
৫	১৯	পিতামোহের	পিতামহের
৮	৩	বংভূমি	বঙ্গভূমি
৯	৯ ও ১১	চরা ও চরায়	চড়া ও চড়ায়
১০	১৯	ধুনুরীরাও	চুনুরীরাও
১৩	২	১৮৬৮	১৮৬৪
১৯	১৫	রুদ্র	রুদ্ধ
২৫	১১	অগসর	অগ্রসর
৪১	২৪	ব্যর্থ	বীর্য
৯৮	১৮	রক্ত	রঙ্গ
১২৬	৩২	অনেক	আলোক
২০৩	১৯	বঙ্কুরাম	বঙ্কুবিহারী
২০৩	২০	কামারপাড়া	আগলাপাড়া
২১৭	৯	কালু দত্ত	কানু দত্ত
২২৮	১০	অলকার	অলঙ্কার
২১৯	৭	ঝাড়	মাড়
২৬৪	৯	পোরোপুকরের	গোরোকপুরের

সাহায্যকারী গ্রন্থসম্ভার

1. Journal of the Asiatic Society of Bengal-1875
2. Blochman, Ain-i-Akbari
3. বিশ্বকোষ ৪র্থ খণ্ড
4. রজনীকান্ত চক্রবর্তী—গৌড়ের ইতিহাস (১ম খণ্ড)
5. আনন্দ ভট্ট—বল্লাল চরিত, উত্তর খণ্ড
6. অদ্ভুত সাগর
7. অদ্ভুত সাগর ভূমিকা—মুরলীধব রায়
8. Eliot C. Hinduism and Buddhism
9. Ghosal. P. Indian Antiquity-1973
10. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকঙ্কন—চণ্ডীমঙ্গল
11. Abul Fazle Allami Ain-i-Akbari
Translation R. Kenulway
12. কুশদ্বীপ কাহিনী
13. যশোহর খুলনার ইতিহাস—সতীশচন্দ্র মিত্র
14. সম্বন্ধ নির্ণয়—লালমোহন বিদ্যানিধি
15. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, দক্ষিণ রাঢ়ি কায়স্থ কাণ্ড—
নগেন্দ্রনাথ বসু
16. বাঙ্গলার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়